তত্ত্বপ্রকাশিকা
বার্মাশেল কর্মচারী সমবায় কলোনী
সোদপুর, ২৪ পরগণা

—সাড়ে চার টাকা—

চতুর্থ সংস্করণ

তত্ত্বপ্রকাশিকা, সোদপুর হইতে শ্রীযুক্ত [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা,
৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন হইতে শ্রীফণিভূষণ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের—

বন্দী বিহঙ্গ
আঁকাবাঁকা
আদি ও অকৃত্রিম
বন্যাসঙ্গিনী
শ্যামলীর স্বপ্ন
আগ্নেয়গিরি
নীচের তলায়
যতদূর যাই
মহাপ্রস্থানের পথে
দেশ-দেশান্তর
অরণ্যপথ
ভ্রমণ ও কাহিনী
আলো আর আগুন
জল-কল্লোল
অঙ্গার
স্বাগতম্
অশান্ত
কাজললতা
তরঙ্গ
চেনা ও জানা
অনুরাগ
মল্লিকা (নাটক)

ফুলশয্যার রাত্রের দু-একটি কথা স্মরণীয় বৈ কি।

সমস্ত ব্যাপারটাই বীরেশের কাছে যেন একটি অবাস্তব কাহিনী—এর আরম্ভ যেমন অহেতুক, পরিণতির চেহারাও তেমন অস্পষ্টতায় ভরা। তবু কাহিনীটা সেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি, একটা সামাজিক রোমন্থন, এতে আনন্দ অপেক্ষা দায়িত্ব সম্পাদনের ব্যস্ততাটাই প্রধান। বীরেশের মনে অসীম ক্লান্তি, অপরিসীম বিরক্তি।

মাসী, মামী আর মাসতুতো ভাইবোনেরাই এই কর্মকাণ্ডের পার্শ্বচরিত্র, পিতা অধিনায়ক, তিনি কর্মনিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন। বিপত্নীক এবং একক পুত্রের জনক।

উৎসবের সর্বাঙ্গীণ আনন্দে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ। বিবাহটা আনন্দ-উৎসব, এই যথেষ্ট। উচ্ছ্বাসটা ভিতরে বাহিরে আলোয় সজ্জায় বাঁশিতে হাসিতে, আত্মীয়-পরের আনাগোনায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত,—কৃপণতা কোথাও নেই। যদি বা থাকে সেটা ব্যক্তিগত, লোকলোচনের অন্তরালে। উৎসবের আলোকমালার ধাঁধাঁ এড়িয়ে কোনো দিব্যদৃষ্টিই কোনোকালে সেখানে পৌঁছয়নি।

বীরেশের অস্তিত্ব এর মধ্যে কোথাও নেই। সে উপলক্ষ্য, তাকে ঘিরেই বিয়ে। তার থাকাটা স্বীকৃত হবার প্রয়োজন নেই, তাকে কেন্দ্র করে একটা প্রকাণ্ড উৎসব দাঁড়িয়ে উঠেছে একথাটা বড় নয়,—সে ছাড়া আর সমস্তই নির্ভুল সত্য। কেবল সে—শ্রীমান বীরেশ,—সমারোহের মধ্যে সে একটা অবলুপ্ত বস্তু মাত্র। প্রকাণ্ড রেলগাড়ীখানা দ্রুতগতিতে চলেছে সেটা দৃশ্যমান, কিন্তু অলক্ষ্যে ইঞ্জিনের নাড়িতে

নাড়িতে যেখানে প্রাণশক্তি স্ফুরিত হচ্ছে সেটা ভুলে থাকা অপরাধ নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

হেমন্ত রাত্রির অসীম শূন্যের দিকে চেয়ে বীরেশ একা বসে'ছল ছাদে। তারকায় তারকায় তার সকল চৈতন্য নিরুপায় আশ্রয় খুঁজে ফিরছিল,—তার হৃদয়টায় মধ্যে যেন শত শত আহত পক্ষিশাবকের ন্যায় দুরন্ত চিন্তার দল ডানা ঝটপটিয়ে মাথা খুঁড়ছে। মনে হচ্ছে তার ভবিষ্যৎ জীবনে আঘাত হবে বড়, সঙ্কট হবে বহুমুখী। অগাধ চিন্তায় যখন সে একান্তে আচ্ছন্ন, এমন সময় পিছনের সিঁড়ি থেকে কলকণ্ঠের ডাক এলো, এই যে বীরেশদা, পালিয়ে বসে আছেন আড়ালে,—চলুন, বৌদিদির সঙ্গে ভাব করবেন ?

বীরেশ হাসিমুখে তাকালো তাদের দিকে। ঠিক চেনা গেল না, মামাতুতো বোনেদের সহপাঠিনী শ্যামলী-দীপালী-রেবা-রেণার দল। তাদের কথার চেয়ে বেশি উল্লাস, হাসির চেয়ে বেশি ভঙ্গী,—তারা কেবল উৎসবেই এসে যোগ দেয়নি, উৎসব উপলক্ষ্য করে নিজেদেরও প্রকাশ করতে এসেছে।

—কই উঠলেন না যে ? চাঁদের আলো অনেকদিন পান করেছেন, এবার কিন্তু সামনে মধু-র ভাণ্ডার।

—আকাশের তারার চেয়ে জ্বলবে চোখের মণি। আমরা কিন্তু সমস্ত রাত আপনাদের পাহারা দেবো তা ব'লে রাখলুম।

—আ, চলুন না বীরেশদা ?

বীরেশ হেসে বললে, যদি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে তোমাদের সব ষড়যন্ত্র পণ্ড হবে ত ?

ওরই মধ্যে যিনি শাস্ত্রমতে লজ্জিতা, তিনি দু-পা এগিয়ে এসে বললেন, তা মনেও করবেন না, ফুলের গন্ধে দেশ ছেড়ে ঘুম

পালাবে। ফুলের পাপড়িতে বাসি দাগ না পড়লে চোখের পাতা বুজবে না।

একজন বললেন, বিয়ের লগ্নে হোলো বরবেশ, রাজবেশ হোলো বাসরে, আর ফুলশয্যায়—

—কি রে, বলতে গিয়ে যে থামলি ?

—তুই বল্ না ?

সবাই চুপ। বীরেশ হেসে ঘুমিয়ে দিল, রসের সমাপ্তি না হলে তাকে বলে রসাভাস,—ফুলশয্যার বর হলেন রতিদেবতা। যাও, অভিধান খুলে অর্থ করোগে।

সবাই ছুটে পালিয়ে গেল সিঁড়ি দিয়ে নেমে। একজন কেবল দাঁড়িয়েছিল আগাগোড়া নিঃশব্দে। এদিক ওদিকে চেয়ে কাছে এসে সে বীরেশের হাত ধরলো। কম্পিতকণ্ঠে বললে, চলো বীরেশ। সমস্ত ব্যাপারটা তুমি মলিন করে দিতে চাও কেন, এই কি তোমার এম-এ পাশ করার শিক্ষা ?

উঠে দাঁড়িয়ে বীরেশ বললে, উৎসাহ আসছে না। তুমি ত সব জানো, নলিনী ?

কিছু জানিনে, জানবার সময় এ নয়। কেবল এই মিনতি জানাচ্ছি আর কেউ যেন জানতে না পারে। চল তুমি।—নলিনী তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো।

অনুষ্ঠানের বিবৃতি এর পর না দিলেও চলবে। ফুলশয্যার আয়োজনে সমস্ত ঘরখানা অলঙ্কৃত। বিছানার উপর মরশুমী ফুলের মেলা, রেশমী বালিশের চারিপাশে পুষ্পস্তবক, মেঝের উপর পুষ্পবৃষ্টি। সেইগুলি পার হয়ে যার দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়ে তিনি সর্বালঙ্কারভূষিতা নববধূ।

সমস্ত ব্যাপারটা মিটতে ঘন্টাখানেক লাগলো। কুঞ্জবালা রইলেন

মালকে, সখীর দল ঘর থেকে বেরিয়ে গোপনে প্রহরায় নিযুক্ত রইলো। নলিনী নামে যাঁর পরিচয় ঘটলো তিনি সকল কাজ সেরে গা ঢাকা দিয়ে চ'লে গেলেন। এদিকে তাঁর উৎসাহ কম। অন্তরাল খুঁজে অন্ধকারে তিনি আত্মগোপন করলেন।

ঘরে আলো মৃদু জ্বলছে। জানালাগুলি সবই খোলা। মশারির মধ্যে অজস্র ফুলের বিরক্তিকর বিছানার উপর শুয়ে আড়ষ্ট স্বামী আর স্ত্রী। দুজনের মাঝখানে হস্ত পরিমিত ব্যবধান—দুটি অজানা জীবন যেন অনন্ত রহস্য নিয়ে পাশাপাশি স্থির হয়ে রয়েছে। সাড়াশব্দ নেই, পার্শ্বপরিবর্তন নেই, এমন কি নিঃশ্বাসের আওয়াজ অবধি শ্রুত নয়।

বক্ষ স্পন্দনের সঙ্গে ঘড়ির টিক্‌টিক্ আওয়াজ তাল মিলিয়ে চললো প্রায় দু'ঘন্টা। গোপিনীর দল যারা নিদ্রা আর মশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এতক্ষণ ছিটে ফোঁটার আশায় জেগেছিল তারা এবার ব্যর্থকাম হয়ে অনুযোগ জানিয়ে বললে, কবিতায় ছন্দ পতন হলেও তাকে বলে বলা চাস। এই ব'লে অভিমান জানিয়ে জানালার আড়াল থেকে তারা চলে গেল।

আর কেউ জেগে নেই, রাত্রি নিঃসাড় হয়ে এলো। কিন্তু ঘুমের লেশ নেই যোগেশের চোখে, এবং এ সংবাদটা সে না জানিয়ে থামতে পারলো না। অভিমানিনীদের দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাওয়া সে ভ্রূক্ষেপই করলো না, মশারি ছাড়িয়ে উঠে সে একে একে ভিতরবাড়ীর জানালাগুলো বন্ধ করে দিল। ঠিক ঐ সময় নববধূ পার্শ্বপরিবর্তন করলো।

ঘরের আলোটা থাক। চিন্তাৎ রাজ্যে যে একটা অন্ধকারের ছায়া দেখা যাচ্ছে, বাইরের আলো নিবিয়ে সেটাকে আর দুর্গম করে কাজ নেই। আলোটা সাহস ও স্পষ্টতার প্রতীক। ওটা নিবলে অস্তিত্বের দৃঢ়তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন, কেবল নিজেকে চেনা যায় না তাই নয়,

নিজেকে চেনানোও যায় না, অপরকে আবিষ্কার করাও চলে না। আলোটা থাক্।

দুজনের মাঝখানে ব্যবধান ঠিকই রইলো। বিছানার একধারে শুয়ে বীরেশ অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকলো, জেগে আছো?

কথার প্রতিধ্বনিতে নববধূ একটু ন'ড়ে উঠলো মাত্র, উত্তর দিতে পারলো না। বীরেশ বললে, শুভদৃষ্টির সময় তুমি মাথা নীচু করেছিলে, মুখ তুলতে পারোনি, মনে আছে?

হুঁ। অনন্ত রহস্যপাথার থেকে উপরভাগে যেন ছোট্ট একটি বুদ্বুদ ফুটে উঠলো।

বীরেশ প্রশ্ন করলো, তোমার নামটা আমাকে বলবার কেউ দরকার মনে করেনি। নাম কি তোমার?

নিঃসঙ্কোচ সুস্পষ্ট জবাব এলো, লীলাবতী।

তুমি জানো, এ বিয়েতে আমার মত ছিল না এবং আজো নেই?

লীলাবতী বললে, জানি।

জানো? তোমার বয়স কত?

আঠারো।

উত্তপ্তকণ্ঠে বীরেশ বললে, মিছে কথা। তোমার বয়স তেরো।

কয়েকটি মুহূর্তের কঠিন স্তব্ধতা। তারপর আস্তে আস্তে উঠে লীলাবতী মশারি থেকে বেরিয়ে এসে মেঝের উপর একখানি শতরঞ্চি পাতলো। মৃদু এবং কঠিনকণ্ঠে কেবল বললে, মিছে কথা আমি কখনো বলিনে।—এই ব'লে বালিশ না নিয়েই আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে সে শতরঞ্চির উপর শুয়ে পড়লো।

নববধূর পক্ষে এর চেয়ে বড় প্রতিবাদ জানানো আর কী হতে পারতো? বীরেশ কেবল স্তব্ধ হয়ে এই কঠিন আত্মাভিমানের দিকে

চেয়ে রইলো। আশ্রিত বালিকার প্রতি এই নির্দয়তা সংশিক্ষার পরিচয় নয়—নলিনী একথা বলতে পারতো। কিন্তু আহত বীরেশ নিজেকে শক্ত ক'রে ধ'রে রাখলো।

পাকস্পর্শের দিনটা নানা গোলমালেই কেটে গেল। যারা যাত্রী আর নিমন্ত্রিত, তারা বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের শেষ আলো ম্লান হয়ে এলো। এর পরে পরিবারের যে চেহারাটা দাঁড়ালো সেটা আকণ্ঠ নির্জনতায় ভরা। বাবার এক পিসি রইলেন, তিনি রাঙাদিদি।

কিন্তু ব্যাপারটা চাপা রইলো না। নববধূ যে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী নয় এই সংবাদ আবর্তিত হয়ে গিয়ে উঠলো অধিনায়কের কানে। সুরেনবাবু বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কেন?

রাঙাদিদি বললেন, শুভদৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা হয়নি। এ তুমি কী করলে, সুরেন?

সুরেনবাবু বললেন, এর মানে কি, পিসিমা?

মানে, রূপ আছে, গুণ নেই,—আমি তুমি যে কালের ওরা সে যুগের নয়,—একথা তুমি ভুলে গিয়েছিলে।

বৌমার গুণের অভাব কি, শুনি?

সে গ্রামের মেয়ে, সে শিক্ষিত নয়, তার রুচি নেই।—রাঙাদিদি একেবারে গল্পের চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে দিলেন।

সুরেনবাবু বললেন, কিন্তু এসব নালিশ ত আমি শুনবো না। আমি নিজে বিচার করে মেয়ে দেখে এনেছি এই যথেষ্ট। তাকে বিনা প্রতিবাদে অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে হবে, এই আমার বিধান।

রাঙাদিদি বললেন, কিন্তু তোমার ছেলে কল্‌কাতা শহরে থেকে এম্‌-এ, বি-এল পাস করেছে। তার চেহারা অন্য রকম।

আমি করি নি এম-এ পাস ?

দিনকালের তফাৎ আছে, সুরেন।

তুমি কি বলতে চাও, পিসিমা ?

কিছু না। আমি শুধু কাঁদতে চাই আমার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে। আমার জন্যে একখানা গাড়ী ডাকিয়ে দাও।—এই বলে রাঙাদিদি চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

কিন্তু রাঙাদিদি গেলেন না, সমস্ত বাড়ীটায় রুদ্ধকণ্ঠ বৈরাগ্য দেখে তিনি চলে যেতে পারলেন না, তিনিই এদের মধ্যে একমাত্র সচল, এ বাড়ীর জীবন-চেতনাকে সক্রিয় রাখবার জন্য মুখ বুজে তাঁকে অধিষ্ঠিত থাকতেই হোলো। এ বিয়েতে তাঁরও মত ছিল না, তিনিও স্পষ্ট জানিয়েছিলেন। বর-কনের মধ্যে আপোষের চেষ্টা তিনি করেন নি। বড় ঘরের বউ তিনি, উচ্চ শিক্ষিত শ্বশুরকুলে তিনি আবাল্য মানুষ, স্বামীর কাছে তিনি অনেক দূর অবধি লেখাপড়া শিখেছিলেন, তিনি নিজে তাঁর ছেলেমেয়েকে বিলাতে পাঠিয়েছিলেন,—তাঁর বিষয়কর্মের ব্যবস্থা তাঁর নিজেরই হাতে। প্রতিরাত্রে কৃষ্ণের অবতারণার আলোচনায় তিনি সমস্ত থাকেন, এবং তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ হবার ঠিক সময়টিতে লীলাবতী তাঁর কাছে এসে শোয়। বালিকার কোনো চাঞ্চল্য, কোনো মনোবেদনা অথবা বিকার নেই। একটা আশ্চর্য্য বৈরাগ্য আর কাঠিন্য দিয়ে তার চারিদিক মোড়া।

একদিন রাত্রে রাঙাদিদি বললেন, লেখাপড়া তুই কতটুকু জানিস ভাই ?

লীলাবতী বললে, সামান্য।

স্বামীকে খুশি করবার কি কোন অস্ত্র তোর হাতে নেই ? মন ভোলাতে পারিসনে ?

খুশি যে নয় তার মন ভোলাবো ?—সামান্য তীব্র হাসির ঝলক তার

মুখের কাছে এসে ফিরে গেল, কিন্তু ওইটুকুতে রাঙাদিদি চমকে উঠলেন। আর যাই হোক এ-মেয়েকে উপদেশ দিয়ে তৈরী ক'রে তোলা সহজ নয়।

আর একদিন তিনি প্রশ্ন করলেন, বীরেশ কি তোর সঙ্গে কথা বলে না বৌ?

লীলাবতী বললে, যা বলেন তা বুঝতে পারি নে।

লেখাপড়ার কথা বলে?

না।

তবে?

লীলাবতী চুপ করে রইলো। উদ্বিগ্ন রাঙাদিদি বললেন, এ'তে তোমাদের ভালো হচ্ছে না ভাই। মুখ দেখাদেখিও তোদের নেই, আমি ত' সব দেখতে পাই।...তুই কি পারবিনে ভাই?

অন্ধকারে লীলাবতী রাঙাদিদির পায়ের উপর হাত রাখলো। বললে, কি করতে হবে বলুন?

রাঙাদিদি বললেন, পোড়া বাঙলা দেশের মেয়ে চিরকাল যা করে? বুঝতে পারলি?

না, রাঙাদিদি।

পায়ে ধরে বল্, হিন্দুর ঘরের মেয়ের আর কোনো উপায় নেই। বলতে পারবি?

লীলাবতী চুপ করে রইলো। আন্দাজে হাত বাড়িয়ে তার পিঠের উপর হাত বুলিয়ে রাঙাদিদি বললেন, এদেশে ছেলেরা থাকে, মেয়েরা থাকে। উঁচু গলায় কিছু বলতে যাওয়া অধর্ম। যারা দাসী তারা পায়ের তলায় থাকবে, মাথা তুলবে না। পরের ঘরে থেকে পরের ভাত খেয়ে পরের পায়ে হাত বুলিয়ে দিন কাটিয়ে দেওয়াই এদেশের সতীত্ব, ভাই।

লীলাবতী রাঙাদিদির পায়ের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিল। অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরে রাঙাদিদি বললেন সংসারের শান্তি রাখার জন্যে যদি চাকার তলায় বুক পেতে দিতে হয়, কেউ ফিরেও চাইবে না। মান সম্ভ্রম খুইয়ে নিজেকে নষ্ট করলে তবেই ওরা বলে, লক্ষ্মী বউ। যা ভাই লীলা, তুই এখুনি যা—পায়ে জড়িয়ে ধরে বল্, আশ্রয় দাও, পায়ে ঠেলো না।

রাঙাদিদির কণ্ঠস্বরে চকচকিয়ে লীলাবতী চুপ করে রইলো। তাঁর কথার তলায় কি যেন প্রকাণ্ড একটা বিদ্রূপ নিহিত আছে। বৃদ্ধার সমগ্র জীবনের ভিত্তি, যেন মনে হয়, বিপ্লববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মুখের ভাষায় যেন কেমন একটা অন্তর্নিহিত সমাজদ্রোহিতার স্ফুলিঙ্গ। লীলাবতী স্তব্ধ বিস্ময়ে কাঠ হয়ে বসে রইলো। রাঙাদিদি এক সময়ে বললেন, কই গেলিনে যে?

লীলা বললে, আমি ত কোনো অন্যায় করিনি, রাঙাদিদি?

বালিকার কণ্ঠে অবিচলিত কাঠিন্য অনুভব ক'রে রাঙাদিদি তৎক্ষণাৎ বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা—থাক্।—অন্যায়! মেয়ে হয়ে এদেশে জন্মেছিস্, এই ত সবচেয়ে বড় অন্যায়, পোড়ারমুখী?—তবে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাক্।

কেমন যেন একটা স্বস্তি পাওয়া গেল এই বৃদ্ধার কাছে। লীলাবতী প্রায় কণ্ঠলগ্ন হয়ে রাঙাদিদির কাছে শুয়ে পড়লো। মরুভূমিতে সে এই ক'দিন বিচরণ করেছে, খুঁজতে খুঁজতে মরুদ্যানে সে এসে পৌঁচল। বৃদ্ধার পাশে শুয়ে তার মনে হ'তে লাগলো যেন এক বৃহৎ বনস্পতির কোটরে তার আশ্রয় মিলে গেছে, ঝড়ে বন্যায় নির্ভয়ে এখানে আত্মগোপন করা যায়। লীলাবতী নিশ্চিন্ত শান্তিতে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লো।

দুই

আট দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে গেল। এই আটদিনে প্রতি পদে লীলাবতীর কাঁটা ফুটেছে, প্রতি পলকে তার বুকের এক সঙ্গোপন কোণ থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছে। অলক্ষ্যে সে রইলো, গ্রামের মেয়ের ভাবাহীন মুখের চেহারায় বেদনার ইতিহাস পড়তে পারা গেল না,—এবং অলক্ষ্যেই এই আটদিনে তার বয়স আট বছর বেড়ে গেল। এমন পর্যায়ক্রমে পরাজয়প্রাপ্তি তার জীবনে এই প্রথম—এই বীভৎস দিন-যাপনের ঘৃণায় তার আকণ্ঠ ঘিন্‌ঘিন্ করতে লাগলো। বিবাহিত জীবন কুশ্রীতার ভরা, নারীর জীবন পাপ-পঙ্কিল, পত্নীর জীবন ক্রীতদাসীদের অবমাননায় ধূলাবলুণ্ঠিত।

বিবাহের অষ্টম দিনে একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার আছে, সুরেন্দ্রবাবু সে কথা ভোলেননি। আগের দিন রাত্রে তিনি জানিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর নির্দেশক্রমে বীরেশ যথারীতি সকালবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। অষ্টমঙ্গলার লগ্ন সকালের দিকে, কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুরেনবাবু যতই ব্যস্তভাবে ভিতরে বাহিরে পায়চারি করতে লাগলেন, ততই বীরেশের দিক থেকে দীর্ঘসূত্রতা প্রকাশ পেতে লাগলো। অবশেষে তিনি গলা বাড়িয়ে জানাতে বাধ্য হলেন, আর আধঘণ্টার বেশি সময় নেই।

বীরেশ এক সময় ব'সে বললো, আমার যাবার উৎসাহ নেই।

কথাটা আলগোছে সুরেন্দ্রবাবুর কানে গেল। তিনি একে আত্মাভিমানী দাম্ভিক মানুষ, তার উপর গত কয়েক দিনে উত্তাপ জমেছিল মনে মনে। ফিরে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, উৎসাহ তোমার নেই কেন, বীরেশ?

বীরেশ মাথা তুললো না, কিন্তু মেঝের উপর আঙুল দিয়ে দাগ কেটে বললে, প্রত্যেক দিন একটা না একটা আচার অনুষ্ঠান পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু এ যে সামাজিক অনুষ্ঠান। মাথায় টোপর দিয়ে বিয়ে করতে যাওয়ার মানে, এই সমস্তগুলোকে নির্বিচারে মেনে নেওয়া। সুতরাং তোমাকে যেতেই হবে।

ফস্ করে বীরেশ ব'লে বসলো, আমি নিজের ইচ্ছেয় মাথায় টোপর তুলিনি। এ বিয়েতে আমার মত ছিল না।

সংযত কণ্ঠে সুরেন্দ্রবাবু বললেন, তবে করলে কেন?

আপনার পীড়াপীড়ির জন্যে।

বেশ, সেই পীড়াপীড়ি আজো ফুরোয়নি। পরিবারের সম্মান রাখার জন্যে আজো তোমাকে এই অনুষ্ঠান পালন করতে হবে। যাও, আর সময় নেই।

বীরেশ যেন সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ঝড়ের আগে যে-আয়োজন সেই আয়োজন ছিল তার উপবাসী বুকের মধ্যে। পুরুষের জীবনে যেখানে সকলের বড় চেয়েছে, সেখানেই সে যেন সকলের বড় মার খেয়েছে। সে যে ধৈর্য হারাবে, অসংযত হয়ে উঠবে এতে বিস্ময় নেই। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে সে বললে, আপনার এই নির্দেশ পালনে পরিবারের সম্মান হয়ত বাঁচবে, কিন্তু আমার মাথা অপমানে হেঁট হয়ে যাবে।

সুরেনবাবু দু পা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমার এ কথার মানে?

মানে এই, এ বিয়েতে আমার সমস্ত মন বিদ্রোহ করেছে। আমার রুচি, আমার আদর্শ, আমার শিক্ষা—এ বিয়েতে সায় দেয় না। সমস্তটা জবরদস্তি করে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারা

আমাকে দিয়ে আদেশ পালন করাচ্ছেন কেবল অভিভাবকত্বের সুযোগ নিয়ে। কিন্তু এ আমি সইবো না।

সুরেন্দ্রবাবু স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে বললেন, তুমি কি চেয়েছিলে, শুনি?

বীরেশ বললে, সে আপনাকে এখন বলা মিথ্যে! কিন্তু আমি যা চাইনি তাই আমার উপরে চাপানো হয়েছে।

কিন্তু মালাবদল পাড়ার লোকে করেনি, করেছিলে তুমি।

করেছিলাম আপনার সম্মান রক্ষার জন্য।

আমার সম্মান রক্ষার জন্য প্রথম কাজটা তুমি করেছিলে, দ্বিতীয়টা করছ না কেন?

বীরেশ চুপ ক'রে রইলো। সুরেন্দ্রবাবু পুনরায় বললেন, লেখাপড়া শিখেছ অনেক কিন্তু বাঙালীর ঘুণধরা মেরুদণ্ড তোমার মধ্যে। সৎসাহসের দরকার ছিল যখন, তখন বাইরের সমাজে মাথা তুলে প্রতিবাদ জানাতে পারোনি, আজ সামান্য আনুষ্ঠানিক আনন্দকে বিষাক্ত করবার জন্যে ঘরের মধ্যে বিক্রম প্রকাশ করছ। ঘরের মধ্যে বসে বীরের অভিনয়ে না আছে বীরত্ব, না আছে যশ। এই ব'লে তিনি নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই কয়েকটি ছেলে মেয়ের সঙ্গে একজন বয়ীয়সী মহিলা সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠে এলেন। তাঁদের কাজে রাঙাদিদি সকালের দিকে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি বেরিয়ে এসে হাসি মুখে দাঁড়ালেন।—বললেন, বৌমা, এসো মা এসো, ওমা নলিনী যে? সকাল বেলায় মাসি-বোনঝি মিলে আমাদের পাড়ায় কেন গো?

বীরেশের মামীমা রাঙাদিদির পায়ের ধুলো নিয়ে হাসি মুখে উঠে

দাঁড়ালেন ? বললেন, আজ ত' অষ্টমঙ্গলা। কই, এরা যায়নি কেন এখনো ?

রাঙাদিদি বললেন, বড় জ্বালায় পড়েছি মা।' তোমরা যা হোক ব্যবস্থা করো। নলিনী, তোমাকে ওরা একটু ভয় করে, তুমি একবার দেখো মা, যদি বীরেশ তোমার কথা শোনে।—গলা নামিয়ে পুনরায় বললেন, সকাল বেলায় বাপ বেটায় এক চোট বচসা হয়ে গেছে।

নলিনীর মুখে চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো। বললে, নতুন বৌ কোথায় ?

কল-ঘরের দিকে।

পিছনের বারান্দা পার হয়ে বাথরুমের দিকে পা বাড়াতেই লীলাবতীকে পাওয়া গেল। নলিনী এগিয়ে গিয়ে হেসে তার চিবুক নেড়ে বললে, সকাল বেলায় লক্ষ্মীপ্রতিমা দর্শন! আমি যে এলাম তোমাকে সাজিয়ে দিতে।

লীলাবতী বললে, একা ফেলে পালিয়েছিলেন, এতদিনে মনে পড়লো বুঝি ?

একা ?—নলিনী হেসে কুটি কুটি। বললে বিয়ে করিনি এখনো, তাই বলে কি আমি এতই অজ্ঞান ? একা না থাকতে পেলে তুমি যে আমাদের মুণ্ডপাত করতে ? কাপড় চোপড় কোথায় ?

রাঙাদির ঘরে।—

বিস্ময় প্রকাশ ক'রে নলিনী বললেন, কেন ? বীরেশের ঘরে থাকে না তোমার জিনিসপত্র ?

না।—বলে লীলাবতী মুখ ফিরিয়ে নিল।

নলিনী বললেন, তোমরা যাবে কখন ?

লীলাবতী তার মুখের দিকে তাকালো, পরে চট্ ক'রে বললে,

আপনি বিশ্রাম করুন, আমি এক্ষুণি আসছি কাপড় ছেড়ে। এই বলে সে অন্যদিকে চ'লে গেল।

বাড়ীর সমস্ত আবহাওয়াটা থম্ থম্ করছে। অমঙ্গল না হোক, অশান্তির একটা ছায়া যেন সর্বত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিজের মনের আতঙ্ক এবং চিত্তের এই বৈলক্ষণ্য এ বাড়ীতে প্রকাশ করে বলা নলিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। যে নিগূঢ় কারণ আজকের এই অশান্তির চক্রান্তে বাঁধা, সে-সংবাদ হয়ত নলিনীই কেবল জানে, আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং মুখের হাসি এবং গতিবিধির সহজ স্বাচ্ছন্দ্য স্বাভাবিক অধ্যবসায়ে বজায় রেখে সে পুনরায় দালান পেরিয়ে এলো।

ছেলেমেয়েরা খেলা নিয়ে মেতে রয়েছে, মাসিমা বাড়াদিদিকে নিয়ে একান্তে পারিবারিক আলাপ নিয়ে ব্যস্ত। সুরেনবাবু নিজের ঘরে গিয়ে গোধূলি বরকনের বিদায়ের লগ্নে অপেক্ষায় রয়েছেন। সমস্তদিকে একবার তাকিয়ে নলিনী বীরেশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বীরেশ তখন বিছানার উপর মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে।

নলিনী হাসিমুখে ডাকলো, নতুন বউ পেয়ে আটদিন বুঝি রাত্তে ঘুম হয়নি, তাই ঘুমিয়ে নিচ্ছ? নাও ওঠো, যেতে হবে মনে নেই?—এই ব'লে ভিতর ও বাহিরের সমস্ত জানালাগুলো একে একে খুলে দিল।

বীরেশ মুখ তুলে বললে, আমি বলে দিয়েছি আমি যাবো না।

কেন?

এ বিয়ে আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না।

নলিনী উচ্চকণ্ঠে বললে, মন্ত্র প'ড়ে বউ ঘরে এনেছ, মনে আছে সে-কথা?

মন্ত্র আমি পড়িনি, নলিনী।

মাথায় টোপর দিয়েছ, পিঁড়িতে বসেছ, সাতপাক ঘুরেছ, বাসরে ঢুকেছ, গাঁটছড়া বেঁধে বউ এনেছ সঙ্গে—এই যথেষ্ট। সমস্ত সমাজের কাছে স্বীকার করেছ!

তবু এ বিয়ে আমি মানিনে।

মানো না, কিন্তু বালিকা বউ তোমার কাছে কী অপরাধ করেছে, বীরেশ?

অপরাধ সবাই করেছে তার ওপর, আমি করিনি।

নলিনী বললে, তোমার আইন-পড়া বিদ্যে কি এই কথা বলে? আটদিন আগে তুমি ত নাবালক ছিলে না! তুমি এমন জায়গায় আঘাত করতে চাইছ যেখান থেকে প্রতিঘাত আসবে না। এক বালিকার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চাও স্বেচ্ছাচারে! এই বীরত্ব দেখাবে বলেই বুঝি তোমার বীরেশ নাম রাখা হয়েছিল!

বীরেশ উঠে বসলো। বললে, নলিনী, তুমি জানো যে, ওই বউকে নিয়ে আমি কোনোকালে ঘর করতে পারবো না?

কিন্তু এই ত' আটদিন ঘর করলে।

একদিনও করিনি, সমস্ত দিনে রাত্রে আমার সঙ্গে-এক মিনিটও দেখা হয় না। তুমি জানো, ভালো ক'রে আমি তার মুখও দেখিনি আজও?

বিবর্ণ ভয়ার্ত মুখে নলিনী বললে, সে কি?

বীরেশ বললে, হ্যাঁ, বাবার অসঙ্গত অভিভাবকত্বের এই পরিণাম।

নলিনীর চোখে জল এলো। বললে, কিন্তু এ যে তোমার ভুল হচ্ছে, বীরেশ।

বাবার ভুল আরো অনেক বড়। আমার সকল প্রতিবাদ উপেক্ষা ক'রে কেবলমাত্র গায়ের জোরে তিনি এই কাজ করেছেন।

বউকে কি তোমার ভালো লাগেনি?

মেয়েটিকে ভালো লেগেছে, কিন্তু স্ত্রী হিসেবে আমি তাকে গ্রহণ করবো না।

মেয়েটির ভবিষ্যৎ?

অন্ধকার।

এরপর তুমি কি করতে চাও? একথা তুমি জানো, জীবনে যা কিছু চাওয়া যায় তা সব পাওয়া যায় না?

বীরেশ তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। পরে বললে, মাথায় খোঁপায় তুমি রক্তজবা পরে এলে কি আমাকে এই কথা জানাতে?

না, ওটা বিয়ের সংকেত, তোমাকে সাবধান করতে এলাম।

বীরেশ বললে, নলিনী, একসঙ্গে দুজনে এম-এ পাশ করেছিলুম, কত ব্যর্থ স্বপ্ন দেখেছি মনে পড়ে? আজ সব চুর্ণ হয়ে গেছে।

নলিনী মুহূর্তের জন্য এদিক ওদিক তাকালো। তারপর চক্ষের পলকে বীরেশের একখানা হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, আমার কথা রাখো, লীলাকে নিয়ে কাজ সেরে এসো।—এই যে বৌদিদি, আমি এই ঘরে, বড়বাবুর মান ভাঙাচ্ছি। আঃ যাও বীরেশ, আর দেরি ক'র না।

কিন্তু মামীমা এসে ঘরে ঢোকবার আগেই বীরেশ উঠে বাথরুমের দিকে চ'লে গেল। যে-মন্ত্র তার কানে ঢুকলো তারপরে প্রতিবাদ জানাতে আর তার সাহস হোলো না।

স্ত্রীকে নিয়ে যথাসময়ে সে যাত্রা করলো। লীলাবতীর আত্মীয় স্বজন থাকেন পূর্ব-দক্ষিণ দেশের কোন্ গ্রামে। তার মা জীবিত, বাপ নেই। পারিবারিক অবস্থা বেশ ভালো। দুটি বড় ভাই, তারা বিদেশে চাকুরী করে। বিয়ের সময় তারা ছুটির অভাবে এসে পৌঁছতে পারেন নি। লীলাবতীর মা জমিদার বাড়ীর ছোটবউ। লীলাবতীর মামা থাকেন কলিকাতায়, সেখানেই সে গেছে।

পরদিন সকালে বীরেশ ফিরে এলো, এবং এলো সে একা,—সঙ্গে লীলাবতী নেই। সুরেনবাবু, রাঙাদিদি, মামীমা, নলিনী সকলেই এসে দাঁড়ালেন। সুরেনবাবু প্রশ্ন করলেন, বৌমাকে কি রেখে এলে?

বীরেশ বললে, আপনার অমতে রেখে আসতে আমি চাইনি কিন্তু তিনি নিজেই আসতে চাইলেন না।

কেন?

বীরেশ একবার সকলের মুখের দিকে তাকালো। বললে, এ বাড়ীতে তাঁর আসতে রুচি নেই এই কথাই আমাকে ব'লে দিলেন।

রাঙাদিদি বললেন, ওমা নতুন বৌয়ের মুখে এসব কি কথা? তুই কি বললি?

কিন্তু বীরেশের উত্তর শোনবার আগেই কাঁপতে কাঁপতে সুরেনবাবু নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সমস্ত পৃথিবী, সমগ্র সৃষ্টি, পারিবারিক হিতাহিত এবং তাঁর নিজের ইহকাল পরকাল অন্ধ ছায়ার মতো তাঁর চোখের সামনে দুলতে লাগলো। তাঁর দম্ভ, তাঁর শাসন, তাঁর অধিনায়কত্ব এবং পিতৃত্ব—সমস্তর বাইরে এমন একটা কিছু শক্তির ষড়যন্ত্র চলেছে যার উপর তাঁর একেবারেই হাত নেই। নিরুপায় আশ্রয়ের জন্য তাঁর ক্লিষ্ট হৃদয় চারিদিক হাতড়াতে লাগলো।

নলিনী একটু আড়ালে স'রে গেল। রাঙাদিদি স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন, মামীমা প্রশ্ন করলেন, তুমি কি বললে?

বীরেশ বললে, আমি জিজ্ঞেস করলুম, এই কি তোমার শেষ কথা?—তিনি বললেন, যে-বাড়ীতে আদর করে আমাকে স্থান দেওয়া হয়নি, সেই বাড়ীতে পায়ে ধ'রে আমি থাকতে পারবো না, আমি জানবো যে আমার বিয়ে হয়নি। অপমানের প্রতিশোধে নিজেকেই আমি ধ্বংস করবো।

মামীমা বললেন, নতুন বৌয়ের এত বড় আস্পর্দা?

নলিনী বেরিয়ে এসে বললে, মাসিমা, নতুন বৌয়ের স্পর্ধাটাই দেখলে কিন্তু পরের মেয়েকে নতুন ঘরে এনে অভদ্রভাবে যারা আটদিন ধ'রে তাকে অকথ্য অপমান করে তাদের কি তুমি শিক্ষিত বলবে, সম্ভ্রান্ত বলবে? তোমার ভাগ্নে কি-ভাবে সেই নাবালিকাকে খুঁচিয়েছে একবার ভাবো দেখি? আজ সকলের মুখে সে কলঙ্ক মাখিয়ে দিল।

রাঙাদিদি বললেন, নাবালিকা মেয়ের কথা ধরতে নেই। মন ভালো হ'লে সে আবার আসতে চাইবে। শাস্ত্রমতে-বিয়ে, এ কি আর ভাঙে বাবা? আর সে যদি দুকথা বলেই থাকে, তার মামা-মামীরা ত আর সে কথা বলেনি!

তাদেরও একই মত।—ব'লে বীরেশ ঘরে গিয়ে ঢুকলো। নলিনী দাঁড়িয়েছিল, ভিতরে এসে বললে, তাদের মত তুমি কি করে জানলে?

রাত অবধি জানতে পারিনি। খেয়ে দেয়ে একলা ঘরে ঘুমিয়েছি, সকালে আসবার সময় সকলের কথা জানতে পারলুম।

বৌ কোথায় ছিল?

তার মামীর কাছে।

আসবার সময় তুমি কি ব'লে এলে?

বললাম, বিয়ে আমাদের হয়নি একথা ভালো করে জানাবার আর জানবার ব্যবস্থা আমি শীঘ্রই করবো।

নলিনী আর পারলো না, কেমন একটা অবারণ উচ্ছ্বাসে তার দীর্ঘায়ত দুই চোখে অশ্রু ভ'রে এলো। মৃদুকণ্ঠে বললে, এ যে তুমি কি করলে কিছুই বোঝা গেল না। সমস্ত বিয়ের ব্যাপারটাই যেন ছেলেমানুষী, বোকামী, হঠকারিতা আর অজ্ঞানের ইতিহাস। তুমি

আগে ছিলে বুদ্ধিমান চকচকে যুক্তিবাদী—কিন্তু হয়ে গেলে নির্বোধ, একগুঁয়ে। যে সহপাঠীর সঙ্গে পড়েছি সে তুমি নয়, তোমার খোলস। ……এর পরে কি করবে শুনি ?

বীরেশ বললে,আগাগোড়া জানবার অধিকার ত' তোমার নেই ?

আছে কিনা সে-আলোচনা তোমার সঙ্গে করবার আর আমার রুচি নেই। তবু জানতে চাইছি, বলো।

কে তুমি ?

নলিনী বললে, কেউ নই, আমি ভদ্রসমাজের হয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তোমাকে জবাব দিতে হবে।

বেশ, তাহ'লে শুনে রাখো। লোকমুখে যদি সংবাদ না পাও তাহলে সংবাদপত্রেই সে খবর পাবে।

নলিনী শিউরে উঠে বললে, কি বলছ তুমি ?

বলছি খুব ভেবে চিন্তে।

নলিনী দু' পা এগিয়ে গেল। তার চিবুক কাঁপছিল, আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললে, আবার বলো ত' কি বলছিলে ? বীরেশ, দোষ নিয়ো না কিছু, আমি আর আগেকার মতন ক'রে তোমাকে ঠিক বুঝতে পাচ্ছি নে।

বালিশে মুখ গুঁজে বীরেশ বললে, কেন বলো ত' নলিনী ?

নলিনী বললে, তুমি কি আগের মতন আছো ?

বীরেশ বললে, মাথার ব্রহ্মতালুতে যদি হাতুড়ি মারা যায়, সহজ বুদ্ধিমান মানুষও পাগল হয়। এর চেয়ে বেশি কি জানতে চাও, বলো ?

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য নলিনীর দুই পায়ে একবার বেগ এলো কিন্তু সে নড়লো না, বললে, এইবার নির্লজ্জভাবে বলো দেখি, লীলাকে তুমি পছন্দ করলে না কেন ?

বীরেশ বললে, পছন্দ ত করেছি।

গ্রহণ করতে পারবে না কেন?

তুমি এত নির্বোধ নও যে আগাগোড়া তোমাকে বোঝাতে হবে। আমি মানুষ হয়েছি অদ্ভুত জীবনযাত্রায়, স্বভাব তৈরী হয়েছে আধুনিক কালের জটিল সমস্যাবাদে—নিরাশায়, সন্দেহে আর বিশ্ব জোড়া অশ্রদ্ধায় আমার প্রাণের পথঘাট দিশাহারা—আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে এক গ্রামের মেয়েকে উদ্‌ভ্রান্ত করতে পারবো না ত?

এমন সময় চাকর এসে খবর দিল, কর্তাবাবু আজ বেরোন নি, তিনি ঘরে ব'সে রয়েছেন, আপনাকে ডাকছেন। দিদিমণি, আপনিও আসুন।

বীরেশের সঙ্গে নলিনীর চোখাচোখি হলো। বেশ জানা যাচ্ছে, ঝড় একটা আসন্ন। উপরে শান্ত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আলোড়িত হচ্ছে।

যাবার আগে নলিনী বললে, উত্তেজনার যত বড় কারণই ঘটুক তুমি সংযত ভাবে কথা বলবে, কেমন? যাও তুমি আগে, আমি যাচ্ছি।

কথা দিলুম।—বলে বীরেশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নলিনীর পা সরছে না। তার নিজের ভেতরে যে দুর্বলতা আছে সেটা আজ অবধি কোথাও প্রকট নয়, রক্তকমলের কোরকের অন্তরালে সেটা অতি সংগোপনে আছে ঢাকা, বাইরের আলো বাতাসের চেহারা সে দেখে নি। তবু নলিনীর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল। বীরেশের সকল অসন্তোষ আর বিদ্রোহ আর এই বিবাহ-বিচ্ছেদের অতি নিচেকার রহস্য-গর্ভে কিছু কি আছে তার অস্তিত্ব? কিন্তু বাতাস না থাকলেও বেতসপত্র যেমন কাঁপে তেমনি এই তরুণীর অধীর হৃদয় ওই দালানটুকু পার হয়ে ঘরে ঢোকার পথে অকারণ শির্ শির্ করতে লাগলো।

ঘরের ভিতর আকণ্ঠ স্তব্ধতা। জানালার বাইরে চেয়ে সুরেনবাবু নীরবে বসে রয়েছেন, ওদিকে মেঝের উপর বসে বীরেশ মাথা হেঁট করে

রয়েছে। নলিনী মুহূর্তের জন্য একবার দাঁড়ালো, তারপর বললে, আমাকে ডাকছিলেন ?

নিশ্বাস ফেলে সুরেনবাবু বললেন, হ্যাঁ, বসো। দু'চারদিন থাকো তোমরা, বাড়ীটা ভারি শূন্য ঠেকছে। আচ্ছা নলিনী, তুমি ত যথেষ্টই শিক্ষিত, কলকাতায় থেকে এম-এ পাশ করলে। এ ব্যাপারটায় তোমার কি মনে হয় বলো ত ?

চৌকির উপরে বসে নলিনী বললে, ব্যক্তিগত ব্যাপার কিনা, বলা ভারি কঠিন।

তা বটে।—সুরেনবাবু বললেন, কিন্তু মনে আছে ত' ফরাসীদের দেশেও এই সেদিন পর্যন্ত— মানে উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকেও—মা বাপ ছেলে মেয়ে খুঁজে দিত, ছেলেমেয়েরা তাদেরই সানন্দে বিয়ে করতো। সুখীও হোতো। আমি কি ভুল করেছি ?

নলিনী বললে, আপনি ভুল করেছেন একথা আমার একবারও মনে হয়নি।—এই বলে অলক্ষ্যে সে একবার বীরেশের দিকে তাকালো। বীরেশ তেমনি স্তব্ধ নত মুখে ব'সে রয়েছে, কোনোরূপ চাঞ্চল্য তার নেই।

সুরেনবাবু বললেন, প্রথমটাই ধরা যাক—বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহে আজকাল ছেলেমেয়ের সুবিধে কিম্বা অসুবিধে সে-আলোচনা থাক্, কিন্তু বিজ্ঞান আলোচনায় দেখা গেছে, বিবাহের যা চরম প্রয়োজন, বেশি বয়স হয়ে গেলে সেখানে বিকৃতি ঘটে—স্বাস্থ্য, আয়ু, আনন্দ, এগুলো সবই বিপন্ন হয়। আর সুবিধার দিক থেকে যদি বলো,—তাহ'লে ধরো সাধারণ বাঙালীর পরমায়ু। গড়ে যে দেশের লোক চব্বিশ বছর বয়স অবধি বাঁচে তারা সন্তান মানুষ করবে কবে ? সন্তান মানুষ করার জন্য যে-সাধনা আর অধ্যবসায়, যে ত্যাগস্বীকার আর কষ্টসহিষ্ণুতা, সে সবই যৌবনকালের পক্ষে সম্ভব। প্রৌঢ়ত্বে আর বার্ধক্যে জীবনে বিতৃষ্ণা না এলেও আসে

ক্লান্তি, আসে উপেক্ষা—সকলের প্রতি আসে একটা স্বাভাবিক বৈরাগ্য। নলিনী, আমি সেইদিক থেকে বিচার করেছি।

এখানে মন্তব্য করা মানানসই হবে না। নলিনীর নিজের বয়স বাইশ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মতামত যা-ই হোক না কেন, নীরব থাকাই শোভন হবে। নলিনীর মাথা নত হয়ে রইলো।

সুরেনবাবু বলতে লাগলেন, তোমাদের নিয়ে আলোচনা করার মানে এই, আমি নিজেকেও বোঝবার চেষ্টা করছি। আমি পণ্ডিত তা বলিনে আমি সবই বুঝি তাও মানিনে, কিন্তু বয়স হয়ে জেনেছি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আমার আছে,—ব্যক্তির দায়িত্ব যেমন সমাজে। বলতে পারো সমাজ মানিনে, বলতে পারো শৃঙ্খলা মানিনে—কিন্তু মানতে হবে একটা, যেখানে গোষ্ঠির কথা আসে। মরুভূমিতে যাও সেখানে সমাজ মানার দায়িত্ব নেই, অরণ্যে যাও সেখানে কর্তব্য নেই, হিমালয় পর্বতের চূড়োয় যাও সেখানে অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষ তা যায় না, মানুষ যায় মানুষের কাছে। মানুষের জটলার ভিতর দিয়েই মানুষ পথ কেটে চলে। এই শৃঙ্খলাবোধ যারা ভাঙে, যারা মানুষের ভিতরে থেকেও মানুষের বহুকালের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে কেবল খেয়াল খুশিতে ভাঙতেই চায়, গড়তে চায় না—তাদের আমরা পাগল বলি, তাদের স্থান গারদে। যারা বড় প্রতিভা তারা ভাঙে কেবল নতুন ক'রে গড়বার জন্যে, তারা বর্তমানের ছাঁচে অতীতকেই আবার সৃষ্টি করে—তাদের ভাঙাও ভীষণ, গড়াও বিপুল। তারা আসে বহুযুগে একবার মাত্র।

বীরেশ একবার মুখ তুলে আবার নত হয়ে রইলো। সুরেনবাবু ঈষৎ হেসে বললেন, আর শিক্ষার কথা? ওদের দেশের পৌরাণিক পিগ্‌-ম্যালিয়নের কথা মনে পড়ে,—পাথর থেকে মানুষ হবার সাধনা? ওই যেছোমাদের বার্নার্ড্ শ' যা নিয়ে আধুনিক সাহিত্য তৈরি করলেন।

একটি অশিক্ষিত নীচ জাতের সাধারণ মেয়েকে তৈরী করা হলো নানারূপ বিদ্যাশিক্ষার রসায়নে, নানাবিধ জারক রসে,—মেয়েটা অবশেষে লণ্ডনজার মারফতে রাজার কোর্ট অবধি গিয়ে হাজির হোলো। অদ্ভুত কাহিনী। যদি বস্তু ভালো হয়, ধাতু যদি আসল হয়, তার থেকে ভালো ছাঁচ তোলা সহজ। স্বামী-স্ত্রীর দুজনের শিক্ষা যদি দুরকমের হয়—তারা কেউ কারো বশ্যতা, সমতা স্বীকার করতে চায় না, শিক্ষাভিমান-ই তাদের পথে বাধা দেয়। তার চেয়ে গ্রামের পথের কাঁচা নরম মাটিতে প্রতিমা গড়া যায় ভালো,—সেখানে সমস্যা নেই, সন্দেহ নেই। একটি ভদ্রবংশের সুশ্রী মেয়ে—সরল নিরভিমান, অল্প শিক্ষিত, গ্রামের স্বভাবে সে মিষ্টি, সুন্দর নিষ্পাপ,—বহু চিন্তার পরে এমন একটি মেয়েকে ঘরে আনলাম, যে সত্যকার ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করতে পারে। তুমি বলো ত, আমি কি সত্যই ভুল করেছি? একটি মেয়েকে দিনে দিনে আবিষ্কার করা, দিনে দিনে তার চোখে আবিষ্কৃত হওয়ায় কি কোনো আনন্দ নেই, নলিনী?

নলিনী গলাটা পরিষ্কার করে নিল। তারপর বললে, আমি নিজের কথাই কেবল আপনার কাছে বলতে পারি।

তাই বলো, তাই আমি শুনতে চাই। বর্ত্তমান যুগের মন আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে।

নলিনী বললে, বাল্যবিবাহ খুবই ভালো,—যৌথ পরিবারের বাঁধন যতদিন ছিল ততদিন এর বিরুদ্ধে কোনো কথা ওঠেনি। আজকের শিক্ষা আর অর্থনীতির সমস্যায় ব্যক্তি জীবন বড় হয়ে উঠে সেই যৌথ পরিবারের বাঁধন ভেঙে গেছে। পল্লীজীবন ততদিন অক্ষুণ্ণ ছিল যতদিন নাগরিক জীবনের বিভিন্ন বৈচিত্র্য দেখা যায়নি। কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ সে প্রশ্ন আসে না,—কিন্তু আগেকার জীবনের মন্থর গতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ মানিয়ে যেতো, তখন ছেলের আর মেয়ের নিরুদ্বিগ্নভাবে মানুষ হয়ে

ওঠার দীর্ঘ সময় পাওয়া যেতো, কারণ তাদের সামনে কোন সংগ্রাম অথবা সমস্যা ছিল না। তারপর মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ নানাদিকে বেড়ে চললো, বিদ্যা আর শিক্ষার শত শত শাখা প্রশাখা, কত অদ্ভুত বিস্ময় চারিদিকে, কত দ্রুত গতিতে সবাই কতদিকে এগিয়ে চলেছে, অল্প সময়ে অনেক বেশি জানতে হবে, অনেকখানি আয়ত্ত করতে হবে। ধানের গোলায়, গরুর দুধে, যৌথ পরিবারে, বাল্যবিবাহে আর গ্রামের পঞ্চায়েতে যে জীবন ধীরে-সুস্থে হেলে-দুলে চলতো নাগরিক জীবনের গোলকধাঁধায় তার পথ হারিয়ে গেল। ছেলে মেয়ে উভয়েই ইলেকট্রিক মেশিনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চললো, বাল্যবিবাহের কথাটা তাদের মনেই এলো না। বর্তমান যুগের প্রকাণ্ড আপিসে অনভিজ্ঞের জায়গা নেই, সেখানে একেবারে এসে দাঁড়াতে হবে অভিজ্ঞ প্রবীণ হয়ে, তবেই ঠাঁই হবে। কচি ছেলে অথবা কচি মেয়েকে মানুষ করে তুলে তবে ঘরকন্না করতে হবে, ততটুকু সময় হাতে নেই। তাদের হাতে অনেক কাজ, মনে অনেক চিন্তা, মাথায় অনেক সমস্যা।

সুরেনবাবু বললেন, মতের মিল নেই, কিন্তু ভালো লাগছে তোমার কথা। তারপর? তোমার লক্ষ্যটা কোন্‌দিকে, নলিনী?

লক্ষ্য নেই।—নলিনী বলতে লাগলো, এখানে লক্ষ্যের চেয়ে গতির কথাটা বড় আমার মনে হয়। সমাজের ভিত্তি—নীতি আর প্রচলনের ওপর দাঁড়িয়ে। আমাদের প্রফেসর ঘোষের কথাটা খুব ভালো লাগতো। তিনি বলতেন, কোন্ নীতিকে আমরা মানবো, কোন্ প্রচলনকে আমরা স্বীকার করবো? আমরা উত্তর দিতে পারতাম না। যে বিধান এতকাল চলে এলো তাতে আর সান্ত্বনা নেই, বহু অভ্যাসেই সেটা জীর্ণ। অনেকটা যেন মফঃস্বলের আদালত। ওপরে ধর্ম আর ন্যায়বিচারের মুখোস, ভেতরে হাকিম পেশকার থেকে আরম্ভ ক'রে আরদালি মুহুরি

পশ্চাত্ত ঘুষ নিয়ে চলেছে,—এটাও দাঁড়িয়ে গেছে একটা নীতির শামিল। আমরা যে-যুগে দাঁড়িয়ে আছি এর নীচের তলায় প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরি, দিকে দিকে তারই অগ্নিস্রাব দেখা যাচ্ছে। সমাজের কোনো একটা সুস্পষ্ট আকৃতি বর্তমানে নেই; ব্যক্তিগত খেয়াল খুশির ওপরে আজকের ওলোট পালটের যুগে সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

এর পরিণাম কি তোমার মনে হয়?

বলা কঠিন। কারণ বাঙালী সমাজের গতি-প্রগতির আলোচনা করলে দেখা যাবে প্রকাণ্ড বিপ্লবের দিকে এর গতি। নতুন সমাজ সৃষ্টির উৎসাহ কোথাও নেই, কেবল ভাঙনের হাতুড়ির শব্দই চারিদিকে শুনি। মনে হয় আমাদের স্বভাবের মধ্যে ব্যক্তি-জীবনের সর্বাঙ্গীন প্রতিষ্ঠার অভ্যাসের সঙ্গে গণতান্ত্রিক চেতনার একটা প্রবল প্রতিঘাত আসছে। একনায়কত্বের ওপর লোভ আমাদের মজ্জাগত,—আমাদের হিন্দু মুসলমানের ইতিহাসে একনায়কত্ব অর্থাৎ ডিক্‌টেটরশিপ্‌ চিরকাল পুজো পেয়ে এসেছে,—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বুলি বাইরের থেকে এসেছে। আজ বাঙলা দেশের মনে মনে একনায়কত্ব আর গণতন্ত্র এই দুইয়ের প্রবল ঘাত প্রতিঘাত চলেছে; এ বস্তু স্ফীত হয়ে উঠতে আর দেরি নেই,—সুতরাং রাষ্ট্রব্যবস্থার আলোড়নে বিধ্বস্ত সমাজের আকৃতি আর প্রকৃতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে বলা কঠিন। গোষ্ঠি হয়তো আছে, কিন্তু আজকে আর সমাজ নেই; জনতার সমারোহ আছে কিন্তু মানুষের সংখ্যা কম।

নন্দিনী থামলো। একবার চেয়ে দেখলো তার মতামত সুরেনবাবুর উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করেছে কিনা, কিন্তু তাঁর অটল গাম্ভীর্য দেখে কিছুই বোঝা গেল না। চুপ ক'রে ব'সে নন্দিনী নিজের কথাগুলোই মনে মনে বারবার তোলাপাড়া করতে লাগলো।

সুরেনবাবু বললেন, আসল কথায় ফিরে আসা যাক্। যে সমস্যাটা দেখা দিল এতে আমার নিজের কথাটাই আমি বীরেশকে জানিয়ে রাখি। বাইরে যত গণ্ডগোলই দেখা দিক্ আমার নিজের ব্যবস্থাই আমাকে চালাতে হবে, নলিনী। আদর্শের আলোটা আমাকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। বিলেত আর আমেরিকায় আমি নয় বছর ইঞ্জিনীয়ারিং কাজে কাটিয়েছি—ওদের সমাজের উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে নিজের পথ আমি ঠিক করে ফেলেছি। কোনো ভুল আমি করিনি। তোমাদের বর্ত্তমান যুগের গোলক ধাঁধায় প'ড়ে নিজের পথ আমি হারাতে পারবো না, বৌমাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। সরল, সাধু, সৎপ্রকৃতির মেয়ে—এই মডেল্ আমি তুলে ধরতে চাই। যে উচ্চশিক্ষায় সংশয়, অশ্রদ্ধা আর হিংসা আনে, সেই শিক্ষা আমি এই পরিবারে চলতে দেবো না। যাঁকে ঘরে এনেছি, তিনি ঘরেই থাকবেন। তাঁকে স্বীকার করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে—হিন্দু সংস্কার আর আদর্শকে আমি কোনো কারণেই ক্ষুণ্ণ হ'তে দেবো না।

বীরেশ এতক্ষণ পরে মুখ তুললো। বললে কিন্তু যার জন্যে আপনার এই বিধান, তার প্রকৃতির পক্ষে যদি গ্রাহ্য না হয়?

তাতে ভয় পাবো না। বন্যার মতন তাঁকে বরণ ক'রে ঘরে তুলেছি। আমার স্নেহের পরীক্ষা দিতে গিয়ে যে কোনো দুর্যোগ-ই আমি হাসিমুখে সহ্য করবো। এই সান্ত্বনা থাকবে, অন্তরের সঙ্গে যা বিশ্বাস করি, তার জন্যে দুঃখবরণ ক্লেশকর নয়।

কিন্তু আমি যদি এতে সুখী না হই?

সুরেনবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন, নলিনীর কথা শুনে মনে হোলো আধুনিক যুগ আরো সুখী নয়, অসন্তোষ তার প্রকৃতিগত। তোমার ব্যক্তিগত সুখের জন্য একাও প্রাচীন আদর্শ তার সব ঐশ্বর্য নিয়ে ভেঙে

পড়বে,—একটি নিরপরাধ জীবন ধ্বংস হবে,—সেই সুখের প্রশ্রয় আমি দিতে পারবো না। বৌমাকে এ বাড়ীর সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে আমি এনে বসাবো এই আমার শেষ কথা।

নলিনীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল।

বীরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বেশ, কোনোকালেই আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না এই কথাই আমি বলতে পারি। আপনার দিক থেকে যা ন্যায়বিচার তাই আপনি করবেন।—এই ব'লে এগিয়ে এসে সুরেনবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে সে ঘর থেকে উদ্গত অশ্রু চাপতে চাপতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সুরেনবাবু স্থির হয়ে রইলেন এবং ওপাশে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অশান্ত ব্যাকুল হৃদয়ে নলিনী স্তব্ধভাবে ব'সে রইলো।

একটু পরে বাড়াদিদি ঘরে এসে দাঁড়ালেন বললেন, নলিনী, এসো ভাই—ওদের দলে ভিড়ে তোমার কেন মন পাষাণ? কুটুম্বের মেয়ে, সকাল থেকে জলটুকু অবধি মুখে তোলোনি, এসো ভাই।

পিসিমা? সুরেনবাবু ডাকলেন।

বাড়াদিদি বললেন, হেস্তনেস্ত একটা করো বাপু, এসব আর ভালো লাগে না। ছোঁড়ার চেহারা শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে, মুখের দিকে চাইলে কান্না পায়।

সুরেনবাবু বললেন, বৌমা অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছেন জানি কিন্তু আমি গিয়ে দাঁড়ালেই সব ঠিক হবে। এ-বাড়ীর বৌয়ের উপযুক্ত কাজই তিনি প্রকাশ করেছেন। আমি খুশি হয়েছি। কাল আমি যাবো, তাঁকে মাথায় করে ফিরিয়ে আনবো।

তিন

আষাঢ়ের শেষের দিকে শুক্লপক্ষ হলেও আকাশে ঘন বর্ষার ঝমঝম্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দিগন্তজোড়া গুরু গুরু মেঘের ডাক,—অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে চকিত বিদ্যুৎ প্রভায় করালী ভৈরবীর কাল-কটাক্ষ আকাশে-আকাশে জ্ব'লে উঠছিল।

নিজেদের বাড়ীর বাইরের ঘরে আলো জেলে নলিনী একখানা বই হাতে নিয়ে বসেছিল। জানালার শার্সির গায়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা এসে লাগছে, মেঘের গর্জনে কেঁপে উঠছে জানালা দরজা। বর্ষা নিবিড় হয়ে উঠেছে পথে ঘাটে, রাস্তার আলোগুলো ঝাপ্‌সা, ঘোলা জল ছিটিয়ে মোটরের চাকার শব্দ আসছে,—বই হাতে নিয়ে বসেও নলিনীর মন পড়েছিল পথের দিকে।

জানালার শার্সিতে শব্দ হোলো। মুখ তুলে নলিনী বললে, কে ?—কিন্তু ভিজা শার্সির ভিতর দিয়েও সে বীরেশের মুখ দেখতে পেলো। তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজা খুলে দিল।

এত বৃষ্টিতে ?

ভিতরে এসে বীরেশ বললে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। বেশিক্ষণ বসবার সময় নেই, ট্যাক্সি আছে সঙ্গে।

নলিনী উৎকণ্ঠ হয়ে প্রশ্ন করলো, কেন ? কোথায় যাবে ?

কোথায় যাবো সে কথা বলা কঠিন,—তবে যেখানেই যাই চিঠিপত্রে যেন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ থাকে। আমি দুদিন আগেই বাড়ী ছেড়েছি।

দুদিন আগে ! মেসোমশাই কি লীলাকে ওখানে এনেছেন ?

বীরেশ বললে, হ্যাঁ। যে-রাত্রে তাকে আনা হয়েছে সেই রাত্রি থেকেই আমি বাড়ীতে নেই। বাবাকে জানিয়েছি, যেদিন একান্ত ভাবে আপনার আদর্শকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারবো সেইদিন ফিরবো। তার আগে আমাকে খুঁজবেন না।·········আমি জানি বাবা আমার কথা রাখবেন।

আমিও জানি।—ব'লে নলিনী স্তব্ধ হয়ে রইলো।

আমার কোনো ব্যবস্থা কিছুতেই হতে পারলো না নলিনী, এই বোধ হয় নিয়তির নির্দেশ।

নলিনী বললে, একটা চালের ভুলে কতকগুলো জীবন বিপন্ন হোলো বলো ত ? তোমার, লীলার, মেসোমশায়ের,......আরো হয়ত কারো। এর কি কোন প্রতিবিধান নেই, বীরেশ ?

তার গলার আওয়াজ কাঁপলো, কিন্তু বীরেশের সিদ্ধান্ত একটুও কাঁপলো না। সে বললে, না। বাবা পথ ছেড়ে দেবেন না, আমাকেও পথ পেতে হবে। দেখা যাক্ জীবনটা কোন্ খেলায় মাতে। কিন্তু তুমি এর পর কি করবে বলো ত ?

কেমন ক'রে বলবো ?

বিয়ে করবে ত ?

অবান্তর প্রশ্ন করো না, বীরেশ। তোমার মুখ থেকে শুনতে ভালো লাগে না।

বীরেশ কিয়ৎক্ষণ নত হয়ে রইলো। কিন্তু তার দাঁড়াবার সময় নেই। সে বললে, বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছে, হয়ত অনেকদিনের জন্যে। তবু তোমার খোঁজ খবর রাখতে আমার ভালো লাগবে,—তোমার কাছ থেকে দূরে যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন, নলিনী।

নলিনী ভগ্নকণ্ঠে বললে, কেন যাবে তুমি ?

সংসারের নাগালের বাইরে থাকতে চাই, সেই কারণে যাবো আমি

…বীরেশ বললে, জীবনে যা চাওয়া যায় তা'র সবই পাওয়া যায় না এ তোমারই কথা। যাক্‌গে, আমি চললুম—দু পা গিয়ে আবার সে ফিরে এলো। বললে, একটা সাধ আমার যেন ব্যর্থ না হয়। তোমার বিয়ের তারিখ যেন জানতে পারি, লুকিয়ে এসে তোমার সেই রাজারাণীর বেশ দূর থেকে দেখে যেতে চাই।

তার সঙ্গে সঙ্গে নলিনী বাইরে এলো। অশ্রুতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ, তবু প্রশ্ন করলো, মোটরের মধ্যে আর কে রয়েছে?

ও আমার বন্ধু রজনীমোহন। আচ্ছা চললুম।—ব'লে বীরেশ গাড়ীতে উঠে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল। বৃষ্টির ভিতর দিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চললো।

অনেকদিনের সহপাঠী বন্ধু, আত্মীয়, অনেক দীর্ঘ দিনের অবকাশের অন্তরঙ্গ সঙ্গী! ভালোবাসার সেই অশ্রু বৃষ্টির জলের সঙ্গে ঝরঝরিয়ে নলিনীর দুই চিক্কণ গাল বেয়ে নামতে লাগলো। হাতে ছিল তার বর্ষার একখানা কাব্যগ্রন্থ, সেখানা বর্ষার জলেই ভিজতে লাগলো; গাড়ীখানা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও নলিনীর সম্বিৎ ফিরলো না।

প্রবল ঝড়বৃষ্টির ভিতর দিয়ে মোটর স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। ভাড়া চুকিয়ে তারা স্টেশনে নেমে টিকিট ঘরের দিকে গেল। দুজনেই স্বাস্থ্যবান যুবক, চেহারাও ফিট্‌ফাট। রজনী হাসিমুখে বললে, বাপের হোটেলে ছিলে এতকাল, একটি পয়সাও রোজগার করোনি। মাত্র পঁচিশ টাকা সম্বল ক'রে তোমার য়্যাড্‌ভেন্‌চার কতদূর গড়াবে?

বীরেশ হাসিমুখে বললে, অনেকদূর। বিলেত থেকে আমেরিকা।

রজনী বললে, আমার অত সখ নেই বাবা। বেকারের জীবন কাটিয়েছি, এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই খুশি। কোথাকার টিকিট কাটবো বল্‌।

পরম উপেক্ষায় বীরেশ বললে, যেখানকার খুশি/যাই, যেখানে হোক গেলেই হোলো।

তাহলে আমার পিসতুতো ভাইয়ের ওখানেই চল, সে এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার। খুব আমুদে ছেলে, বেশ কাটবে তার সঙ্গে—তুই দাঁড়া এখানে। ব'লে রজনী টিকিট কিনতে চ'লে গেল।

দুজনের সঙ্গে একটিমাত্র সুটকেস ও সামান্য একটি বিছানা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাই নিয়ে তারা গিয়ে এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠলো। বড় কোনো একটা লক্ষ্য, বড় কিছু উদ্দেশ্য বীরেশের মনে ছিল না। তাকে যেতে হবে, তার যাওয়াটাই দরকার। তার দেহের রক্তের রং নীল, সেই রক্তে যেমনই উত্তাপ তেমনই চঞ্চলতা। যে আত্মাভিমান এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে তার এই তরুণ জীবন গ'ড়ে উঠেছে, সেখানে এলো একটা বিপরীত আঘাত, এ আঘাতের সঙ্গে তার মনের কোনো আপোষ নেই। ভবিষ্যৎটা তার চোখে অস্পষ্ট, কিন্তু তার জন্যে মনে কোনো বেদনা অথবা নিরাশা নেই, বরং কোনো স্বপ্ন সার্থক ক'রে তোলার দুরাকাঙ্খাও তার নেই,—বরং পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন ক'রে একটা অনির্দ্দিষ্ট বিপ্লবময় জীবনের দিকে সে যে উল্কার মতো ছিটকে পড়লো, এই নতুন আস্বাদটা তার বেশ ভালোই লাগছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে যেন একটা অসীম শক্তি ও স্বাস্থ্য অনুভব করছে। তার ব্যায়াম করা মাংস-পেশীর ভিতরে যে সংহত বলিষ্ঠতা, প্রাণের ভিতরে দুরন্ত অধ্যবসায়ের যে উৎস-গহ্বর, সমস্তই যেন আত্ম-প্রকাশের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কখন বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছেড়েছে, কখনই বা ভরা বর্ষার প্রান্তর

আর খাল-বিল পেরিয়ে ট্রেণ ছুটে চলেছে সেদিকে বীরেশের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। গতির দোলায় গাড়ী দুলছে, যাত্রীর ছায়া দুলছে, বাইরে বর্ষণ-মুখর রাত্রিও দুলছে,—বীরেশ স্তব্ধ হয়ে বসে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলেছে। রঞ্জনী হিসাবী ছেলে, রাত্রির আহার শেষ ক'রে এসেছে, ভবিষ্যৎ জীবন-সমস্যা স্থগিত রেখে একটা সিগারেট শেষ করে সে অলক্ষ্যে কখন যেন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সমস্ত বিবাহের ব্যাপারটার সঙ্গে বীরেশের মনের যোগ ছিল না, তার নির্লিপ্ত অন্তর দূরে ব'সে সেই দৃশ্যটা আর একবার পরিষ্কার ক'রে দেখতে লাগলো। যে-বালিকা এলো তার স্ত্রীর অধিকার নিয়ে, সে যে সম্পূর্ণ অপরিচিতই রয়ে গেল এজন্য বীরেশের কোনো ক্ষোভ নেই। সামান্য তার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য জানা গেল ফুলশয্যার রাত্রে এবং অষ্টমঙ্গলার বিদায়ের দিনে। তার জীবন যদি ব্যর্থ হয় তবে সে দায়িত্ব বীরেশের নয়, সে যদি দুঃখ পায় তার প্রতিকম্পন বীরেশের গায়ে এসে লাগবে না। সত্য কথা বলতে কি, আসবার সময় অশ্রুমুখী নলিনীর চেহারাটা তার চোখের ওপর ভাসছে। আত্মীয়তা নলিনীর সঙ্গে ছিল একথা সে আগে জানতো না; কলেজে অনেকদূর এগিয়ে আলাপ হবার পর একদিন তার সঙ্গে আত্মীয়তা আবিষ্কৃত হোলো। দূরের মানুষের সঙ্গে ইশারায় আগে আলাপ হোতো, সহসা যেন দুজনেই এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে অন্তরঙ্গ হয়ে। এই আবিষ্কারের আনন্দে প্রথম দিনই তারা বেরিয়ে পড়েছিল পথে পথে, সারাদিন সে কি অজস্র ভ্রমণ। সাহিত্য নিয়ে দুজনের কী আলোচনা, শেলী নিয়ে কী তর্ক, একালের এলিয়টকে নিয়ে তাদের কী ঘোরতর বিবাদ। বীরেশের ছিল দর্শনশাস্ত্র, নলিনীর ছিল ইংরেজী সাহিত্য। তুমুল তর্ক দুজনে। পূর্ববর্তী জীবনের মন্দ অভ্যাস ন্যায় প্রবৃত্তি পরবর্তী জীবনে এসেও মানুষকে মুক্তি দেয় না,—অবচেতন

মনের তলায় থেকে সংগোপনে মানুষের সকল কাজ ও কথাকে তারা পরিচালিত করে—এই ছিল একদিনের বিতণ্ডা। বর্তমান জগতে রাষ্ট্র-আদর্শ দ্বিধা-বিভক্ত। একদিকে একনায়কত্ব, অন্যদিকে গণতন্ত্র—এই দুইভাগে পৃথিবীকে অদূর ভবিষ্যতে ভাগ ক'রে নেওয়া হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আর একটিও থাকবে না, দুই-চারিটি বৃহৎ শক্তির দ্বারা তারা সবাই কবলিত হবে—এই আলোচনা ছিল একদিন। বালীগঞ্জের এক নিরিবিলি চায়ের দোকানে, লেকের কোনো গাছের তলায়, গঙ্গার কোনো নির্জন ঘাটে অথবা ডায়মণ্ড-হারবার আনাগোনার পথে ট্রেনের কামরায় তারা কেবল কথার পরে কথার মালা গেঁথে কাটিয়েছে। তাদের তরুণ বয়সের অগ্নিস্রাবী প্রাণময়তা আকাশে ফুলঝুরির মতো ফুটিয়েছে তারা, শরতের জ্যোৎস্নায় ঢেলে দিয়েছে মদিরা, বর্ষায়-বসন্তে নিবিড় মধুর স্বপ্ন ছড়িয়েছে দিকে দিকে। এরপরে তাদের একদিন শোচনীয় বিচ্ছেদ ঘটবে একথা কল্পনার অগোচর ছিল। অনেক কথাই তারা আলোচনা করেছে কিন্তু যে কথাগুলো বললে দুজনেরই ভালো লাগতো তা আর কোনদিন বলা হয়নি। নরনারীর ভালোবাসা অথবা প্রণয় নিয়ে কত বিদ্রূপ আর পরিহাসই তারা করেছে, থিয়েটারী প্রণয়কাণ্ডের কাহিনি অভিনয় ক'রে কত সন্ধ্যা তারা আমোদ করেছে, সুতরাং বিদায় নেবার সময় পাছে গদগদ ভাবালুতা প্রকাশ পায় একজন্য দুজনেই ছিল সতর্ক। তাদের পরিহাসের বস্তু তাদেরই জীবনে দেখা দেবে, ভাগ্যের এই বিদ্রূপ তারা সইতে পারবে না।

লোকলজ্জা না হলেও কানাকানি ছিল নলিনীকে নিয়ে। কলেজ-ক্লাসের ব্ল্যাক-বোর্ডে একদিন একটি ছবি আবিষ্কৃত হোলো—পদ্মবনে মত্ত হস্তী। সে যে নলিনীকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে এ কথাও একদা প্রকাশ পেলো ওই ব্ল্যাক-বোর্ডে,—"ওগো নলিনী, খোলো গো আঁখি, ঘুম এখনো ভাঙিল নাকি?"—কলেজের ছাত্রমহলে কী হাসাহাসি প'ড়ে গেল।

বীরেশের নামে বেনামী চিঠি, নলিনীর বসবার জায়গায় ছুরি দিয়ে কাঠের ওপর খোদাই করা সতর্কবাণী ! ওখানেই শেষ নয়, যৌন-নিগ্রহের দেশে মানুষ—বাঙালী বালকরা লালসায় ফেনা মুখ দিয়ে বার করতে লাগলো গল্‌গল্‌ ক'রে—নানা উপায় উদ্ভাবন ক'রে তারা জব্দ করতে লাগলো দুজনকে। যে দিন নলিনীর সীট-এ একটি সিঁথিমৌর এবং বীরেশের সীট-এ একটি টোপর পাওয়া গেল সেদিন কলেজে কী ভীষণ গণ্ডগোল ! এমনি লাঞ্ছনার ভিতর দিয়েই তাদের কলেজের জীবন শেষ হয়।

বীরেশের চোখে তন্দ্রা নামলো।

ভোরের দিকে রঞ্জনীর ডাকাডাকিতে তার ঘুম ভাঙলো। গাড়ী এসে কোন্‌ একটা মফঃস্বলের স্টেশনে থেমেছে। বাইরের আকাশ মেঘমলিন, গত রাত্রির পুঞ্জীভূত অভিমান তার কপাল থেকে এখনো মোছেনি, এখনো হাসি ফোটে নি। এইভাবে ট্রেনে চড়ার অভ্যাস তার নেই। সে বরাবরই সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী, সঙ্গে চাকর থাকে—আরামের উপকরণ ভিন্ন সে কোনোদিন ভ্রমণই করেনি। ঘুমচোখে অসীম বিরক্তি মুখে মেখে সে রঞ্জনীর পিছনে পিছনে স্টেশনে নেমে পড়লো।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রে আমাদের ?

রঞ্জনী হাসিমুখে বললে, নরকে।

সে কি, এক নরক থেকে বেরিয়ে অন্য নরকে ? এমন কিছু পাপ করিনি। একটু চা দাও, নইলে এক পা-ও নড়বো না।

চা ? পঁচিশ টাকা যার ইহকাল পরকালের সম্বল, সে যাকে খরচ করবে কোন লজ্জায় ?

তা বটে। অতঃপর তাকে কিছু আত্মসংযম করতে হবে বৈ কি !

নিরুৎসাহ হয়ে বীরেশ বললে, চিরকালের অভ্যেস কিনা, না পেলে একটু কষ্ট হয়।

রজনী বললে, জমিদারী অভ্যেস যত শীঘ্র ছাড়তে পারো ততই মঙ্গল।

আচ্ছা, এক পেয়ালা দে, আর কোনদিন চাইবো না।

চা খাবার পর বীরেশ বললে, নে এবার চল্, তোর পিসতুতো ভাই-টাই কোথায় আছে খুঁজে বার কর, কিধেয় পেট জলে গেল।

কিধে? রজনী আবার তাকে ধমক দিল। বললে, কথায় কথায় কিধে? অ্যাড্ভেন্চার করতে বেরিয়েছ, পথের ধারে কোন্ উর্বশী তোমার জন্যে ষোড়শ উপচার সাজিয়ে রেখেছে শুনি?

তা বটে। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা তার মনে থাকলে এখন থেকে আর চলবে না। পৃথিবী তার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দিয়েছে, জীবনের বাস্তবতা ভয়ঙ্কর কটাক্ষে তাকে আতঙ্কিত করতে চাইছে, তার সুখ-লালিত জীবন অতঃপর শেষ হয়ে গেল। এখন ক্ষুধায় অন্ন পথ থেকে খুঁটে খুঁটে তাকে খেতে হবে, নিজেরই অশ্রুর অঞ্জলি তাকে পান করে তৃষ্ণা মেটাতে হবে। পৃথিবী সুন্দর হ'তে পারে কিন্তু স্নেহহীন। মানুষ বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হ'তে পারে, কিন্তু মানুষ বড় নিষ্ঠুর। বীরেশ রজনীর পিছনে পিছনে চলতে লাগলো।

রজনী স্টেশন মাস্টারকে খুঁজে বা'র ক'রে প্রশ্ন করলো, নীরেনবাবু কোন্ বাসায় থাকেন, দয়া করে বলবেন আমাদের?

মাস্টারবাবু বললেন, নীরেন? আমাদের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-মাস্টার?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সে ত' দুমাস হলো এখান থেকে বদ্‌লি হয়ে গেছে। সে এখন আছে খুলনায়। আপনি কে?

আমি তার মামাতো ভাই। আগে জানতে পারিনি যে, সে এখানে নেই। আচ্ছা, নমস্কার।

দুজনেই ভারি দ'মে গেল। কিন্তু এতদূরে এসে আর কোনো উপায় নেই। একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। রজনী বিরক্ত হয়ে বললে, তুই বড় লোকের ছেলে হলে হবে কি, ভারি অপয়া।

বীরেশ হেসে উঠলো। বললে, এবার যুদ্ধটা জমবে ভালো। তোদের খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে 'সঙ্কটজনক পরিস্থিতি'—তাই হয়েছে। বেশ লাগছে এবার। চল্ একদিকে হাঁটা দিই।

ভগ্ন মনোরথ হয়ে রজনী বললে, এমনটা হবে কে জানতো। বেস্পতিবারের বারবেলা বেরিয়ে—

তোর মাথা। কুসংস্কারের দড়িবাঁধা কোমরে, পথে বেরিয়েছিস ভাগ্য ফেরাতে। বুকের ছাতি অত ছোট কেন? আয় আমার সঙ্গে।—ব'লে বীরেশ তাকে টানতে টানতে স্টেশনের বাইরে নিয়ে চললো।

বাইরে এসে দেখা গেল অপরিচিত নতুন দেশ। তারা শহরে মানুষ, গ্রামের সঙ্গে তাদের পরিচয় রেলগাড়ীর জানালা দিয়ে। উপন্যাসে পড়েছে গ্রামের কথা, কাব্যে গ্রামের সৌন্দর্য বর্ণনা দেখেছে। সেই উপন্যাস অথবা কাব্য তাদের প্রতারণা করেনি; সৌন্দর্য অবশ্যই আছে। কিন্তু একি! কারো গায়ে জামা নেই, কারো পায়ে জুতো নেই! সামনে নোংরা মিঠাইয়ের দোকানে বড় বড় মাছি ভন্‌ভন্ করছে। নারকেল দড়ির রাশ পরানো ছুটো রুগ্ন ঘোড়ার ঘাড়ে একখানা জীর্ণ ঝড়ঝড়ে ছ্যাকড়া গাড়ী। গত তিনদিনের বৃষ্টিতে মেটে পথ হাঁটু-প্রমাণ কাদায় পরিপূর্ণ, তার পাশে ঘন কচুরিপানায় একটা ডোবা। সেই কাদার উপর দিয়ে একখানা কাঁঠাল বোঝাই গোরুর গাড়ী গর্দানে কাঁধা মেখে পথ পার হয়ে যাবার চেষ্টা করছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, দু-একটি করোগেটের ঘর ছাড়া আর সবই

পাতার কুটীর। এই পথের কাদা ভেঙে তারা কোথায় ও কোন্‌দিকে যাবে, গিয়ে কি করবে, কোথায়ই বা আস্তানা মিলবে এই সব কথা তোলাপাড়া করতে করতে অসীম নিরুৎসাহে তারা একবার থমকে দাঁড়ালো।

বীরেশ বললে, এখানে হোটেল-টোটেল নেই যে?

হোটেল! তুই কি বিলাতের মিডল্যাণ্ডে এসেছিস যে দু'পা এগোতেই ইন্ পাবি? এর নাম বাংলার পল্লী, আদি ও অকৃত্রিম।

খাবো কি, থাকবো কোথায়?

রজনী বললে, সোনার বাংলার ধান সেদ্ধ খাও, নদী খুঁড়ে জল গেলো, আর থাকো পাতার ঘরে। চেয়ে দেখ চারিদিকে, শস্যলক্ষ্মী হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

বীরেশ বললে, আমি যাবো না কোথাও, স্টেশনের ধারে প'ড়ে থাকবো।

বটে? দেশে পুলিশ নেই, গোয়েন্দা নেই? তারা চাকরি বজায় রাখার জন্যে বিপ্লবী বলে যদি ধরিয়ে দেয়?

প্রমাণ করবে কি ক'রে?

প্রমাণ! প্রমাণ বুকের ছাতি, হাতের মাস্‌ল্‌,—পরাধীন দেশে প্রমাণের অভাব?—নে চল্‌, এগো।

ছ্যাক্‌ড়া গাড়ীর গাড়োয়ান এসে ধরলো, বাবু যাবেন নাকি?

বীরেশ বললে, ওহে কর্ত্তা, এদিকে থাকা-টাকার জায়গা কোন্‌দিকে বলতে পারো?

পারি বৈ কি, জমিদার বাবু আপনারা,—মামলা করতে এসেছেন কি? চলুন বাবু আমি নে যাবো।

মামলা করতে আমরা আসিনি ভাই, তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি।

গাড়োয়ান তার দাড়ি বার করা দাঁত খুলে হাসতে লাগল। পরে বললে, কাছারির দিকে যাবেন ত?

কাছারি? হ্যাঁ, হ্যাঁ,—কাছারির দিকেই যাবো বটে। নিয়ে যাবে তুমি? পথ কতটা?

দেড় কোশ বাবু। দেখবেন বাবু পক্ষীরাজ ঘোড়া, কেমন উড়তি-পড়তি যায়।

কত নেবে?

মালিক আপনারা, খেতে দেবেন যা হয়। তিন গণ্ডা পয়সা দেবেন বাবু?

তিন আনা? বলো কি? আনা দুই দিতে পারি।

প্রাণে মারবেন না, বাবু।—আচ্ছা যা হয় দেবেন আর এট্টা পয়সা। আসেন। ছ্‌ ছ্‌, হুব্‌ রু রে।

গাড়ী চ'ড়ে কাদা ভেঙে খানা খোন্দলে চাকা সুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে দুর্গা নাম জপ করতে করতে তারা চললো। পক্ষীরাজ ঘোড়া 'উড়তি-পড়তি' গেল না, ঘুমোতে ঘুমোতে ল্যাজ দিয়ে মশা-মাছি তাড়িয়ে দিব্যি হেঁটেই চলতে লাগলো। যাবার তাড়া নেই, বেলা এখনো বাড়েনি, মেঘমলিন আকাশ, নিরিবিলি গ্রামের পথ,—দুই বন্ধু পরম পুলকে প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে চললো।

নীরেন এক সময় রজনীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললে, প্রথম দিনেই লাভের চেহারা দেখা যাচ্ছে, কি বল্‌?

রজনী বললে, কেন?

দেড় ক্রোশ রাস্তা ন' পয়সা ভাড়া। ড্যাম চীপ্‌! খুব ঠকানো গেছে ব্যাটাকে, কি বলিস?

রজনী উৎসাহ প্রকাশ না ক'রেই বললে, আনা দুই হোলেই ভালো হোতো।

কেন ?

পরম বিজ্ঞের মতো রজনী বললে, বলির দেশ ! গাড়োয়ান ভাবছে ওরই বেশি লাভ। তোরা শহরে লোক, গ্রামের কি বুঝবি ? আমার দিদিমার ছোট দেওরের এক দৌহিত্তরের মামাশ্বশুর তাঁর শালীর বিয়ে দিয়েছিলেন গ্রামে। গ্রামের আমি অনেক জানি।

বীরেশ মুখ টিপে হেসে বললে, তুই কি এখন থেকে এইভাবেই আমাকে জ্ঞান দান করবি ?

তা কি করব ? 'কাঁচা মাল' এনেছি সঙ্গে, তাকে ভদ্রসমাজের যোগ্য করে তুলতে হবে ত ! পঁচিশ টাকার ধনী এসেছেন গ্রামে, চারিদিকে সাড়া প'ড়ে গেছে, তা জানিস ?

আমি না হয় পঁচিশ টাকার ধনী, তুই যে গাধাও নয়, ঘোড়াও নয়।

থাম্। জানিস আমার পিসতুতো ভাই এখানে চাকরি করতো, আমি তোর কি না করতে পারি ?

উচ্চরোলে দুই বন্ধু পল্লীপথ সরগরম করে হেসে উঠলো।

দেড় ক্রোশ পথ পেরিয়ে কাছারির কাছাকাছি এসে পৌছতে ঘণ্টা দুই লাগলো। কিন্তু কাছারির দৃশ্য বড়ই করুণ। বড়ে চাল নেই, খোড়ো ঘর, পাকা একটি সু-প্রাচীন জবথবু দালান, গাছতলায় দু-একখানা চৌকি, একটি বিড়ির দোকান, দুখানা করোগেটের চালা। কাছারির কাছে এসে কাছারি খুঁজে বার করতে তাদের অনেক, পরিশ্রম করতে হোলো ! এ অঞ্চলটি অনেকটা ফাঁকা, স্থানীয় দু'চারজন লোকজনও দেখা গেল। গাড়ী থেকে নেমে তারা ভাড়া চুকিয়ে দিল।

সোঁটা ছুটির বার নয়। কাছারির আশে পাশে বাবলা ঝোপঝাড়

স্পন্দন চলেছে। কিন্তু এতই ক্ষীণ এতই নিশব্দ মন্থর গতিতে, যে কাছাধির অস্তিত্বটাই হাস্যকর। গাড়ীখানা পেরিয়ে যাবার পর জনহীন পল্লীপ্রান্তর এতই নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল হয়ে দেখা দিল যে, এদিকে মেশিক্ষণ টিকে থাকাই শাস্তিস্বরূপ মনে হ'তে লাগলো। কেন এই স্বেচ্ছানির্বাসন? কেন বা এই আত্মদ্রোহিতা? রজনীর কৈফিয়ৎ আছে। সে গরীবের ছেলে, সে পথে বেরিয়েছে ভাগ্য ফেরাতে। সম্পদ ও সৌভাগ্যের সঙ্কেত যেদিক থেকে আসবে, সে পালাবে। তাকে বেঁধে রাখার কারণ নেই, প্রয়োজনও নেই, আয়োজনও নেই। কিন্তু সে নিজে? তার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। আপাত বিচার যদি কেউ করে তবে তার গৃহত্যাগ হবে পরিহাসের বিষয়। বউ পছন্দ হয়নি—মনের দুঃখে তাই সে বিবাগী। কেন হয়নি?—স্ত্রীর বয়স অল্প, অল্প লেখাপড়া জানে, হাল ফ্যাশনের তরুণীপণা তার নেই, সে গ্রামের একটি সরলা বালিকা। এই, এ ছাড়া তার আর কিছু বলবার নেই। তার আদর্শ, তার রুচি, তার জটিল শিক্ষা আর জটিলতর চালচলন, জীবন সম্বন্ধে তার তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিভঙ্গী,—এসব পৃথিবীর লোকের কাছে হাসির বস্তু। কেউ শুনলে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বিদ্রূপ করে বলবে, যাও, ঘরে ফিরে যাও, বাছা। বাতাসের সঙ্গে বিবাদ ক'রে ছেলেমানুষী ক'রো না। তার ভাগ্য ফেরাবার দরকার নেই, ইংরেজী ভাষা ও আইনের ছাত্র হিসাবে তার অসামান্য খ্যাতি। আজও সে প্র্যাক্টিসে নেমে অতি সহজে অনেক বেশি পসার জমাতে পারে। পিতার একমাত্র পুত্র সে, সম্পত্তি তার কম নয়। তার মাসিক হাত খরচের যা পরিমাণ সে একটা বৃহৎ পরিবারের ভাতা। আগামী অক্টোবরে তার বিলেত যাবার কথা, শীঘ্রই জাহাজের সীট রিজার্ভ করতে পারতো। কিন্তু কোথা থেকে কী হয়ে গেল। এযাত্ত একটা ভূমিকম্প। উৎকেন্দ্রিক হয়ে ছিট্‌কে এসে

পড়লো একটা অদ্ভুত অপরিচিত জীবনযাত্রার। এখানে তাদের প্রকাণ্ড প্রাসাদের বিলাস উপকরণ নেই, বাজাদিদির দিনরাত্রির সস্নেহ প্রশ্রয় নেই, অবকাশের নিরিবিলি মুহূর্তগুলিতে নলিনীর মধুর সাহচর্য নেই—অনাহুত আহারের আয়োজন, অপ্রার্থিত সেবা, কোথাও কিছু নেই। সমস্ত পল্লীর সৌন্দর্য, নির্জন প্রান্তর, নিঃসঙ্গ সকালের চেহারা—সমস্তটা মিলিয়ে বীরেশের চোখে কালো ছায়া নেমে এলো।

অদূরে একখানা পরিত্যক্ত চালাঘর বোধকরি এই বর্ষাতেই কাৎ হ'য়ে পড়েছিল—রজনী কর্ম্মিৎকর্মা লোক, দুর্ভাবনায় সময় অপব্যয় না করে সে ব্যাগ-বিছানা দুই হাতে নিয়ে সেই চালাঘরের দাওয়ায় এসে উঠলো। কার ঘর, কে মালিক জানবার এখন দরকার নেই। জিনিসপত্র রেখে জামা জুতো খুলে কোমর বেঁধে রজনী মজুরের কাজে লেগে গেল। আধ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর আর কিছু না হোক, মাথা গুঁজে দাঁড়াবার মতো জায়গা সে বানিয়ে তুললো।

দুজন লোক এসে দাঁড়ালো। প্রশ্ন করলো, কে বাবু আপনারা?

তোমরা কে?

আমি গাঁয়ের চৌকিদার, থানার লোক। আর—এ হোলো এই ঘরের মালিক।

বীরেশ বললে, খুশি হলাম। আর কোনো অসুবিধে হবে না। এখানে ঘরামি কোথায় থাকে বলতে পারো? চালাটা তৈরি ক'রে দেবে।

আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে। থাকবো এখানে কয়েকদিন।

কিন্তু কলিকাতার নাম শুনেই আভূমিপ্রণত হয়ে তারা দুই বন্ধুকে প্রণাম জানালো। বললে, জল হাওয়া এখানে ভালো বাবু, থাকতে পারলে শরীরে শক্তি লাগবে। কিন্তু থাকবেন কেন, বাবু?

তোমাদের দেশে কি আসতে নেই ?

আচ্ছা, আচ্ছা—থাকেন বাবু, বেশ ত !

যে-ব্যক্তিটি চালাঘরের মালিক, সে বললে, ঘরটা তৈরি ক'রে নিতে হবে। ঘরামি চাইছেন, রুক্ত দেবেন বাবু ? এত বড় একটা ঘরের কাজ, খাটুনি আছে।

কত দিতে হবে ?

তা বাবু, আজকালকার দিন, সব ঘরটা করতে অন্ততঃ দুটো টাকা লাগবে বৈ কি।

রজনী এগিয়ে এসে বললে, চাটাই চৌকি যদি সব দিতে পারো তাহ'লে না হয় তাই দেবো।

তা পারবো বাবু, যদি বলেন আমরাই কাজে লাগি।

বেশ ত।

রুধিরের গন্ধে যেমন বাঘের আমদানি হয় তেমনি ভাবে দড়ি, বাখারি, খড়, চাটাই, হোগ্‌লা ইত্যাদি এনে সেই এলাকার মধ্যে তিন চারজন লোক মিলে ঘর, দাওয়া, দরজা, জানালা সমস্ত নতুন ক'রে তৈরি ক'রে ফেললো। তাদেরই উৎসাহে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ে উভয়ের ভোজনও সমাপ্ত হোলো। কিছু দূরে জলাশয় রয়েছে। দু একটা কলাইয়ের থালা গেলাসও এসে জুটলো। জানা গেল নিকটেই বড় গ্রাম, সেখানে অনেক ভদ্র গৃহস্থের বাস। এই গ্রাম তামার বাসন আর বেতের জিনিসপত্রের জন্ত এই জেলায় বিখ্যাত। স্থানীয় কামারপাড়ার প্রসিদ্ধি কম নয়। সংবাদগুলি শুনে বীরেশ কিছু উৎসাহিত হোলো।

ক্রমে ক্রমে কাছারির দুচারজন পাইক পেয়াদা, থানার দারোগা, দাতব্য ডাক্তারখানার লোক, সবরেজিস্ট্রারবাবু, একে একে অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হ'তে লাগলো। এবং আশ্চর্য, দেখতে দেখতে এই

গ্রামের নিরালা একান্তে নানা জল্পনা কল্পনায় দীর্ঘ আটটা দিন বেশ স্বচ্ছন্দেই কেটে গেল।

শ্রাবণের প্রথমদিকে বর্ষাটা বেশ ঘন হয়ে নামলো। কিন্তু ওদের জীবন-যাত্রাটা এরই মধ্যে অনেকটা খাতে বসেছে। চালার মালিকটি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়েছে। তাদের বড়লোক মনে ক'রে স্বেচ্ছায় তাঁবেদারি করে, এটা ওটা এনে দেয়, সুখ দুঃখের কথা কয়। রজনী রাঁধে, বীরেশ জল আনে, ঘর ঝাড়ে, মোছে। জুতো জামা ওরা তুলে রেখেছে, গ্রামের পটভূমিতে সেগুলো একটু বেমানান, খালি পায়ে গেঞ্জি গায়ে ওরা আনা গোনা করে, এখানে ওখানে টহল দিয়ে আসে। বিশ্রামের ফাঁকে রজনী কোনো গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে এক এক সময় বেরিয়ে পড়ে। বীরেশ চৌকির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে বাইরের বাদলের ঝিম্‌ঝিম্ শব্দ শোনে, জানালার বাইরে চেয়ে মেঘের স্বপন বোনে, আর ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।

সেদিনটা গ্রামের হাটের বার। হাটকে কেন্দ্র করেই গ্রামে যত বেচা কেনা। স্থানীয় বোর্ড থেকে কয়েকটা খোড়ো চালা তৈরি আছে, তার নিচে আশপাশের দুচার খানা গ্রাম থেকে ফড়েরা মালপত্র এনে বসে। হাটের বারেই গ্রামের গৃহস্থদের দেখা যায়।

দুচারজন ভক্ত ইতিমধ্যেই জুটে গিয়েছিল। চৌকিদার, ডাকপিওন, মালিক, সেই ছ্যাকড়া গাড়ীর গাড়োয়ান, বোর্ডের এক কেরানি, দুজন ফড়ে—এরা সবাই খাতির ক'রে বীরেশ আর রজনীকে এই গ্রামের ঐশ্বর্যের সংবাদ জানাচ্ছিল, এবং এই দলটিকে কেন্দ্র ক'রে সেদিন হাটতলায় জনতাও কম হয়নি।

এমন সময় ওধারে চালায় তলায় এক গণ্ডগোল দেখা গেল। জন দুই লাঠিধারী পাইক একজন ফড়ের ঘিয়ের টিন কাৎ ক'রে ফেলে

তার উপর যাত্রমুখী হয়ে উঠেছে। ঘি ওয়ালা গরীব লোক, প্রায় তিন ক্রোশ দূর থেকে তার মাল ব'য়ে এনেছে। ঘিয়ের টিন ওল্‌টানো দেখে সে বাজারের মাঝখানে কেঁদেই আকুল।

বীরেশ গিয়ে দাঁড়ালো তাদের মাঝখানে। উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃতের গন্ধে চতুর্দিক ভর্‌ভর্‌ করছে। ফড়ের দলের মধ্যে ঠেলাঠেলিতে পাইক দুজন চোখ রাঙিয়ে নিতাস্তই যখন লাঠি তুললো বীরেশ একজনের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিল। রঞ্জনী বললে, তোর এত মাথা ব্যথা কেন, তুই চলে আয়।

থাম্‌ রঞ্জনী।

কিন্তু বীরেশের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেবার জন্যে দুজন পাইক-ই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুতরাং রঞ্জনী আর নিরপেক্ষতা রাখতে পারলো না, সেও যুদ্ধ ঘোষণা করলো। লাঠিধারী দ্বিতীয় পাইককে সে যখন বাধা দিল, তখন তাদের বন্ধুর দল...সেই চৌকিদার, মালিক, কেরানি, গাড়োয়ান—সকলেই উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলো, বাবুমশাইরা, পাইকদের সঙ্গে যদি আপনারা বিবাদ করেন ত' আমরা আর আপনাদের সঙ্গে ভাব রাখতে পারবো না। ফড়ে বেটাদেরই দোষ, ওরা কেন খারাপ মাল আনে? দুচার ঘা মার খেলে ছোটলোক কি আর মরে, বাবু? যান,আপনারা চলে যান, লাঠি ফিরিয়ে দিন।

বীরেশ ডান হাতে লাঠি কেড়ে নিয়েছে, বাঁ হাতে ধরেছে পাইকের গলার কামিজের মুটি। বললে, মারবো না তোমাদের, কিন্তু লাঠিও দেবো না। ওদের ক্ষতিপূরণ দেবে কে? বজ্জাত, পাজি,—মাটিতে নাক খৎ দাও।

পিছন থেকে আর সবাই বীরেশকে টানাটানি করতে লাগলো,— ছেড়ে দিন বাবু, নিজেদের সর্বনাশ করবেন না, ওরা হাকিমের লোক। এখুনি আপনাদের হাতকড়া দেবে। ওদের সঙ্গেই আছে।

বটে ? লাঠিখানা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে চেপে দুই হাতে পাইকদের ঘাড় ধ'রে বীরেশ বললে, হাতকড়া পরের কথা, ওই ফড়ের পায়ের তলায় একবার নাকখৎ দাও আগে। দাও শীঘ্র, নৈলে কীচক বধ করবো।

পাইকের মাথাটা ধ'রে টিন ওলটানো ঘিয়ের ওপর তার মুখখানা বীরেশ জোর ক'রে রগ্‌ড়ে দিল। ঘিয়ে আর কাদায় তার মুখখানা হোলো কিম্ভূতকিমাকার। বললে, লাঠি দেবো না, এবার যাও।

হাকিম আসছেন।—কে একজন ব'লে উঠলো।

বীরেশ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। দ্বিতীয় পাইকের হাতখানা ধ'রে বললে, তুমি ঘিয়ের টিনে হাত দিয়েছিলে ?

সে বললে, না।

ফড়ের মাথার ওপর লাঠি তুলেছিলে ?

না।

গরীবের ওপর এই জবরদস্তি করো কেন তোমরা ?

পাইক বললে, যারা মালে ভেজাল মেশায় তাদের ওপর আমরা কড়াকড়ি করি।

ভেজাল তোমরা চেনো ?

ও-লোকটা ভেজাল ছাড়া ব্যাচে না।

বেশ, তবে ঘুষ চাইছিলে কেন ? ঘুষ না পেলেই বুঝি ঘিয়ে ভেজাল মিশে যায় ?

কিন্তু দূরে হাকিমকে দেখে পাইকরা আবার ফুঁসিয়ে উঠলো। বললে, গ্রামে গুণ্ডামি করতে এসেছ বিদেশ থেকে ? বেশ করবো আমরা। দেখে নেবো তোমাদের। চেনো না হাকিমকে ? আমরা হুজুরের চাকর।

হাকিম আসার সংবাদে জনতা স'রে পড়েছিল। রজনীর মুখ

লুকিয়ে গেল। দূর থেকে দেখা গেল, তাদের অসময়ের বন্ধু সেই চৌকিদারই হাকিমকে পথ দেখিয়ে বীরদর্পে এইদিকে আসছে। সঙ্গে কয়েকজন লোক।……গ্রামে ডাকাত পড়েছে।

কাদামাখা পাইক ছুটে গিয়ে বললে, হুজুর, গুণ্ডার দল মেরেছে আমাদের! বলুন, ওদের গ্রেপ্তার করি।

হাকিম এসে দাঁড়ালেন। বললেন, কে তো……আপনারা?

বীরেশ বললে, আমরা এই গ্রামে বাস করতে এসেছি।

কোনো কাজে?

না, এমনি।

গুণ্ডামি কি আপনাদের পেশা? আমার লোকদের মেরেছেন কেন?

বীরেশ সোজা দৃষ্টিতে হাকিমের দিকে তাকালো। ছাঁটা ছোট ছোট চুল মাথায়, ছাঁটা গোঁফ, মুখে কেমন যেন নিষ্ঠুরতা, চোখ দুটো আত্মাভিমানে রাঙা। বয়স ত্রিশের কিছু বেশি। হাতে তামাকের পাইপ ও ছড়ি।

বীরেশ একটু হাসলো। হেসে বললে. গুণ্ডামি যদি কেউ করে, আমাদের বাধা দেবার অধিকার আছে।

সে বিচার আমি করবো, আপনারা নয়। আপনাদের গ্রেপ্তার করা হবে না কেন সেই কথা বলুন।

এরপর সহসা ইংরাজীতে বচসা চললো। ফৌজদারী আইনের ভালো ছাত্র বীরেশ, তার অনর্গল ইংরেজি ব্যাখ্যায় হাকিম কিছু বিপন্ন বোধ করলেন। অতঃপর বীরেশ বললে, গ্রেপ্তার করলে দুঃখিত হবো না,—মামলাই চলবে। আপনাকে একথা জানিয়ে রাখি এ মামলা এখানেই শেষ হবে না। এখান থেকে জেলায়, জেলা থেকে সেসনে, সেখান থেকে হাইকোর্ট, দরকার হ'লে প্রিভি কাউন্সিল,—এবং প্রমাণ করবো

এখানকার হাকিমের সঙ্গেতে পাইকরা কয়েদের কাছে ঘুষ নেয়, এবং ঘুষ না পেলে তারা বাজারে গিয়ে গুণ্ডামি করে।···বীরেশ উত্তেজনায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো।

হাকিম আদেশ দিলেন, এদের গ্রেপ্তার করো।

কালামাথা পাইক জিজ্ঞেস করলো, হাতকড়া লাগাবো কি হুজুর ?

হাকিম আসামীদের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, না, এমনি নিয়ে চল্। আপনারা কি জামিনের বন্দোবস্ত করবেন ?

কঠিন রুক্ষকণ্ঠে বীরেশ বললে, আজ্ঞে না, আপনার আচরণের সীমানা অবধি দেখতে চাই। আপনার হাজতের চেহারাটাও একবার দেখি, কাজে লাগবে।

নাম কি আপনাদের ? নাম ধাম পরিচয় বলুন,—ওহে অবনী, সব লিখে নাও ত ? ওয়ারেণ্ট পরে সই করিয়ে নিয়ো।

নাম ধাম পরিচয়,—কিছুই বলব না। এই চুপ কর্। ব'লে বীরেশ রজনীকে একটা ধমক্ দিল।

হাকিম দু'পা এগিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে মারলেন সেই ঘি-ওয়ালা কয়েদের পিঠে। মার খেয়ে কয়েদটা উঠে হাকিমের পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিয়ে বললে, হুজুর, রক্ষে করুন। আমাদের কারো দোষ নেই; পাইকরাও খুব ভালো লোক, ওই দুজন কল্‌কাতার গুণ্ডাই যত নষ্টের গোড়া। হুজুর আমাদের বাঁচান্।

তীব্র বিদ্রূপের হাসি হেসে হাকিম আসামী দুজনের দিকে তাকালেন। বীরেশ বললে, চমৎকার।

হাকিমের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

তাদের হাজত বাস হোলো, এবং থানা থেকে তাদের সম্বন্ধে তদন্ত চলতে লাগলো। বিনাশর্তে ক্ষমা প্রার্থনা করলেই তাদের মুক্তি দেওয়া

হবে, হাকিমের মনে এই বাসনা ছিল, দারোগা সাহেব গিয়ে আসামীদের এই কথা জানালো। আসামীরা তাকে বিদায় দিয়ে বললে, আমরা বেশ আছি, হাকিমকে বোলো।

ইতিমধ্যে জেলা কংগ্রেস কমিটির কানে খবরটা পৌঁছে ছিল, তারা গ্রামে এসে নিভুল ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে গেল। তারপর দিন-দুয়েকের মধ্যে কলিকাতার ইংরেজি বাংলা সংবাদপত্রে খবরটি সাড়ম্বরে প্রকাশিত হোলো। সম্পাদকীয় লেখা হোলো না বটে কারণ মামলা বিচারাধীন,—কিন্তু সংবাদ সাজানোর মধ্যেই হাকিমের অন্যায় ও অসঙ্গত আচরণ রঙীন ভাষায় বেরিয়ে গেল।

বাংলার গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে সমগ্রভাবে তদন্ত করার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হুকুম পাঠালেন। কংগ্রেস কমিটির লোক, সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি, পুলিশের বড়কর্তা, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট—লোক-লস্কর হাতী-হাওদা, গাড়ী-ঘোড়া, তাঁবু-আরদালী, কামান-বন্দুক, সৈন্য-সামন্ত সহকারে প্রকাণ্ড একখানা জাহাজ রিজার্ভ করে বাংলার একটি পণ্ডগ্রামে বিবের টিন ওল্টানোর তদন্তে যাত্রা করলো। গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বাংলার আইন পরিষদে একজন কংগ্রেসী সভ্য একটি মুলতুবী প্রস্তাব আনলেন, মুসলমান সদস্যদের সঙ্গে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উঠলো, কারণ সেই বি-ওয়ালা ছিল মুসলমান,—কোয়ালীশন দলের অনেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কা করলেন; জনৈক সভ্য অশ্লীল উক্তি করবার জন্য পরিষদে তুমুল বিতণ্ডা চললো, অবশেষে ক্ষমা প্রার্থনা। . স্পীকার রুল জারি করলেন। মুলতুবী প্রস্তাব দুই ভোটে পরাজিত হোলো। অতঃপর সভ্যের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মাননীয় সভ্যের প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি,

জেলা কর্তৃপক্ষকে তদন্ত করিবার জন্ত বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন।

কংগ্রেসী সভ্য: মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব পরিষদকে কি এই আশ্বাস দিতে পারেন যে, সরকারী তদন্ত নিরপেক্ষ হইবে?

স্বরাষ্ট্র সচিব: এই প্রশ্ন উঠে না।

কংগ্রেসী সভ্য: মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব কি বলিতে পারেন, তদন্তের সুবিধার জন্ত আসামীগণকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়া হইবে?

স্বরাষ্ট্র সচিব: উত্তর পাইতে হইলে পূর্বাহ্নে নোটিশ চাই।

পরিষদে তুমুল গণ্ডগোল উঠলো। কংগ্রেস ও জাতীয় দল প্রতিবাদ জানিয়ে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ ক'রে গেলেন।

সংবাদটি বিলাতে গিয়ে পৌঁছলো। কমন্স সভায় একজন শ্রমিক-সভ্যের উত্তরে ভারত সচিব উত্তর দিলেন, 'ভারত সরকারের নিকট হইতে এখনও সম্পূর্ণ সংবাদ আসে নাই।

অতঃপর তদন্ত-কাণ্ডের কি ফলাফল হোলো সুস্পষ্ট জানা গেল না কিন্তু দেবীপুরের তদন্তের পর সপারিষদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের বড়কর্তা আশপাশের জঙ্গলে কয়েকটা বন্যশূকর শিকার ক'রে বিদায় নিলেন এবং একদা মহকুমা হাকিমের হাতে হাত মিলিয়ে বীরেশ ও রজনী হাসিমুখে হাজত থেকে বেরিয়ে এলো। সকলেই ইংরেজ বাহাদুরের জয় ঘোষণা করলো। পাইকের বেতন থেকে বি-ওয়ালারা ক্ষতিপূরণ পেলো। টাকাটা অবশ্য গোপনে হাকিমকেই দিতে হোলো। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের গুপ্ত দলিল ও ফাইলে ঘটনাটা চাপা পড়ে গেল এবং এই সূত্রে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ঘৃণা উদ্রেক করার একখানা জাতীয় সংবাদপত্রের কাছ থেকে জরুরী আইন-বলে দুহাজার টাকা জামানত দাবী করা হোলো। হাইকোর্টে সম্প্রতি এই নিয়ে মামলা চলছে।

গোলমাল মিটবার পর সকলেরই ধারণা ছিল দুটি যুবক এবার গ্রাম ত্যাগ করে তাদের দেশে চলে যাবে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাদের সেই অনুরোধই জানিয়ে গেছেন। হাকিমকে বিদায় দিয়ে তারা ঘরের কাছে এসে দেখলো, তাদের ব্যাগ-বিছানা নিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ী জুড়ে সেই গাড়োয়ান অপেক্ষা করছে। তারা এসে দাঁড়াতেই গাড়োয়ান বললে, আসুন বাবুরা, ইস্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি। আর কিন্তু বাবু দয়া করে দশটি পয়সা দেবেন।

বীরেশ ফিরে দেখলো, তাদের ঘরখানা কৃষিমালে আর খড়ের বস্তায় বোঝাই হয়ে আছে। ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে মালিক দরজায় তালা বন্ধ ক'রে তাদের নমস্কার জানিয়ে বললে, মনে রাখবেন বাবু, আপনারা—আহা অনেক কষ্ট পেয়ে গেলেন।

রুদ্ধ আক্রোশে বীরেশ ফুলছিল। রজনী বললে, এবার কিন্তু খুব সাবধান, এটা ওদের ষড়যন্ত্র। আমরা জোর করে ঘর দখল করতে গেলেই ট্রেস্‌পাস্। আর ছাড়া পাওয়া যাবে না। তখন সত্যি সত্যিই গুণ্ডা বলে প্রমাণ করবে। তুমি যে দুটাকা খরচ ক'রে ঘর মেরামত করেছ তা'র ত কোন প্রমাণ নেই!

বীরেশ বললে, কিন্তু এ গ্রাম ছেড়ে আমরা কোথাও যাবো না ত!

কিছুতেই যাবো না। চল্ অন্য জায়গা দেখি।—এই গাড়োয়ান, আমাদের জিনিসপত্র দাও, আমরা যাবো না।

বেলা বারোটা কি দুটো বলা কঠিন। কিন্তু দেখতে দেখতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমে এলো। বৃষ্টিতেই ভিজতে ভিজতে ব্যাগ-বিছানা হাতে নিয়ে সমগ্র পৃথিবীর বিপক্ষে রুদ্ধ আক্রোশ বুকে মেখে কাদাপাঁকে বীরেশ রজনীর পিছনে পিছনে নিরুদ্দিষ্টভাবে চলতে লাগলো। এক সময় প্রশ্ন করলো, তোমার হাতে পুঁটলী আর ঝুড়ি কিসের রে, রজনী?

রজনী হাসিমুখে বললে, জন্ম।

কিসের রসদ ?

কাঁচামাল রে।

সে আবার কি ?

চাল, ডাল, আলু, মসলা, তেল, ঘি।

বীরেশ হতবাক হয়ে বললে, হ্যাঁ, তুই পারবি। তোরাই সংসারে উন্নতি করবি।

রজনী বললে, যাই বলো, যেখানেই যাও, পেট যায় সঙ্গে সঙ্গে। গরম ভাত ফোটালে কে বেশি খায় দেখবো।

কিন্তু ফোটাবি কোথায় ?

আয় দেখি,—ওই যে একখানা চালা। দেখি, জায়গা দেয় কিনা।

রাংচিত্তার এক বেড়ার ধারে এসে দাঁড়িয়ে তারা শুনলো, ভিতরে যেন ঢেঁকির আওয়াজ হচ্ছে। তারা সাড়া দিয়ে ডাকলো, কে আছো গো ঘরে ?

একটি লোক তখনই বেরিয়ে এলো। লোকটি মুসলমান। বললে, কি চাই বাবু ?

তোমাদের এই দাওয়ায় একটু ঠাঁই দেবে ?

লোকটি তখনই পিছিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে বললে, এ গাঁয়ে তোমাদের কেউ থাকতে দেবেনা বাবু। যাও তোমরা।

কিন্তু ভীষণ বেগে দুটি আসার জন্য বাধ্য হয়ে দুজনে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। গলা বাড়িয়ে দেখলে, ভিতরে ঢেঁকি নয়, তাঁতের কাজ চলেছে! তারা করুণ আবেদন জানিয়ে বললে, কর্তা, একবেলার জন্যে রইলুম, দুটো ভাত ফুটিয়ে খেয়েই চলে যাবো।

তাঁতিগিন্নী খটাস্ ক'রে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো, তার পিছনে পিছনে কর্তা। কর্তা চোখ রাঙিয়ে বললে, মাগি, তুই আক্কল মানিসনে ?

গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে বললে, না, মানিনে। বাছাদের খাবার জায়গা নেই, এখন তোমার আবদার ?...তোমরা থাকো বাবা, একবেলা কেন, যদ্দিন মর্জি।

কর্তা চেঁচিয়ে উঠলো, ওরে মাগি, পাইকদের হাতে তুই মরবি। মরণদশা তোর !

মরি মরবো, তোমারই হাতে কোন্ বেঁচে আছি ?—দাঁড়াও বাবা, তোমাদের জায়গা করে দিই। আমার হাতে জল আর কাঠকুটো নেবে কি ?

বীরেশ ঘাড় নেড়ে জানালো নেবে। রজনী গদগদ কণ্ঠে বললে, নেবো বৈ কি, মা আমার অন্নপূর্ণা !

আহা, বাছারা ভিজে ঢোল ! মুখ দুখানি শুকিয়ে আম্‌সি !—এই বলে পিতলের বড়া বা'র ক'রে তাঁতীগিন্নী জল আনতে চ'লে গেল। কর্তা একবার সমস্ত ব্যাপারটা নিরীক্ষণ করলো, তারপর বললে, আচ্ছা আমিই রান্নার কাঠ এনে দিচ্ছি। বাভনের সেবা করব, ভয় কি ?—এই ব'লে সে চলে গেল।

তাঁতী পরিবারের ঘর দোর যৎসামান্য। হাত পা নাড়ার জায়গার অভাব ঘটলেও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। বর্ষায় ভিজতে কিছু আর বাকি নেই। কাপড় জামা দূরের কথা, বিছানাটায় রাত্রে শোওয়া চলবে কিনা সন্দেহ। কাঁচা মাটির দাওয়াটুকুর উপর বৃষ্টির ছাটে এরই মধ্যে কাদার পিছল হয়ে গেছে। জলের ঝাপ্‌টা থেকে আড়াল করার জন্য তাঁতীবৌ দুখানা বড় চাটাই এনে গুঁজে দিল। অনেক কষ্টে যদি বা আখানা তৈরী হোলো, ভিজে কাঠ জ্বালাতে গিয়ে ধোঁয়ায় তাদের চোখে জল গড়িয়ে এলো। কলাপাতার উপর আধসিদ্ধ ভাত এক সময় যখন তারা পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন সমাপ্ত ক'রে উঠলো, তখন সন্ধ্যাও

আর বিলম্ব নেই। তাঁতীবৌ বললে, কাল বাবা তোমাদের সব ব্যবস্থা ক'রে দেবো, আজ একটু কষ্ট করে থাকো। তোমরা কি গাঁয়ে এখন থাকবে বাবা?

রজনী বললে, যদি জায়গা পাই থাকবো বৈ কি, মা।

ওনার কথা ধ'রো না, পাগল-ছাগল মানুষ। আমি সব ক'রে-কম্মে দেবো।

বে আক্কেল।

রজনী নরম জায়গায় আবেদন পৌছিয়ে দিতে জানে। কারো কাছে অনুগ্রহ নেওয়া বীরেশের এই প্রথম।

বৃষ্টিতে পথের দিকে চাইবার আর উপায় নেই, পথ অন্ধকার। এধারে ওধারে বাঁশবন, আস-শেওড়ার জঙ্গল, শালুক আর পানায়ভরা ডোবা, শৃগালের চীৎকার, ঝিল্লীর ঝনক্, ব্যাঙের ডাক,—সমস্তটা মিলিয়ে দুর্গম গ্রাম বীভৎস আঁধারে আচ্ছন্ন। এই গ্রামের সৌন্দর্য কোথাও নেই, একে ভালোবাসা সম্ভব নয়—এত বড় অপরাধ তারা করেনি যে, এর সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে হবে।

প্রহরখানেক রাত্রে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁতীবৌ এসে তাদের ডাকলো—এসো বাবা, তোমাদের শোবার জায়গা করেছি; এসো আমার সঙ্গে।

মুখ দিয়ে দুজনের কথা সরলো না, ভিজা হাওয়ার ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে বসে তারা দীর্ঘরাত্রির দিকে তাকিয়ে অকূল পাথার ভাবছিল। তাঁতীবৌর পিছনে পিছনে এসে ভিতর দিক্কার শেষের একখানা চালায় গিয়ে উঠলো। তাঁতীবৌ বললে, এখানটায় আগে গরু থাকতো। উত্তর দিকে ফুটো আছে, তা জল আসবে না ভেতরে। মোটা করে খড় পেতে

দিয়েছি—তোমাদের উপযুক্ত কি আর হয়েছে, বাবা? এই লণ্ঠনটা রইলো, আলো নইলে চলবে কেন?

অব্যক্ত কৃতজ্ঞতায় বীরেশ কেবল বললে, এই আমাদের যথেষ্ট।

তাঁতীবৌ চলে গেল। খড়ের গাদায় উপর দুই বন্ধু আরাম করে শুয়ে বললে, আঃ, অকূলে ভাসতে ভাসতে খড়কুটো পাওয়া গেল।

রঞ্জনী বললে, হৃদয় আছে প'ড়ে পথে ঘাটে, কেবল খুঁজে নেওয়া দরকার।

গোয়াল ঘরে আস্তানা পেয়ে তারা কয়েকদিন আর নড়তে চাইলো না। হিসেব করে দেখলো, প্রায় দেড়মাস তারা দেশ ছেড়ে এসেছে। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। দেশে ফেরবার কল্পনা তাদের মনে নেই।

শহরে থাকলে খরচ বেশি পড়ে; গ্রামে খরচ কম। আসবার পথ থেকে তাদের কয়েকটি টাকা মাত্র ব্যয় হয়েছে। সম্প্রতি আহার সামগ্রী বাবদ সামান্য কয়েকটি টাকা তারা তাঁতীবৌয়ের কাছে গচ্ছিত রেখেছে। স্ত্রীলোকটি সব আয়োজন ক'রে দেয়, তারা রেঁধেবেড়ে খায়, তাঁতীবৌ তাদের বাসন মেজে দেয় সানন্দে। হাটতলা থেকে রঞ্জনী একখানা রঙীন শাড়ী এনে জোর ক'রে তাকে পরিয়ে বলেছে, অধম সন্তানের উপহার।

তাঁতীবৌ সেই উপহার মাথায় তুলে নিয়েছে। কর্তা নিশ্বাস ফেলে জানিয়েছে, পাইকদের হাতে মাগি মরবেই।

তাঁতীবৌ হাসিমুখে বলেছে, বেঁচে মরেছি তোমার হাতে, ম'রে বাঁচবো তাদের হাতে। ওই ত আমার ছেলেরা, ওদেরই হাতে মাটি পাবো।

গ্রাম থেকে যুবক দুটি আজও বিদায় নেয়নি, এজন্য গ্রামে একটা আতঙ্ক ছিল। কিন্তু হাকিমের সঙ্গে যারা লড়াই করলো, এবং হাকিমের হাত ধরাধরি ক'রে হাজত থেকে বেরিয়ে এল, আজও কেউ তাদের

তাড়াতে পারলো না,—এটা সামান্য ব্যাপার নয়। আতঙ্কিত হলেও গ্রামের জনসাধারণ তাদের সম্ভ্রমের চোখে না দেখে পারলো না। চৌকিদার আবার তাদের সেলাম ঠুকেছে, ডাকপিওন আর মালিক হাত কচলেছে। হাটতলায় ফড়েরা দূর থেকে তাদের দেখলে উঠে দাঁড়িয়ে বলাবলি করে, হুজুররা আসছেন। গ্রামের ডাক্তারখানা আর স্থানীয় বোর্ডের ঘরে তাদের নিয়ে জটলা বসে। আশপাশের পাঁচ সাত খানা গ্রামে তাদের খ্যাতি, এবং অনেকেই জেনেছে ওরা সাধারণ নয়,—বাঙলা দেশ ত দূরের কথা, বিলেত পর্যন্ত ওদের নিয়ে আলোড়ন উঠেছিল। ওরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধেও গ্রাম ত্যাগ করেনি।

সেদিন হাটতলা থেকে ফিরে সবেমাত্র তারা আহার শেষ ক'রে উঠেছে, এমন সময় বাইরে হাকাহাকি শোনা গেল। তাঁতীকর্তা হাতে একগাছা লাঠি নিয়ে পাগলের মতো ছুটে গিয়ে তাঁতীবৌকে মারতে গেল,—হারামজাদি, দেখেছিস ওই পাইকরা এবার এসেছে গলা টিপে ধরতে? আমাদের ঘর জ্বালাবে, ফাটকে ভেরে—ওই শোন্! মাগি তোকে খুন করব!

বাইরে কয়েকজনের কোলাহল শুনে তাঁতীবৌ সত্যই একটু ভয় পেলো বৈ কি। বীরেশ আর রজনী বেরিয়ে এসে বললে, যতক্ষণ আমরা আছি তোমাদের কোনো ভয় নেই।

তার মানে, তোমরা যখন থাকবে না তখন মরবো? ওসব চালাকি শুনিনে, তোমরা এখুনি বেরোও আমার ঘর ছেড়ে। কালকুটে ঢুকেছে আমার খড়ের গাদায়।

দুই বন্ধু বাইরে আসতেই দুইজন সেই পুরনো পাইক, একটি ভদ্রলোক ও জন দুই সরকার তাদের নমস্কার জানালো। পাইক দুজনের সভক্তি প্রণামের কি ঘটা! বীরেশ প্রশ্ন করলো, কি চাই আপনাদের?

হাকিম সাহেব আপনাদের নেমন্তন্ন করতে পাঠিয়েছেন, এই চিঠি। বিশেষ অনুরোধ, আজ সন্ধ্যায় আপনারা পায়ের ধুলো দেবেন।

চক্ষের নিমেষে তাঁতীবৌ সবটা বুঝে নিল, তারপর দৌড়ে ভিতরে গিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো, মিন্‌সে কোথায়, আজ ওর ছাল ক'রে তবে ছাড়বো!

চার

হাকিমের লোকেরা বিদায় নেবার পর বীরেশ চিঠিখানা খুলে পড়লো।—

শ্রীতিভাজনেষু,

আশা করি আপনারা কুশলে আছেন। একটা অত্যন্ত অপ্রিয় ঘটনার সংঘাতে আপনাদের সহিত পরিচয়; ঘটনাটা দুঃখদায়ক হইলেও বিরোধের মধ্যেই আপনাদিগকে উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রমানুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। দেবীপুর গ্রামে বসিয়া কাহারও চরিত্রে অসাধারণত্ব দেখিব ইহা আগে কল্পনা করি নাই।

আজ আমার গৃহে একটি শুভ অনুষ্ঠান, আমার স্ত্রীর জন্মতিথি। এই উৎসব উপলক্ষে আপনাদিগকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইতেছি। সন্ধ্যা আটটার সময় আপনারা আসিয়া আমাদের উভয়ের সহিত আহার করিলে বিশেষ বাধিত হইব। আমার স্ত্রীও একান্ত অনুরোধ জানাইতেছেন। ইতি—

শ্রীতিকামী

অনিলকুমার সেন

চিঠি প'ড়ে বীরেশ বললে, টেবল উল্‌টে গেল যে রে।

রজনী বললে, গ্রেপ্তারের ফন্দি নয় ত ?

কারা ভেঙে রাত আটটায় গাঁ পেরিয়ে যাবো, লোকটা বোধহয় জব্দ করতে চায়।

ভালো খাওয়া পেলে কষ্ট সইবে। পান্তা ভাত আর খেতে পারিনে।

কিন্তু এই অঞ্চলে তাদের যেরূপ খ্যাতি রটেছে তাতে তাদের সহজে জব্দ করা কঠিন। বলা বাহুল্য, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার উপর তাদের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত নয়, এর মধ্যে সন্ত্রাসের আতঙ্ক নিহিত ছিল। হাকিম ও ম্যাজিস্ট্রেটও তাদের হয়রান করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছে, গ্রামবাসীর পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। ফড়ে আর চাষার জন্য তারা লড়াই করেছে, বড়লোকের ছেলে হ'য়ে সম্পদ ত্যাগ করেছে, সুতরাং কর্তৃপক্ষের অনেকেই তাদের সাম্যবাদী ব'লে সন্দেহ করেন। চাষাভূষো আর মজুরদের ক্ষেপিয়ে তোলা ছাড়া তাদের আর কাজ কি আছে ? যাই হোক, যুবক দুটির কৃপায় এই জেলায় জন চারেক গোয়েন্দার চাকরি জুটে গেছে। তারা অশরীরি প্রেতের মতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিচরণ করে, কিন্তু প্রহারের ভয়ে ওদের সামনে আসতে সাহস করে না।

অনেকদিন পরে আকাশের চেহারা দেখে আজ তারা ধোপদস্ত ধুতি আর পাঞ্জাবী বা'র করলো। তাঁতীবৌর চোখে আনন্দাশ্রু। জাতিতে সে মুসলমান, কিন্তু স্নেহপ্রকাশের সময় সে তার জাতের কথা ভুলে যায়। সে তার ঘরে গিয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে চন্দনকাঠ বার ক'রে ঘ'সে চন্দনতিলক দিল দুজনের দুই কপালে। রজনী রুদ্ধ অভিভূত কণ্ঠে বললে, রোজ সন্ধ্যে বেলা তুমি ওই তুলসীতলায় আলো দাও, উঠানে ওইটো বুঝি পীরের দরগা ?

তাঁতীবৌর আনন্দাশ্রু সহসা করুণ মাতৃস্নেহে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠলো। ফুঁপিয়ে কেঁদে সে বললে, না বাবা, ও আমার বুদ্ধি আর মহসন, ওইখেনে

ওরা আছে মাটির তলায়। আজ সাত বছর হোলো। ওলা-উঠোয় গেল ওরা দুজনে!

দুজনে আর কথা বলতে পারলো না। রজনী আড়ালে গিয়ে অলক্ষ্যে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে এলো।

রাস্তায় নেমে রজনী বললে, জুতোটা অনেক কষ্টে পরিষ্কার করেছি রে। হাতে নিয়ে চল্, হাকিমের বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে পায়ে দেওয়া যাবে।

আমি পারবো না।—বীরেশ জানিয়ে দিল।

কিন্তু রাস্তায় নেমে কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল, হাকিমের দুই পেয়াদা এবং সেই সরকার বাবুটি তাদেরই জন্য পথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের লক্ষ্য করেই রজনী তাড়াতাড়ি জুতোটা পায়ে প'রে নিল। একজন পেয়াদার হাতে ছিল একটা পেট্রোমাক্স লণ্ঠন, বোধ করি দশখানা গ্রামের মধ্যে সেইটিই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল আলো। তারা নমস্কার জানিয়ে বললে, আসুন, তাঁরা আপনাদের অপেক্ষায় রয়েছেন।

অনেককাল পরে একটা আভিজাত্য বোধ করা গেল। দুজনের সাবান-ঘষা মুখ, গোঁপ-দাড়ি কামানো, তার উপর ধোপদস্ত ধুতি পাঞ্জাবী, পায়ে চক্‌চকে জুতো,—আর চেহারা? অন্তত হাকিমের পাশে নিতান্ত বেমানান হবে না।

হাকিমের দরজার কাছে যখন তারা পৌঁছল, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ। ফুলের বাগান দেওয়া আধুনিক ধরণের একটি বাংলা, সামনের বারান্দায় একটা বড় টেবিলের উপর একটি কড়ি-কোটা চীনামাটির পাত্রে এক-গোছা খুঁটিবাঁধা কেতকী। পল্লীগ্রাম হলেও গ্যাস বাতির আলোয় সমস্ত বাংলাটা আলোকিত। তাদের দেখে হাসিমুখে হাকিম এবং তাঁর স্ত্রী যুগপৎ বেরিয়ে এলেন। দুটো বড় কুকুর ছুটে এলো তাঁদের আগে

অভ্যর্থনা জানাতে। হাকিম এসে দুজনের হাত ধ'রে উপরে তুলে নিলেন। বললেন, ইনি আমার স্ত্রী মিসেস্ অনুশীলা সেন। আসুন, আসুন—

নমস্কার বিনিময়ের পর রজনী বললে, ইনি আমার বন্ধু বীরেশ চৌধুরী, আমি রজনী রায়—

মহিলাটির বয়স পঁচিশের মধ্যে। চেহারাটা সুশ্রী, এবং আধুনিক পালিশে উজ্জ্বল। পরনে একখানা চকোলেট ক্রেপ শাড়ী, ঝলমলে জরির পাড়। হাতে আর গলায় চিকচিকে চুড়ি আর হার, পায়ে হালফ্যাশনের জু। তিনি বললেন, গ্রামে এমন রাস্তা নেই যে গাড়ী চলবে। সুতরাং আপনাদের হাঁটিয়েই নিয়ে এলুম, খুব কষ্ট হ'য়েছে ত?

অনিলবাবু হেসে বললেন, এ গ্রামে পা দেওয়া থেকেই উনি কষ্ট পাচ্ছেন।

সকলেই সকলের মুখের দিকে চেয়ে এই অর্থপূর্ণ কথায় উচ্চ হাসি হেসে উঠলো। বীরেশ হাসিমুখে বললে, আর কোনো কষ্টের কারণ আছে কি না তাই ভাবছি।

মিসেস্ সেন বললেন, ওঁর ওপর আপনার সন্দেহ বুঝি আজো যায়নি?

বীরেশের মুখ রাঙা হয়ে এলো। বললে, না, হাজত থেকে বেরিয়ে ওঁর সঙ্গে খুব আলাপ হ'য়ে গিয়েছিল।

রজনী বললে, আপনারা কতদিন এখানে আছেন?

এই প্রায় দুবছর হোলো। বদ্‌লি হবার কথা চলছে, কিন্তু আমার এ অঞ্চল ছাড়তে ইচ্ছে নেই, কেমন সুন্দর গ্রাম।

চায়ের ট্রে এসে হাজির হোলো। মিসেস্ সেন বললেন, অভ্যেস আছে ত?

আছে।—বীরেশ বললে, তবে জাঠীমা'র ঘরে এসব পাওয়া যায় না।

মিসেস্ সেন হাসতে হাসতে চা ঢালতে লাগলেন।

মিষ্টার সেন বললেন, হাটতলায় আমি হাকিম, এখানে কিন্তু অনিল সেন। আপনারা অতিথি নিমন্ত্রিত, এখানে আপনাদের সেবা করব।

মিসেস্ সেন বললেন, ফরমালিটি রাখো। আচ্ছা, আপনাদের এ অঞ্চল কেমন লাগে ?

অনিলবাবু বললেন, সে ত' অভিজ্ঞতাতেই প্রকাশ।

রজনী বললে, এখানে হঠাৎ এসে পড়েছি দুজনে, পাড়াগাঁ ভালো লাগছে একটু দেখি লাগে। এখনো ঠিক ধাতে বসেনি।

অনিলবাবু বললেন, থাকুন এখানে, আমাদের দল ভারি হোক। এখানকার কাজ কারবার ভালো, তবে কেউ অরগ্যানাইজ করেনা। আপনারা যদি থাকেন তবে আমি সাধ্যমতো সাহায্য করতে পারি। আগে ইউনিয়ন বোর্ডটা অধিকার করা দরকার। কেউ কোনো চেষ্টা করেনা এখানে, শহরকে তুলে এনে যদি আমরা গ্রামে বসাতে পারি তবেই কাজ হয়।

বীরেশ আকৃষ্ট হ'য়ে উঠলো। বললে, আমারও একটা প্ল্যান আছে।

সিগারেট ও চুরুটের পাত্র এলো। পাঁচ সপ্তাহ পরে রজনী সিগারেট মুখে তুললো।

আপনি ?

বীরেশ বললে, আমি খাইনে।

মিসেস্ সেন বললেন, গ্রামে রাস্তাঘাট নেই, লাইব্রেরী নেই, ক্লাব নেই, ডাকবাংলো নেই। কিন্তু কে গ্রাহ্য করে ? শহরের কোনো জিনিস কিনতে পাওয়া যায় না। ইস্কুল পাঠশালা, লেখাপড়ার পাটও নেই। যাকে বলে, অশিক্ষার অন্ধ। কিন্তু কি জানেন, আমি বিশ্বাস করি মানুষের চেষ্টায় সবই হ'তে পারে, তবে তার আগে হাতের মধ্যে ক্ষমতা পাওয়া দরকার।

বীরেশ বললে, ক্ষমতা ত' আপনাদের আছে ?

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হেসে উঠলো, হাসির কারণ কিছু রহস্যময়। মিসেস্ সেন বললেন, এদেশে কোনো বড় কাজ করার ক্ষমতা হাকিমদেরও নেই। তারা ফড়েদের ঠ্যাঙাতে পারে, পাইক পাঠিয়ে বিনা অপরাধে লোককে হাজতে পাঠাতে পারে, দেশের কর্মীদের হায়রাণ করতে পারে, —কিন্তু দেশের কাজ করার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা হাকিম নয়, হাকিমের অভিনয় করে, চাকরি করে।

বীরেশের চোখ দপ্ দপ্ করতে লাগলো। বললে, আমাদের পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছেন কেন আপনারা ?

গোয়েন্দা !—অনিলবাবু বললেন, কই, এ ত' আমরা জানিনে।

রজনী বললে, তারা ত' শুনুন, হাকিমের হুকুমেই চলে।

অনিলবাবু বললেন, যদি গোয়েন্দা আপনাদের পিছনে লেগে থাকে তবে অত্যন্ত অনুতাপের কথা। অবশ্য আপনাদের জানিয়ে রাখলুম আমার দিক থেকে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আমি বুঝতে পারলে তাদের বাধাই দেবো। কর্তৃপক্ষরা এ খবর আমাকে দেয় নি।

মিসেস্ সেন বললেন, এদেশের হাকিমকেও ওরা বিশ্বাস করে না, কেন ?

ভদ্রমহিলা হাসলেন। বললেন, এদেশের ছাগলকেও ওরা ভয় পায়, কারণ তার দুধ খেয়ে মহাত্মাজীর মতন একজন বিপজ্জনক মানুষ তৈরী হ'তে পারে।

আবার হাসির রোল উঠলো।

বীরেশ তার নিজের জন্ম একটা অপ্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ আবিষ্কার করলো। সহসা মনে হোলো, দেশ ছেড়ে আসার জন্ত তার মনে আর কোনো ক্ষোভ নেই। তার আত্মীয়স্বজনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে

সে আর কি দিয়ে? তাদের স্মৃতিও তার কাছে দুঃখদায়ক। দেশের কাজে সে নামবে এমন একটা সুলভ কল্পনা নিয়ে সে পথে বেরিয়ে আসেনি। বস্তুত দেশের কাজ বলতে বা বোঝায় তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা সে জানে না। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাবার একটা লোভ আছে তার মনে মনে। ক্ষমতাকে সে ভালোবাসে। পিতার সঙ্গে তার যে বিবাদ, সে যে কেবল আদর্শ নিয়ে তাই নয়, তার বলিষ্ঠ আত্মস্বাতন্ত্র্য কোথাও ঠাঁই পায় নি, তার মনে এই রুদ্ধ অভিমানও ছিল। ক্ষমতার চেহারা সে জানে, ক্ষমতার পৃথিবী করতলগত করা যায়, এবং ক্ষমতা হাতে নেবার জন্যই তার জন্ম।

সে বললে, ধরুন, এই গ্রামে যদি কাজে নামি, আপনি কি মনে করেন?

অনিলবাবু বললেন, আপনার কি কি আয়োজন আছে, বলুন?

কিছু নেই। আপনি আমাকে একটা থাকার জায়গা দিতে পারেন?

থাকার জায়গা! হ্যাঁ, তা পারি বৈ কি? তুমি কি বলো, অনুশীলা?

মিসেস্ সেন বললেন, ওঁরা ভালোভাবে থাকতে না পেলে কিছু ক'রে উঠতে পারবেন কি? তোমাদের কোর্টের পাশে ওই যে কো-অপারেটিভের ঘর ছুটো প'ড়ে রয়েছে ওটার বন্দোবস্ত করে দাও না?

মন্দ আইডিয়া নয়। আচ্ছা, দেখি—

অনুশীলা বললে, কিন্তু তাঁতীবৌয়ের অত আদর যত্ন, ওঁরা কি তাকে ছেড়ে আসতে পারবেন?

বীরেশ বললে, তাঁতীবৌকে ছেড়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু তার মতন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন, মিসেস্ সেন।

অনুশীলার বড় লোভ হচ্ছিল এই উগ্রস্বভাব, মেধী এবং আদর্শবাদী ছেলেটিকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে। সে চট্ ক'রে বললে, খুঁজলে হয়ত আরো পাওয়া যায়, বীরেশবাবু,—কিন্তু হৃদয় খোঁজবার মানুষ সংসারে বড় কম।

বীরেশ মুখ তুলে তাকালো। হাকিমের স্ত্রীর ভিতর দিয়ে কথা কয়, এ যে নলিনী ভিন্ন মুখে। সব ছেড়ে সে এসেছে, কিন্তু কৈ, নলিনী ত তাকে ছাড়েনি!···চোখ দুটো তার ঝাপ্‌সা হয়ে এলো মুহূর্তের জন্য। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করে হেসে বললে, হৃদয় খোঁজার কাজটাই বাজে কাজ, যেমন ঈশ্বর খোঁজাটা হাস্যকর। কি বলুন অনিলবাবু?

অনেকটা তাই বটে।

অনুশীলা প্রশ্ন করলো, আপনারা কয় ভাই-বোন, বীরেশবাবু?

মৃদু তিরস্কার ক'রে বীরেশ বললে, আলাপটা কিন্তু এবার ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে।

তা হোক, বলুন আপনি।

রজনী এবার রাগ ক'রে বললে, ভারি একরোখা তুই। আমি বলছি,—ও একটিমাত্র ছেলে, আর ভাইবোন নেই।

ওঃ তাই। মা বাবার আদরে বুঝি মানুষ?

অনিলবাবু বললেন, বলাই বাহুল্য।

রজনী বললে, না, শিশুকাল থেকেই ওর মা নেই, আর বাবা তখন বিলেত থেকে আমেরিকায়।

অনিলবাবু ও অনুশীলা একেবারে স্তব্ধ। চায়ের বাটিতে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে বীরেশ বললে, এর পরে স্বভাবতঃ যে প্রশ্ন ওঠে তাই জিজ্ঞেস করুন?

তার কণ্ঠ যেমন রুক্ষ তেমনি সহজ। কিন্তু অনুশীলা আর কোনো

প্রশ্ন করলো না। এক সময় কেবল এই অপ্রীতিকর স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে বললে, মেঘ ডাকছে, আবার বৃষ্টি নামতে পারে।—আপনারা কোন্ খাওয়াটা পছন্দ করবেন, ভাত না লুচি?

দুজনেই বললে, ভাত দেবেন।

আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা ক'রে আসি। এদিকে আমার সবই প্রস্তুত।—এই ব'লে অনুশীলা ভিতর দিকে চ'লে গেল।

রজনী এতক্ষণে তার আসল কথাটা পাড়লো। বললে, আমরা কাল রাত্রে দুজনে যা স্থির করেছি, আপনাকে বলতে চাই, অনিলবাবু।

কি বলুন ত?—অনিলবাবু উৎসুক হয়ে উঠলেন।

যে-কারণেই হোক এ গ্রামে আমাদের ওপর কেউ তেমন খুশি নয়, তাই একটু অসুবিধে হ'তে পারে। কিন্তু যদি আমরা থাকবার মতন একটা ভালো জায়গা পেতুম, তাহ'লে হয়ত,—এই ধরুন, কিছু একটা ব্যবসা বাণিজ্য করার যদি সুবিধে হয়ে ওঠে।

বেশ ত!

এ অঞ্চলে তামার বাসন, বেতের কাজ, মণিহারি,—এগুলো বেশ চলে এই আমাদের ধারণা।

অনিলবাবু বললেন, থাকার ব্যবস্থা আপনাদের আমি ক'রে দেবো, আর এও দেখবো এ অঞ্চলের লোকেরা আপনাদের অসুবিধে না ঘটায়। ব্যবসায় প্রথমে হাত দিলে খুব ভালো হয়, এদিককার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তারপর আপনারা দুজন আছেন। আপনারা সাহায্যের লোক পাবেন। হ্যাঁ, আরও কিছু কাজ এদিকে হ'তে পারে। প্রথম ধরুন, ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের নানারূপ কাজ,—বিশেষ ক'রে রাস্তাঘাট, নদীনালা, শিক্ষা, ঔষধপত্র ইত্যাদি; দ্বিতীয়ত, নদীর ওপারে জঙ্গল, তারপর পাহাড়—অবশ্য ছোট ছোট, ওদিকে লোহার ওরস্ পাওয়া যায়,—ওদিক থেকেও

একপ্রকারেই করা চলে,—তবে ওকাজে সাহস আর লোকবল দুই-ই দরকার।

বীরেশের স্বপ্ন জাগ্রত হোলো। সমস্ত মন দিয়ে সে দুজনের কথা শুনছিল। গ্রামের জনসাধারণ, প্রকাণ্ড বাণিজ্য, প্রচুর অর্থ, নদীর ওপারে পাহাড়, অজানা দেশ, দুর্গম ভবিষ্যৎ,—এবং এদেরই নিংড়ে নিয়ে বিপুল ক্ষমতার অধীশ্বর হওয়া। যে-শক্তি তার বাঁধন কেটে দূরের দিকে ঠেলে দিয়েছে সেই শক্তিই কি তাকে স্বর্ণময় শক্তিময় ভবিষ্যতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে না? এই সেদিন পর্যন্ত তার জীবনে নানা কল্পনা ছিল। সে বিলেত যাবে, ব্যারিস্টার হবে, আইন ব্যবসায়ে সে শীর্ষস্থান অধিকার করবে, দেশের নেতৃত্ব নেবে, মানুষকে শাসন করবে। তার কল্পনা ছিল, সে পৃথিবী ভ্রমণ করবে,—যাবে মেরুদেশে, যাবে গৌরীশৃঙ্গে, যাবে সাহারায়। আজকে আবার একটা অপরিকল্পিত নতুন জীবন যেন চারিদিক থেকে তাকে ইশারায় কাছে ডাকছে। বাণিজ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য ক্ষমতা,……হ্যাঁ, ক্ষমতা তার বড় প্রিয়। ক্ষমতায় সে অন্ধ হ'তে জানে, মহিমান্বিত হ'তে জানে। ক্ষমতা হাতে পেলে আধুনিক কাল, আধুনিক যুগকে চূর্ণ ক'রে সে নতুন একটা আকার দিতে পারে। ক্ষমতা যেদিন সে পাবে, সে হবে সর্বাধ্যক্ষ একনায়ক। এই অদ্ভুত শাস্ত্র আর আচার, আর চিরাচরিতের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্তি দিতে গেলে একনায়কত্ব নেওয়া ছাড়া আর গতি নেই। সে হবে সর্বাধিকারী। সমাজের অনুশাসনকে সে আমল দেবে না, তাকে হ'তে হবে একটা প্রবল প্রতিবাদ। যদি তাকে বর্বর হ'তে হয়, নিষ্ঠুর হ'তে হয়, সে হবে মহিমান্বিত বর্বর। তার দানবীয় সংহারশক্তিকে স্তবের দ্বারা তুষ্ট করতে হবে, তার কাছে নতি স্বীকার ক'রে পূজা দিতে হবে।

বাইরে বাদলের ধারা আবার আকাশ ফেটে নেমে এলো। কৃষ্ণ-পক্ষের প্রান্তরভরা অন্ধকার আজ বীরেশের খুব ভালো লাগছে; দুর্যোগ আর দুর্গমের ভয়াল আকৃতি কেমন যেন একটা নিবিড় আনন্দের আবেশ তার মনের উপর বুলিয়ে দিচ্ছে। ইচ্ছা করে এই আঁধার রাত্রে দুঃখের নদী পার হয়ে গিয়ে পাহাড় কেটে সে বা'র ক'রে আনে লৌহদণ্ড, আর তাই দিয়ে বানায় ইন্দ্রের বজ্র। আঁচল ধরা হয়ে সে জন্মায়নি, মেরুদণ্ডহীন হয়ে সে বাঁচবে না, সর্বস্বান্ত নগণ্য বাঙালীর মতো মরবে না। সমস্ত জীবন তার বারুদের একটা স্তূপাকার, বিরাট গর্জনে আগুন জালিয়ে তবে সে চূর্ণ হয়ে পড়বে।

অনুশীলা এসে দাঁড়াতেই বীরেশের চমক ভাঙলো। ইতিমধ্যে রজনী পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বা'র ক'রে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় অনিল-বাবুর মারফৎ টুকে নিচ্ছে। কোনো সময়েই সে নিজের গণ্ডা ভুলবে না, তার কম্পাসের কাঁটা একটিমাত্র দিক নির্ণয় করে। সেটি তার হিসাব বুদ্ধি।

হাসিমুখে অনুশীলা সহসা বললে, রজনীবাবু, আপনিও কি বাড়ী থেকে রাগ ক'রে দেশছাড়া হয়েছেন?

বীরেশ ও রজনী দুজনেই থতমত খেয়ে মুখ তুলে তাকালো। রজনী বললে, কই, না?

বীরেশ বললে, আপনি এ খবর পেলেন কোথা থেকে?

অনুশীলা বললে, বিলেত পর্যন্ত আপনাদের খবর পৌঁছল, আর আমি এ খবরটুকু পাবো না? অবাক করলেন আপনারা।

অনিলবাবু বললেন, তোমার প্রশ্নগুলো ভারি অসুবিধাজনক, অনুশীলা। ব্যক্তিগত খবর মেয়েদের ভারি মুখরোচক।

অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে বীরেশ বললে, উড়ো খবর যারা রটায়, ভেতরে তারা তলিয়ে দেখে না।

অনুশীলা বললে, যাই বলুন, ভারী অভিমানী আপনি, কোথাও এতটুকু আঁচ সইতে পারেন না। প্রথম থেকে সেই যে আপনি আমার ওপর চ'টে আছেন, এখনো একটু প্রসন্ন হলেন না।

বীরেশ বললে, ভয়ানক নালিশ আপনার। আপনার বাড়ীতে পাত পাতবো অথচ আপনার ওপর রাগ করব, এত নির্বোধ আমাকে ঠাওরালেন ?

রজনী বললে, আপনি এক কাজ করুন মিসেস সেন, সব বাদ দিয়ে ওকে এক হাঁড়ি মধু খাইয়ে দিন তবে যদি ওর মুখ মিষ্টি হয়।

পাচক এসে জানালো, আহার প্রস্তুত। রজনীর উক্তির উপর মন্তব্য বীরেশের মুখের মধ্যে রয়ে গেল, অনুশীলা হাসিমুখে কেবল বললে, না রজনীবাবু, গুল খেয়ে যার গলা ধরে তাকে তেঁতুল দিতে হয়। আসুন আপনারা।

হাল আমলের একটি পরিবার। বুঝতে পারা যাচ্ছে এঁদের সন্তানাদি এখনো হয়নি। কুকুর দুটো একবার ঘোরাফেরা ক'রে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ভিতরে এসে শ্বেতপাথরের বড় টেবিলের উপর বিপুল ভোজের আনুপূর্বিক ব্যবস্থা দেখে রজনী মনে মনে শিউরে উঠলো। না খেয়ে নাড়ি মরে এসেছে, এগুলি সব আত্মসাৎ ক'রে ফিরে যাওয়ার অর্থ অনেকটা আত্মহত্যা করা। ওগুলোর মধ্যে কি-কি খাবে সে আলোচনা থাক্ কিন্তু কি-কি খাবে না তাই সে তোলাপাড়া করতে লাগলো, কিন্তু তেমন একটি দফাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

অনিলবাবু তাদের নিয়ে বসলেন। একটু পরেই নূতন সজ্জা ও সর্বপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে অনুশীলা পুনরায় আসরে এসে নামলেন। কপালে তার শ্বেত ও রক্তচন্দনের কারুকলা, পরণে শাদা জরির বুলকি-

দেওয়া নীলাম্বরী, গলায় তারকার মালা, মাঝখানে বড় একখানি হীরক খণ্ড। বীরেশ মাথা নত ক'রে নিল। রজনী ফস্ ক'রে ব'লে উঠলো, কী আশ্চর্য, নানা বাজে কথায় ভুলেই গেছি, সমস্ত ব্যাপারটা আপনার জন্মতিথি উপলক্ষ্য ক'রে।......বাঃ কী সুন্দর মানিয়েছে আপনার স্ত্রীকে অনিলবাবু।

অনিলবাবু স্ত্রী-গৌরবে হেসে বললেন, মেয়েদের ওই ত' কাজ সারাদিনের, কি বলুন বীরেশবাবু?

বীরেশ মুখ নত রেখেই সামান্য হাসলো। অনিলবাবু পুনরায় বললেন, আজ আমার তপোভঙ্গ না হ'লে বাঁচি।

আহারের এই সর্বব্যাপী আয়োজনে আগে থেকেই রজনীর সর্বাঙ্গ পুলক ও হর্ষে রোমাঞ্চিত, তার উপর এই সুস্বাদু রসিকতা; সুগন্ধি ও সুসিদ্ধ ফাউলকারির দিকে মুখ নত করেই সে সানন্দে গদগদহাসি হেসে উঠলো।

অনুশীলা বীরেশের দিকে অলক্ষ্যে একবার তাকিয়ে বললে, আগে-কার দিনে তাই হোতো শুনেছি, কিন্তু একালে সহজে তপোভঙ্গ যে হয় না তোমাদের, এই দুঃখ।......কি বলুন বীরেশবাবু?

বীরেশ বললে, এখন কিছু বললে সিডিশন্ হ'তে পারে।

হাসিমুখে অনুশীলা ডিশগুলো সাজাতে লাগলো। রজনী বললে, খাবার আগে আজ আমরা অনুশীলা দেবীর অগণ্য জন্মতিথি কামনা করব, বারে বারে আজকের এই তিথিতে আমরা যেন এসে মিলতে পারি।—দেখুন, উত্তম আহারের সময় কাঁটা চাম্চেগুলো ভারি বিরক্ত করে, তাড়াতাড়িতে ওগুলো যেন হাতে জড়িয়ে যায়।

অনিলবাবু বললেন, আপনার অসুবিধে হ'লে ওগুলো সরিয়ে দিন্। বয়!

বয় এসে রজনীর পাশ থেকে কাঁটা চামচগুলো নিয়ে গেল।

ভদ্রতা রক্ষার্থে বীরেশ বললে, কিন্তু কই, আপনি বসবেন না আমাদের সঙ্গে, মিসেস সেন ?

অনুশীলা পরিবেশন করতে করতে বললে, যাক্, আমার সাধনা সার্থক, আপনি আত্মীয়তা করেছেন এতক্ষণে।

লজ্জায় বীরেশ আড়ষ্ট হ'য়ে উঠলো। এতক্ষণে জানা গেল এ নলিনী নয়, আর কেউ। অনিলবাবু বললেন, উনি রাত্রের দিকে এসব খান্ না।

আচ্ছা, এবার তাহ'লে আমরা বসে পড়ি ?—লালাসিক্ত মুখে রজনী আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

হ্যাঁ, এবার বসতে পারি। আমাদের উভয়ের আন্তরিক শুভেচ্ছা আর ধন্যবাদ আপনাদের জানাই।

অনুশীলা বললে, আমার জন্মতিথি কয়েকবারই এসেছে, কিন্তু আজকের আনন্দ অভিনব। পল্লীগ্রামের নিঃসঙ্গ জীবনে আপনাদের মতন দুজন শিক্ষিত ভদ্র বন্ধু পেয়ে আমরা সত্যই কৃতার্থ। আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন নির্বিঘ্ন ও নিষ্কণ্টক হোক, একান্ত মনে এই কামনা করি। —এবার খেতে বসুন, আপনারা।

বীরেশ বললে, বিরূপ আর বিপরীত একটা অবস্থায় আপনাদের সঙ্গে পরিচয়। হয়ত আপনাদের মনোবেদনা দিয়েছি, হয়ত আমাদের আচরণে ঔদ্ধত্য আর রূঢ়তা আপনাদের বিক্ষুব্ধ করেছিল। কিন্তু আপনারা কেবল ক্ষমাই করেননি, আমাদের প্রতি অকৃপণ স্নেহে আপনারা কাছে তুলে নিয়ে আশ্রয় দিতে চেয়েছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের পথে অকুণ্ঠ সাহায্য করার জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে অগ্রসর হয়েছেন,—আপনাদের এই মহত্ত্বের কাছে, আমরা অবনত, চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ।

এক মুখ খাবার পুরে গিলতে না পেরে রজনী অব্যক্তকণ্ঠে বললে, আমিও বল্‌ব মিসেস্ সেন, আগে খেয়ে নিই।

তার বর্তমান করুণ অবস্থা লক্ষ্য ক'রে সকলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

ভোজনের আদি পর্ব চলতে লাগলো। বাইরে তখন অনর্গল অশ্রান্ত ধারাবর্ষণ চলেছে।

কিছু দূর এগিয়ে এসে এক সময় মুখ তুলে অনিলবাবু, বললেন, বীরেশবাবু খেতেই পাচ্ছেন না, দেখছ না অনুশীলা ?

অনুশীলা বললে, কিছু ব'লোনা, উনি ভারি অভিমানী। দেখছি অনেকক্ষণ থেকে, দেখি না কি করেন।

বীরেশ বললে, এত আয়োজন, ঠিক আয়ত্ব করা কঠিন।

বড় একখানা মাংসের টুক্‌রো মুখে পুরে রজনী বললে, ওটা অমনিই, চিরকাল কাণ্ডজ্ঞানহীন।

বীরেশ বললে, আমার বন্ধুকে ক্ষমা করবেন। খাবার দেখলেই ও ফাঁসীর খাওয়া খায়।

রজনী বললে, তোর খাওয়া দেখলে আমার ব্রাহ্মসমাজকে মনে পড়ে।

অনুশীলা খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো।

পাচক আর তিন চার পদ নানা রসের প্লেট এনে হাজির করলো। রজনীর চোয়াল তখন ব্যথা করছে, তবু ক্লান্ত কণ্ঠে সে বললে, এবারে মান রক্ষা হ'লে হয়।

অনিলবাবু বললেন, কোনো তাড়া নেই, ধীরে সুস্থে খান রজনীবাবু।

এতক্ষণ পরে রজনী একটু লজ্জা পেলো। বললে, কি জানেন, সেই ইস্কুল কলেজের পুরনো অভ্যাস, দশ মিনিটের মধ্যে না হ'লে যেন খাওয়াই হোলো না।

বীরেশের চেয়ারের পিছন দিকে অনুশীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার

আহার নিরীক্ষণ করছিল। সহসা সে আর আত্ম-সম্বরণ করতে পারলো না, ঈগলপক্ষীর ন্যায় পিছন থেকে একটু ঝুঁকে সে বীরেশের ডিসের উপর হাত বাড়ালো। বললে, অত লাজুক কেন, অমনি ক'রে ভাত মাখে না, এমনি ক'রে মাখতে হয়।—এই ব'লে সে জব্দ ক'রে ভাত মেখে দিতে লাগলো। পুনরায় বললে, ফেলুন হাত থেকে কাঁটা চামচ,—অনভ্যেসের ফোঁটা! ভাত মেখে যে খেতে শেখেনি, সে বাড়ী থেকে রাগ ক'রে দেশছাড়া হয় কোন্ সাহসে?

অনিলবাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক—এবার কিন্তু ঠিক বলেছ, অঙ্গুলীলা। এইবার ঠিক বীরেশবাবুর খাওয়া হবে। নিন্, আর একবার চেষ্টা করুন, বীরেশবাবু।

বীরেশ হতবুদ্ধি হয়ে একবার তাকালো। সত্যি বলতে কি, মহাব্যস্ততা সত্ত্বেও রজনী মুখ তুলে একবার না হেসে পারলো না।

অঙ্গুলীলা বললে, এখনো যোগ আনা হয়নি—এই ব'লে সে ভাত মাখা হাতেই বীরেশের ডান হাত খানা ডিসের উপর চেপে দিয়ে পুনরায় বললে, খান্ এবার 'শুভ্ বয়' হয়ে।

এমনি ক'রেই সেদিন সান্ধ্য ভোজনের পর্ব সমাপ্ত হোলো। হাত ধুয়ে এসে দাঁড়াতেই তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী এসে হাসিমুখে বললে, নিন্, পান নিন্।

ও পান খায় না, দিন্ আমাকে।—রজনী প্লেট থেকে পান তুলে নিল।

সিগারেট?—অনিলবাবু সিগারেটের ট্রে বাড়িয়ে ধরলেন।

থ্যাঙ্কস্—সিগারেট আমি খাইনে। বীরেশ ভয়ে ভয়ে জানালো। রজনী সিগারেট নিল।

অঙ্গুলীলা বললে, আপনি যে দেখছি সকল রসে বঞ্চিত। এমন আধ্যাত্মিক অভ্যেস কেন একালে?

বৃষ্টি তখনো অবিশ্রান্ত ঝরছে। বাইরের দিকে চেয়ে রজনী চিন্তিত হয়ে বললে, এতই যখন করলেন তখন গোটা দুই ছাতার বন্দোবস্ত করুন, মিস্টার সেন।

অনুশীলা বললে, ছাতা? কেন?

এবার আমরা বিদায় নেবো।

বীরেশ বললে, যথেষ্ট রাত হয়েছে।

বা রে!—অনুশীলা ভীষণ অনুযোগ ক'রে বললে, কোথা যাবেন এ বৃষ্টিতে? ঘরে আপনাদের বিছানা ক'রে দিলুম,—মানুষের অভাবে ওই নরম বিছানাকে কাঁদাবো সারারাত?

রজনী বললে, বলেন কি?

বলি ভালো।—অনুশীলা স্বামীর দিকে একবার চেয়ে হেসে বললে, খাইয়ে দাইয়ে কাদা-বৃষ্টিতে ঠেলে দেবো? ভেবেছেন কি আপনারা? খড়ের গাদার ওপর টান, না তাঁতিগিন্নীর জন্য দুর্ভাবনা?

বীরেশ চিঁ চিঁ ক'রে বললে, কিন্তু সে কি ক'রে হয়?

অনিলবাবু বললেন, কি ক'রে কি হয় দেখিয়েই দাওগে না, অনুশীলা?

অনুশীলা তর্জনী প্রসারণ ক'রে সহাস্যে বললে, শিগ্‌গির ঘরে যান বলছি ভালো কথায়, আমি কোনো কথাই শুনতে চাইনে। আজও আপনাদের হাজত বাস।

কথা কাটাকাটি ক'রে আর লাভ নেই। তাদের কোনো কথাই আর খাটবে না। অগত্যা তারা ঘরে গিয়ে সেই রাত্রির মতো প্রবেশ করলো এবং সমস্ত রাত ধ'রে সেই মার খাওয়া পাইকটি তাদের বরজার কাছে শুয়ে মশার কামড়ে সারারাত ওলোট-পালট খেতে লাগলো। নরম শয্যা আর নেটের মশারির মধ্যে তারা রইলো বন্দী হয়ে।

পাঁচ

এর পরে ছয় মাসের কাহিনীতে রস যদি বা কিছু ছিল, রহস্য ছিলনা। দুর্যোগে বিপর্যস্ত জীবন—কতকটা রসের কেন্দ্র বৈ কি। ভাগ্যের বিদ্রূপ, বিরূপের চক্রান্ত, আত্মীয় বিচ্ছেদ, ছোট কৃপণতা, ছোট ছোট মহত্ত্ব আর ঈর্ষা—সমস্তগুলো একত্র ক'রে দূরের পরিপ্রেক্ষণে বিচার করলে অবশ্যই কিছু রসের অবতারণা ঘটে। কিন্তু আসল কথাটা এই—নদীর ভাঙনে একদিকের তট ধ্বংস হয়, অন্যদিকে শস্য ফলাবার চর পড়ে। দুজনের জীবন এগিয়েই চলেছে।

প্রথম অবস্থায় পিতার কাছে বীরেশ একখানা জরুরী চিঠি পাঠিয়েছিল—তার ভাষা অনেকটা এই :—

শ্রীচরণেষু,

ভাগ্যের পরীক্ষার আর যুদ্ধে আমি লিপ্ত। কিন্তু আলোর সন্ধানও আমি পেয়েছি। সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল, যদি কোথাও সহায়তা না থাকে। আমার জীবনে আইন অমান্য আন্দোলন করেছি বটে তবে কিছুতেই কোনো চুক্তি করব না এমন নেশা আমার নেই। আপনার কার্যকরী সহানুভূতি পেলে আমার পথ সুগম হয়। এই পত্র পেয়ে আমাকে অন্তত শ' পাঁচেক টাকা পাঠাবেন। এ টাকা আপনার পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ, আমার পক্ষে অনেক। আমি বিশেষ বিপন্ন। ইতি—

প্রণত বীরেশ

চিঠির উত্তর আসেনি তা নয়, এসেছিল অনেকটা বিলম্বে এবং বোধ করি বহু বিবেচনার পর :

দীর্ঘজীবেষু,

একালের বালকদের সকল নাস্তিকতার পিছনে থাকে অন্তঃসারশূন্য সাহসের নামে আন্তরিক ভয়। যে আইন অমান্যটা সন্ধির জন্য সর্বদা উৎসুক তার ভিতরে আছে স্বভাব দৈন্য। একদিন জাহাজের খালাসীর ছদ্মবেশে আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলুম, বাঙালীর অদৃষ্ট-বাদের সঙ্গে আপোষ করিনি। তোমার অজ্ঞাতবাসেই জানাতে চাই তুমি অসীম শক্তি সংগ্রহ করছ ভবিষ্যৎ কুরুক্ষেত্রের জন্য। তোমাকে সাহায্য ক'রে আমার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করতে পারব না। অতঃপর আমার সঙ্গে আর পত্রালাপ করবার চেষ্টা ক'রো না, কেবল জেনে রেখো আমার আশীর্বাদ রইলো তোমার সকল বিঘ্ন আর বিপদে। একটি সংবাদ তোমার জানা দরকার। আমার স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি মিলিয়ে সম্প্রতি আমি দানপত্র রচনা করেছি। সর্বসমেত দুই লক্ষ টাকার বেশি হয়নি। কোথায় এবং কা'কে এই দান করেছি তা জানতে চেয়ো না, সে সংবাদ আমার মৃত্যুর পর তোমার কানে পৌঁছবে আশা করি। ইতি—

সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

চিঠি পেয়ে বীরেশ কেবল মনে মনে পিতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়েছিল। এ চিঠি তাকে ক্ষুব্ধ করেনি, পিতার প্রতি তার সমগ্র অন্তর শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠেছিল।

এর পরে অসীম অধ্যবসায় সহকারে অর্থ সংগ্রহ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। দেবীপুরকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি গ্রাম একত্র ক'রে দুজনে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পুনর্বার উজ্জীবিত ক'রে তুললো। হাকিমের সহযোগিতায় সে যখন এই ব্যাঙ্ককে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হোলো, সেই সময় একদা সহসা এক সহস্র টাকা তার

হাতে এসে পৌছল। ইনস্যুরেন্স ক'রে টাকা পাঠিয়েছে নলিনী। তার সঙ্গে ছোট একটি চিঠি :

বিনা সম্ভাষণেই আমার বক্তব্য তোমার কাছে নিবেদন করি। মেসোমশায়ের কাছে তোমার চিঠি এবং তাঁর উত্তর—দুটি কাগজই পড়েছি। সহসা মনে হোল আমি বা কম কিসেপ ব্যাঙ্কের পুঁজি নিয়ে আমিও যদি একটা দান-পত্র প্রস্তুত করি মন্দ কি? সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই আমি বিদেশে যাবো বৈরাগিনী হয়ে। যোগিনী হবারও বাসনা আছে, কারণ তাহ'লে 'মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে' যাওয়া সহজ হোতো। তুমি দাম্ভিক, দেবতামাত্রেই দম্ভের অবতার, কিন্তু এই সামান্য নৈবেদ্য ফিরিয়ে দিয়ো না। হাতের লেখায় নাম চিনে নিয়ো। ইতি—

সেইদিন চিঠির জবাবে বীরেশ তাকে জানিয়ে দিল, দান-পত্র গ্রহণ করলুম, তবে টাকার অভাব ইতিমধ্যেই আমার মিটেছিল। এই টাকায় তোমার নামে মন্দির গ'ড়ে তুলবো। তোমার খোঁজ আমি নেবো না, কিন্তু আমার সন্ধান তুমি পাবে। পূজারিণীই একদিন দেবী হয়ে ওঠে মন্ত্রের সাধনায়। ইতি—বীরেশ।

শীতের মাঝামাঝি কাছাকাছির পাড়ায় সামান্য একটু জমি সংগ্রহ ক'রে বীরেশ একটি ছোটোখাটো দোকান প্রতিষ্ঠা করলো। আড়তদারদের কাছ থেকে তামা ও পিতলের বাসন, তাঁতের কাপড়, বেতের জিনিসপত্র, মাটির খেলনা ইত্যাদি এনে জমা করলো। তারপর অনুশীলার পরিচয়-পত্র নিয়ে কলকাতায় অনুশীলার এক ব্যবসায়ী আত্মীয়ের সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ ক'রে দিল। তিনি বেশ কিছু কিছু মালপত্রের অর্ডার পাঠাতে লাগলেন। দোকান নিয়ে রজনী ব'সে গেল। এইটি তার বহুদিনের

আশা ও আকাঙ্খা। উভয়ের মধ্যে সর্ত হোলো এই, লাভ-লোকসানের আধাআধি দুজনে সমান অংশে ভাগ ক'রে নেবে।

আইন পড়া বিদ্যাটা এ গ্রামে বীরেশের কাজে লেগেছিল। অনিল সেন হাকিম হ'তে পারেন,—অনুশীলা একদিন হাসতে হাসতে বলছিল—কিন্তু আইনের কলাকৌশল সম্বন্ধে হয়ত তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ। অনিলবাবু হেসে বললেন, এ ত' মেয়েলি তর্ক। আমি ভালো আইনজ্ঞ না হ'তে পারি, কিন্তু হাকিম হিসেবে বীরেশবাবুর চেয়ে আমার খ্যাতি বেশি এই আমার সান্ত্বনা। অনুশীলা বললে, বীরেশ যে গ্রামের লোককে এত শত্রুতা সত্ত্বেও আয়ত্ত করতে পারছে এ কেবল ওর আইনবোধ আর যুক্তিবাদের ফলে।

বীরেশ বললে, তা নাও হ'তে পারে। ওদের কাছে আইন আর যুক্তির অবতারণা করার চেয়ে যদি একটা উদাহরণ অথবা মডেল দাঁড় করানো যায় তাহ'লে দেখছি কাজ হয় বেশি।

অনুশীলা বললে, কিন্তু মডেল আর উদাহরণ এতকাল ওদের সামনে কম ছিল না। ধান পাট বেচে টাকা হয়, কিন্তু ব্যবসায়ী সম্মেলনে ওরা কি বুঝতে চায়? কো-অপারেটিভ সোসাইটির মালিক যে ওরাই, একথা বুঝতে ওদের এক শতাব্দী লাগবে। ওরা জানে টাকায় সংসার চলে, জানে ধান সিদ্ধ করলে ভাত হয়, কিন্তু একথা কি জানে, টাকা মানে গভর্ণমেন্ট, ধান মানে শক্তি?

বীরেশ বললে, কিন্তু হৃদয়ের সংস্পর্শ যদি না থাকে, যুক্তি দিয়ে কতটুকু কাজ হয়?

অনিলবাবু বললেন, যুক্তি ত' গভর্ণমেন্টের তরফেও আছে, কিন্তু এত ন্যায় বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও এ দেশের গভর্ণমেন্ট জনপ্রিয় হ'তে পারলো না কেন?

অনুশীলা চ'টে উঠলো, গভর্ণমেন্ট একটা মহিলা-মজলিস্ নয়, যে

সেখানে কাজের চেয়ে হৃদয় নিয়ে বেশি কারবার। হৃদয়বত্তা থাকলেই নিরপেক্ষতার অভাব ঘটে। হাইকোর্টের যাঁরা জজ্, তাঁদের হৃদয় অপেক্ষা ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধির অনেক বেশি দরকার। হৃদয়ের কারবার অন্দরমহলে।

বীরেশ বললে, কিন্তু মিসেস সেন, এ ত' আদালত নয়, এ যে গ্রাম, —এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। নিরপেক্ষতা ভালো কিন্তু তার মধ্যে আত্মীয়তা নেই, সেই জন্য দূরে দূরে থাকতে হয়. কিন্তু আত্মীয়তা মানুষকে বুকে টেনে নেয়। যারা মিশনারী তারা যে মন্দ কথা বলে তা নয়—বরং বুদ্ধি আর যুক্তি তার প্রস্তাবকে মেনে নেয়, কিন্তু মিশনারীর আত্মীয় নেই, তাই সে পর, সে দূরের।

অনুশীলা সবিস্ময়ে বললে, এ সব কথা আপনি পেলেন কোথায়?

হাসি মুখে বীরেশ বললে, তার মানে?

অনুশীলা তার দুই চক্ষের বিদ্যুৎ-কটাক্ষ স্বামী আর বীরেশের উপর বুলিয়ে বললে, আপনার আচরণের সঙ্গে এসব কথাবার্তা ত মানায় না?

আমার আচরণ কি নিতান্তই পীড়াদায়ক?

অনিলবাবু বললেন, মুস্কিলে ফেললে, ভদ্রলোককে দেখলেই তুমি ক্ষেপিয়ে তুলতে চাও। উনি ত ঠিকই বলেছেন।

বীরেশের সেই প্রথম কালের সংকোচ আর জড়তা এখন আর নেই, আলাপ পরিচয় এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। সে বললে, অনিলবাবু, মেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই সামান্য, তাদের আমি বিশেষ জানিনে। জানিনে ব'লেই তাদের কথায় কিছু মনে করিনে।

অনুশীলার মুখখানা এই মন্তব্যে টক্‌টকে হয়ে উঠলো। কিন্তু সে মুখের হাসি মিলোতে দিল না। বললে, মেয়েদের তাচ্ছিল্য করেন, এই

ত'? সে ত' ফ্যাশন্! তবু ওরই মধ্যে কিছু পরিচয় থাকলে আপনি কি আর এতটা বে-হিসেবী হ'তেন?

আসুন অনিলবাবু, আমার আজকে বোর্ডের সভা আছে।

অনিলবাবুর সঙ্গে বীরেশ বেরিয়ে গেল, আর পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আহত হাকিমের স্ত্রী তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক হাসিটুকু কালির মতো সমস্ত মুখে মেখে দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলতে লাগলো।

এই নিষ্ফল ক্ষোভের চেহারা নতুন নয়। আঘাত ক'রে প্রতিঘাত সহ্য ক'রে যাওয়ায় অন্নপূর্ণার একটি তীব্র আনন্দ ছিল। এটা তার পক্ষে গোপনীয়। মেয়েরা পথ কেটে চলে পুরুষের অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতের রহস্য দিয়ে তারা নিজেদের গতিবিধি ঘিরে রাখে। প্রথম দিন থেকেই তার প্রচেষ্টা ছিল—কেমন ক'রে এই দুঃশীলকে করায়ত্ত করা যায়। এখানে জয়ের উল্লাসটা বড় কথা নয়, এখানে আবিষ্কারের আনন্দ ছিল। বীরেশকে ঘিরে একটা মহিমার মণ্ডল দেখা যায়, কিন্তু সেটা কি ধার করা চন্দ্রমণ্ডল? সেটা তার বিশেষ একটা নীতি, অথবা চরিত্র? এসব না জানতে পারলে অন্নপূর্ণার স্বস্তি নেই। যাকে কাছে পাওয়া যায়, তার নির্ভুল প্রকৃতি না জানতে পারার জন্য একটা অশ্রান্ত উদ্বেগ তাকে দিন দিন যেন উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলছে।

বোর্ডের সভায় সেদিন মাননীয় অতিথি স্বরূপ অনিলবাবু উপস্থিত ছিলেন। ছোটখাটো মহকুমা হলেও দেশী কারবারের কতগুলি কেন্দ্র আশপাশে থাকার জন্য এই গ্রামের প্রসিদ্ধি কম নয়। কিন্তু মাল আমদানি রপ্তানির সুবিধার জন্য পথ ঘাটের কোনো ভালো বন্দোবস্ত নেই। স্থানীয় বোর্ডের সভায় কয়েকটা প্রস্তাব ছিল। সভার যিনি সভাপতি তিনি হলেন দূর গ্রামান্তরের এক আখ-মাড়াই কলের একজন অংশীদার।

তাঁর দলবল সভায় ছিল। বীরেশের উপস্থিতি এবং বোর্ডের তালিকায় তার পক্ষে সভ্যতালিকা ভুক্ত হওয়া জীবনবাবু পছন্দ করেন নি। ছোকরার সম্বন্ধে তাঁর মনে গভীর আতঙ্ক ছিল।

সভার প্রারম্ভে হাকিমকে স্তুতিবাদ জানিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো হোল। হাকিম তার উত্তরে বললেন, গ্রামকে সংগঠন করা এবং তার উন্নতির জন্য একটি বিশেষ উৎসাহ এসেছে। যাঁরা এই কাজের ভার নিচ্ছেন তাঁরা এখানে নবাগত হলেও এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। তাঁদের কর্মধারায় আমরা দেখতে পেয়েছি আন্তরিক কল্যাণ-বুদ্ধি, এবং গঠনমূলক পরিকল্পনা-শক্তি। আপনাদের উৎসাহে এবং কার্যকরী সহায়তায় যদি এই কর্মীরা কার্যক্ষেত্রে সফল হন তবে দেশের সত্যকারের উন্নতি হবে।

সভায় বীরেশকে বক্তৃতা দিয়ে তার প্রস্তাব উপস্থিত করতে হোলো। সে বললে, কাজ করবেন গ্রামবাসীরা কারণ সর্বাঙ্গীন কল্যাণ তাঁদেরই, আমরা সাহায্য করতে পারলে সুখী হবো। কাজ করবার চেষ্টা এতদিন বাইরে থেকে এসেছে, বাইরের বুদ্ধিমান লোকেরা এসে দেশসেবার আদর্শ নিয়ে কাজ করতে চেয়েছে, কিন্তু তাতে ফল ফলতে পারে না। উন্নতির জন্যে যা কিছু কাজ করার দরকার, তার উদ্ভব হবে ভিতর থেকে, নীচের-তলা থেকে। যারা চাষা এবং শ্রমিক তাদের প্রথমে জানতে হবে, দেশের আর্থিক শক্তির উৎস তারাই,—তাদের হাতে উৎপাদিত লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য নিয়ে দেশের শ্রী আর গৌরব·····

সভাপতি ঘণ্টা বাজালেন। বললেন, এ সভা রাজনীতির আলোচনার জন্য নয়, এখানে গ্রামেরই কথা বলুন।

বীরেশ পুনরায় সুরু ক'রে বললে, গ্রামবাসীর জীবনের কথা বাদ দিয়ে গ্রাম নয়। এটা রাজনীতির আলোচনাক্ষেত্র নয় তা জানি, কিন্তু

জনসাধারণের অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির যেটুকু সম্পর্ক, সেটুকু আলোচনা করা অপরাধ নয়,—গ্রামের পক্ষ থেকে সভাপতি মহাশয়কে একথা জানাই। —শুনুন, যাদের উৎপাদিত ধন-সম্ভার নিয়ে দেশের গৌরব তাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া দরকার। ইব্রাহিমপুরের চিনির কল আপনারা অনেকেই জানেন। এই সব চিনির কলের যাঁরা মালিক তাঁদের হাতে চিনির দর, চিনির বাজার। তাদের একটা নিজস্ব চক্রান্ত আছে, যার জন্যে চিনির বাজারে উত্থান-পতন ঘটে। মালিকের যারা এজেন্ট তাঁরা নানা গ্রামে প্রচারকার্য করেন যাতে চাষীরা তাঁদের করতলগত থাকে। অনেক টাকা তাঁরা দাদন দেন। এই দাদন দেবার ব্যাপারে চাষীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এজেন্টদের একটা বোঝাপড়া আছে। অনেক সময়ে দরিদ্র চাষীরা সেই দাদন পরিশোধ করতে গিয়ে বিকি-কিনির ব্যাপারে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়,—আমাদের এই দেবীপুরের আশেপাশে তার করুণ চেহারা চোখে পড়ে। সঙ্ঘবদ্ধ চাষীদের পক্ষে এর প্রতিকার হওয়া দরকার। তারা যদি গরীব থাকে তবে মালিকদের পক্ষে অনেক সুবিধে। আমাদের এই গ্রামের সামান্য যে রাস্তাঘাট রয়েছে, তারই উপর দিয়ে চিনির কলে আখের বোঝা রপ্তানি হয়, সেই রাস্তাঘাটের কোনো সংস্কার নেই। সামনে নদী রয়েছে কিন্তু চাষীরা এই নদীর সাহায্যে মহাজনী কারবারের কোনো সুবিধা পায় না। গ্রামবাসীদের হাতে টাকা থাকে না, শস্য বিক্রির ব্যাপারে জমীদারের কাছে আর ঋণদাতাদের কাছে তাদের মাথা বিক্রি হয়ে রয়েছে,—এই সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। আমি প্রস্তাব করি, গ্রামের প্রাথমিক প্রয়োজনের জন্য এমন দু'তিনটি রাস্তা করার প্রয়োজন, যাতে এই গ্রামের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ সহজ হয়। জেলা কর্তৃপক্ষের সহযোগে সেই কার্য-পদ্ধতি প্রথমেই নির্দিষ্ট হওয়া দরকার। জেলা বোর্ডে আমাদের সেই প্ল্যান্ পেশ করতে হবে।

এই সভার পরে গ্রামে একটা গণ্ডগোল দেখা গেল। জীবনবাবু চিনির কলের কর্তৃপক্ষের কাছে বীরেশের দলের সম্পর্কে একটা গোপন বিবরণ দাখিল করলেন। কলের মালিকেরা তার ওপর মন্তব্য বসিয়ে জেলা হাকিমের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন, এই অঞ্চলের চাষীদের মধ্যে অসন্তোষ এবং অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য বীরেশ চৌধুরীর দল আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। কর্তৃপক্ষের চর সমস্ত দিকে নজর রাখতে লাগলেন।

কিন্তু সত্য ও সৎবৃত্তির একটা নিজস্ব পন্থা আছে, যেখানে নানা বিরোধের মধ্যেও সে নিজের পথ কেটে চলে। প্রতিদিন বাইরের দিক থেকে জানা গেল, এ গ্রামের যারা হোমরা চোমরা তাদের গোপন চক্রান্ত বীরেশদের কাজে সর্বপ্রকার বাধা জন্মানোর জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টায় স্বর্গ-মর্ত একাকার করছে, কিন্তু সেই অনুপাতেই অন্যদিকে যে সমবায় পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে বিভিন্ন গ্রামের চাষীর দল বীরেশের কাজে এগিয়ে আসতে লাগলো, তাতে তার অসামান্য প্রতিষ্ঠার সংবাদই এনে দিল। ফলে দেখা গেল, স্থানীয় বোর্ডের যারা এতকাল স্থায়ী সভ্য থেকে একটা চিরস্থায়ী স্বার্থ নিয়ে বসেছিল তারা আর আনুগত্য পায় না, তাদের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল। জলে, ঝড়ে, রোদে, শীতে—বীরেশ গ্রামে গ্রামে গিয়ে তার অসাধারণ বাক্‌শক্তি এবং মধুর-আচরণের গুণে জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। তার পরিশ্রম ব্যর্থ হোলো না, দশজন সভ্যসংখ্যার মধ্যে সাতটি পদ সে নিজের লোকের জন্য অধিকার করলো।

হাকিম সাহেব তাঁর তাস খেলার আড্ডায় এ কথা প্রচার ক'রে দিলেন, এবং অনুশীলা বীরেশ আর রজনীর সম্মানে আর একদিন চা পার্টির আয়োজন করলো।

৬

সমবায়ী দোকান জমিয়ে তুলতে পেরেছিল। খুচরো কারবার তার কম, কিন্তু পাইকারী আমদানি রপ্তানির জন্য মোটামুটি লাভের অঙ্কটা তার কম নয়। তাঁতের কাপড়, গামছা, বাসন-কোসন এবং বেতের জিনিসপত্র চালানি দিয়ে গত মাসেই তাদের দোকানে প্রায় তিনশো টাকা লাভ দাঁড়িয়েছে। যারা উৎপাদন করেছিল তারা খতিয়ে দেখলো—গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বিনিময় মূল্যে তারা ক্ষতিগ্রস্তই হয়ে এসেছে, এবার লভ্যাংশ অনেক বেশি; মধ্যস্থের পাওনা চুকিয়ে টাকায় প্রায় তিন আনা তারা পায়। এ সংবাদটা চারিদিকে যখন রটলো যে, চাষীদের ঘরে টাকা এনে দিয়েছে, তখন সমবায় ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রী করা সহজ হোলো। আড়ৎদাররা পাঁচ টাকার শেয়ার ছয় টাকায় কিনেই ক্ষান্ত হোলো না, অনেকে দশখানা শেয়ারও কিনে বসলো। ব্যাঙ্কে আমানতির পরিমাণ দেখে জীবনবাবুর দল ভীত হ'য়ে ওদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নানারূপ নিন্দা রটাতে লাগলেন। যদি এই প্রতিষ্ঠান ব্যাপক ও বিস্তৃত হয় তবে আখের চাষীরা এবং জমির মালিকরা বেহাত হ'তে পারে এই কারণে চিনির কলের মালিকরা আখের দাম বাড়ালেন এবং গুড়ের পরিমাণ কমিয়ে দিলেন। তাতে কাজ কিছু হলো বটে তবে সেই টাকার বাড়তি ভাগটুকু বেশি ডিভিডেণ্ড ঘোষণা ক'রে বীরেশরা টেনে নিল। কলের মালিকদের কানে সে-কথা উঠলো। তাঁরা ডিরেক্টর-বোর্ডের জরুরী অধিবেশন আহ্বান করলেন।

তাঁদের গোপন বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত করা হোলো সে আলোচনা নিষ্ফল, তবে কিছুদিনের মধ্যেই সমবায় ব্যাঙ্কের সর্বময় কর্তা বীরেশের কাছে এই প্রস্তাব এলো, গ্রামের চতুঃসীমায় এবং সমগ্র মহকুমায় জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি, পথঘাটের সংস্কার, জলাশয় ও কূপ খননের কাজ, কুটীর

শিল্পের বিস্তৃতি—ইত্যাদি ব্যাপারে তারা সমবায় ব্যাঙ্কের পচিশ হাজার টাকার শেয়ার কিনতে চান। প্রথম তিন বৎসর নিঃস্বার্থ কল্যাণ প্রেরণার প্রমাণস্বরূপ তাঁরা ডিভিডেণ্ডও চান না।

সমিতির সভা ডেকে বীরেশ এই প্রস্তাব পেশ ক'রে বললে, এই পচিশ হাজার টাকা যদি আজ আমরা গ্রহণ করি তবে গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি হয়, কারণ আমাদের হাতে বিস্তর কাজের জন্ম টাকা নেই। কিন্তু সমিতির গঠনতন্ত্রে আছে, পাঁচশো টাকার শেয়ার যিনি কিনবেন তিনি একজন ডিরেক্টর হ'তে পারেন। পচিশ হাজার টাকা যাঁরা দেবেন তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানকে সহজেই করতলগত করবেন। কিন্তু তাঁরা কে? তাঁরা ধনিক সম্প্রদায়, তাদের শোষণ নীতির সঙ্গে গ্রামবাসীদের সহযোগিতা নেই, তাঁদের শোষণের ধারা অব্যাহত রাখার জন্ম বিরূপ সম্প্রদায়কে আন্দোলনের পথ বন্ধ করতে হবে, তাই তাঁদের এই উদারতা। আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে এসে চাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে চাইছে, এইটিই তাঁদের পক্ষে ভয় ও ক্ষতির কারণ।

শেয়ার-হোল্ডারদের পক্ষ থেকে সেইদিনই বীরেশ উত্তর লিখে পাঠালো, "আপনাদের সহৃদয় প্রস্তাবের জন্ম ধন্তবাদ। সমবায় সমিতি টাকা গ্রহণ ক'রে আপনাদিগকে সুদ দিবার জন্ম প্রস্তুত। কিন্তু আপনারা যদি শেয়ার কেনেন তবে তাহা নূতন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কিনিতে হইবে। আমাদের সমিতির পরবর্তী অধিবেশনে এইরূপ একটি প্রস্তাব আসিবার সম্ভাবনা আছে যে, বর্তমানে যাঁহারা ডিরেক্টর এবং চেয়ারম্যান আছেন, তাঁহাদের কার্যকাল দশ বৎসরের অধিক স্থায়ী হইবে না এবং বর্তমান শেয়ার-হোল্ডারদের ভোট লইয়া উক্ত ডিরেক্টর-গণকে মনোনীত করিতে হইবে। ডিরেক্টরগণ চেয়ারম্যানকে মনোনীত করিবেন।"

এর পরে একটি কঠিন সংগ্রামে বীরেনকে অবতীর্ণ হ'তে হোলো। তাদের সমবায় সমিতির পরবর্তী অধিবেশনে পূর্বোক্ত প্রস্তাবটি সহজে পাশ হয়ে গেল। জীবনবাবু গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে চিনির মালিকদের নিঃস্বার্থ সেবা ও আদর্শের বাণী প্রচার করা সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে পারলো না। এই গ্রাম এতকাল ধ'রে অসাড় ও জীবনীশক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, প্রাণ স্পন্দন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি, আজ নতুন মানুষদের আবির্ভাবের সঙ্গে নতুন জোয়ার এসে সমস্ত গ্রাম প্লাবিত করেছে, তাদের বহুকালের সঞ্চিত তৃষ্ণার জল এখন প্রাণীন পদার্থে পরিপূর্ণ।

কিন্তু এর পরে যে-সংগ্রাম সুরু হোলো এ গ্রামে, তার চেহারা অসাধারণ। বর্তমানে তাদের সমবায় সমিতির বিস্তৃতি কম নয়। জেলা কর্তৃপক্ষ তাঁদের গোপন রিপোর্ট দাখিল ক'রে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে জানিয়েছেন, এর ভিতরে যদি রাজনীতিক রহস্য কিছু না থাকে তবেই এই প্রতিষ্ঠান এই জেলার পক্ষে একদা গৌরবের বস্তু হয়ে উঠতে পারবে। কর্তৃপক্ষের এই রিপোর্ট দাখিল করার সংবাদ বীরেশ তার লোক মারফৎ জানতে পেরেছিল, সুতরাং তার দিক থেকেও সতর্কতার অন্ত ছিল না। অনিল সেন এবং তাঁর সহকারি সহকর্মীদের কাছে ছিল বীরেশের নিত্য আনাগোনা। দেবীপুরের থানায় গিয়ে দারোগা ও জমাদারকে সে সমবায় সমিতির সভ্য করেছে, ডাকঘরে ডাকবাবু এবং দূরে ষ্টেশনের মাস্টারমশাই কেউই তার হাত থেকে রেহাই পান নি। সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে সে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে জানিয়ে এসেছে, যদি আগামী মাসে আপনি অন্তত দশটি শেয়ার না কেনেন তবে আপনার নামে টাকা জমা দিয়ে আমিই কিনতে বাধ্য হবো। ম্যাজিস্ট্রেট তার প্রস্পেক্টস ও কার্যপদ্ধতি দেখে সানন্দে দশখানা শেয়ার কিনেছেন।

রজনী এক্ষেত্রে নির্বিরোধী। ব্যবসায় উন্নতির দিক ছাড়া আর কোনদিকে তার তেমন আগ্রহ নেই। সে মাল বিক্রি বোঝে, আমদানি রপ্তানির সূক্ষ্ম কলাকৌশল তার আয়ত্তের মধ্যে। বীরেশের সব কাজেই তার সায় আছে, কিন্তু নিজে দোকান ছেড়ে সে যদি প্রচারকার্যে যায়, তবে তাদের ব্যবসা এবং অর্থের উৎস শুকিয়ে যেতে পারে। তা'ছাড়া রজনীর উচ্চাভিলাষের একটা সীমানা আছে। সে চোখ রেখেছে ভাগ্যের উন্নতির দিকে, যেমন ক'রেই হোক, যে কোনো জায়গায় নতি স্বীকার ক'রে, তোষকতা ক'রে নির্বিঘ্নে ন্যায় ও ধর্মের পথে অর্থের মালিক হয়ে উঠতে। তার মনের কাঁটা সেই দিকেই নির্দিষ্ট আছে যেদিক দিয়ে ভাগ্য ফিরিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে কল্‌কাতায় গিয়ে বসবে। সে হিসাবী ও বিষয়ী।

দোকানে ব'সে সে একদিন বললে, সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছিস ?

বীরেশ বললে, পাচ্ছি। পর্বতপ্রমাণ একটা ঢেউ।

কতদিন দেশ ছাড়া হয়েছি মনে আছে ?

হ্যাঁ রে, প্রায় তিন বছর।

রজনী বললে, কে জানে আবার তিন বছর পরে একটা দুর্দিনের ছায়া হয়ত নেমে এসেছে !

কেন ?—বীরেশ বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললে, তোর এ কথার মানে কি ?

চিন্তিত কণ্ঠে রজনী বললে, চিনির মালিকদের সঙ্গে কি আমরা পেরে উঠবো ? তাদের লাখ লাখ টাকা, তারা ঘুষ দিয়ে তোমার ডিরেক্টরদের তিন পুরুষকে কিনে ফেলবে। শুনছি জেলার হাকিম আর পুলিশের লোক তাদের দলে, গ্রামের লোক কি তাদের চটাবে ?

বীরেশ প্রশ্ন করলো, তুই কি বলতে চাস্ ?

আমি বলি এ যুদ্ধে কাজ নেই, জীবনবাবুদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করো।

কিন্তু এর মানে জানিস্? সন্ধি করার অর্থ ওদের করতলগত হওয়া, ওদের সর্বাঙ্গীন অধিকারকে স্বীকার ক'রে নেওয়া।

রজনী বললে, তা'তে আমাদের ক্ষতি কি? আমাদের কারবার এখন জ'মে উঠেছে।

বীরেশ চুপ করে রইলো। তারপর বললে, এই সিদ্ধান্তের ফল আমাদের নৈতিক অবনতি। যদি সমবায় সমিতিতে ওদের অধিকার কায়েমি হয়, ব্যাঙ্কও ওদের হাতে গিয়ে পড়বে,—তখন গ্রামের লোক আর বাধা দিতে পারবে না। গ্রামের জনসাধারণ আমাদের বিশ্বাস ক'রে উঁচু আসনে বসিয়েছে, কিন্তু আমাদের এই চিত্তদৌর্বল্য প্রকাশ পেলে এতদিনের সমস্ত চেষ্টা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়বে। চিনিওয়ালাদের খেয়ালে আমাদের চলতে হবে।

রজনী চিন্তিত মনে চুপ ক'রে রইলো। বীরেশ বলতে লাগলো, লাখ লাখ টাকা যাদের আছে তারা ঘুষ খাইয়ে এক আধবার কাজ হাসিল করতে পারে, কিন্তু টাকায় মানুষকে জয় করা যায় না—

কিন্তু টাকায় শাসন করা যায়।

যায়, কিন্তু চিরকাল নয়। যত বড় শক্তিই হোক, মানুষের শুভেচ্ছা তার চাইই,—এটা রাজনীতির প্রথম পাঠ। চিনির মালিকদের গোড়াকার কথা তাদের স্বার্থ, লোক কল্যাণ নয়। টাকার শক্তি বাইরের, সেই কারণে সে ঘুষ খাইয়ে চলে, কিন্তু মানুষের পথ দিয়ে যে শক্তি আহরণ করা যায়, সে বার বার হয়ত হারে, কিন্তু চিরকালই সে নিজেকে জেগে উঠে দাঁড়ায়।—বীরেশ তার স্বভাব-উত্তেজনায় বলতে

লাগলো, এ যুদ্ধে আমাদের নামতেই হবে রজনী, এতে আমাদের সম্মান, দেশের সম্মান, আবহমান কালের গণতান্ত্রিক সর্বসাধারণের সম্মান— সমস্ত জড়িত। চেষ্টা ক'রে তিন বছর এগিয়ে এসেছি, বহুদিন নিদ্রাশ্রম আর উপবাসের মধ্যে ভবিষ্যতের উপাদান সংগ্রহ করেছি, এই যুদ্ধেই আমাদের বড় পরীক্ষা।

রজনী বললে, কিন্তু যদি হেরে যাই ?

বীরেশ বললে, হারলে আমাদের চলবে না, সেজন্য একথা ভাববোও না। একদিকে শক্তিকে প্রকাশ করবো, অন্যদিকে করতলগত করবো ক্ষমতা। ক্ষমতার জন্য আমাদের অন্ধ হ'তে হবে, নিষ্ঠুর হ'তে হবে, ক্ষমতার জন্যে বিরোধীদলকে ধ্বংস করতে হলেও পিছপা' হবো না।

এর মানে কি বীরেশ ?

এর মানে এই—আমরা আদর্শবাদী। লোক-কল্যাণ, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য আর অর্থের উন্নতি, সকলের সমান অধিকার, ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা, শোষণের হাত থেকে গরীবকে বাঁচানো,—এই আমাদের মানে।···বীরেশ অসীম উৎসাহে বলতে লাগলো, শহরকে এনে প্রতিষ্ঠা করবো এই গ্রামে, আনবো উদার চরিত্রের সভ্যতা, আনবো পৃথিবীর সংস্কৃতি, আনবো বিজ্ঞানের দিগ্বিজয়ী উপাদান। কিন্তু তার আগে ? তার আগে ভিক্ষা নয়, সন্ধি নয়, আবেদনও নয়,—কঠিন, নির্মম ক্ষমতা, সেই দয়াহীন অজস্র ক্ষমতা নিষ্ঠুর হয়ে মানুষের সকল ভালো কাজে প্রয়োগ করতে হবে। চারিদিকের তামসিক জড়ত্বকে চূর্ণ করতে হবে দেবতাদের সকল স্নেহহীন মারণাস্ত্র দিয়ে। ক্ষমতাকে আমি চাই হাতের মুঠোর মধ্যে, শক্তিকে স্তূপাকার করতে চাই বারুদের মতন······

বীরেশের চোখ দুটো রাঙা হয়ে দপ দপ, করতে লাগলো।

রজনী সবিনয়ে বললে, এটা তোর নেশা, বীরেশ।

বীরেশ বললে, প্রার্থনা করি এই নেশায় যেন অন্ধ হই। এই নেশায় গ্রামকে যেন অভিভূত করতে পারি। এই নেশায় মত্ত হয়ে তারা যেন সব ভালো কাজের দিকে ক্ষিপ্র ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়। তুই দোকান নিয়ে ব'সে থাক্, আমাকে ছেড়ে দে। এই দ্বন্দ্বে সমস্ত জেলাকে আলোড়িত ক'রে তুলবো।—এই ব'লে সে বেরিয়ে চ'লে গেল।

সমিতির পক্ষ থেকে তিন সপ্তাহ পরে একটি নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা হোলো, সেই তারিখে শেয়ার-হোল্ডাররা ভোট দিয়ে ডিরেক্টরগণকে নির্বাচিত করবেন। যাঁরা নতুন ডিরেক্টর হ'তে চান তাঁরা যথাসময়ে টাকা জমা দিয়ে নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেন। সমিতির ব্যাঙ্কে বহু টাকা জমা পড়লো, এবং নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেল, চিনির মালিকরা তাঁদের ভাগ্য পরীক্ষায় এই টাকা অক্লেশে খরচ করছেন। বীরেশ একটা ভোটারদের তালিকা প্রস্তুত ক'রে দেখলো সমিতির শেয়ার-হোল্ডারদের সংখ্যা প্রায় তেরো শত। জীবনবাবুর লোক ইতিমধ্যেই মহকুমার গ্রামে গ্রামে প্রচারকার্যে বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁদের দৈনিক ভাতা অজস্র পরিমাণে দেওয়া হয়েছে। তারা আগে থাকতেই নৌকা ও গোরুর গাড়ীগুলি রিজার্ভ ক'রে রেখেছে যাতে বীরেশের দল সেগুলি ব্যবহার করতে না পারে।

অহল্যা একদিন প্রশ্ন করলো, ওদের বক্তব্যটা কি?

বীরেশ বললে, ওরা এই কথা বলছে, চিনির কল দেশীয় শিল্প। দেশের টাকা, দেশের মজুরী। এর উন্নতি মানেই জেলার উন্নতি, চাষীদের উন্নতি; এর মালিকরা সকলেই দেশের বরেণ্য জাতীয় নেতা।

আপনাদের বিরুদ্ধে কি বলছে ?

বলছে, আমরা ভুঁইফোড়, জাতিগোত্রহীন। সরকারী মহলে আমাদের আনাগোনা, পুলিশ আর হাকিমের দল আমাদের টাকা আত্মসাৎ ক'রে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে চালান দিচ্ছে। আমরা জাতিদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের দল। আর যারা মুসলমান গ্রামবাসী, তাদের কাছে বলছে, আমরা হিন্দুসভার লোক, আমরা মুসলমানদের সর্বনাশ ক'রে তাদের ওপর উৎপীড়ন করবার চেষ্টা করছি। মুসলমান চাষীরা যে টাকা নিয়মিত দাদন পায়, আমরা সেটা বন্ধ ক'রে তাদের শুকিয়ে মারবার চেষ্টায় আছি। ওরা কল্‌কাতা থেকে কয়েকজন মৌলভীকে আনিয়েছে।

কিন্তু জীবনবাবু ত' আর মুসলমান নন।

তিনি হিন্দুও নন্।

অরুণীলা হেসে বললে, তার মানে ?

বীরেশ বললে, যারা ধনতান্ত্রিক তারা বিপজ্জনক ব্যক্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের যারা এজেণ্ট তারা ভয়ঙ্কর জীব, তারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, তাদের কোনো জাত নেই, তারা শুধু এজেণ্ট। পৃথিবীতে প্রকাণ্ড যাদের কারবার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান যারা চালায়—তারা কেবল চেক সই করে আর বক্তৃতা দেয় আর ফূর্তি করে, কিন্তু এই সর্বনেশে এজেণ্টরাই ধনীদের কারবার চালায়, ম্যানেজারি করে, ডিরেক্টর হয়, শোষণ আর উৎপীড়ন করে, মনুষ্যত্বের সকল বিধানের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তাদের পায়ে থেঁৎলায় যারা জীবিকার জন্যে এদের অধীনে কাজ করতে বাধ্য হয়। জীবনবাবু সেই দলের একটি সরীসৃপ।

অরুণীলা বললে, এ অবস্থায় আমাদের এখন কর্তব্য কি ?

বীরেশ বললে, সরল সত্য আর কল্যাণের আদর্শ প্রচার ক'রে আমরা গ্রামবাসীকে জয় করতে চাই।

কিন্তু এ যে নির্বাচনের ব্যাপার, এখানে যে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলাই উচিৎ।

উচিৎ নয়, মিসেস্ সেন। মিথ্যা দিয়ে মিথ্যাকে উচ্ছেদ করব না, সত্যের অন্তর্নিহিত তেজ অসীম;—তাকে বরং নির্মমভাবে প্রয়োগ করতে রাজি আছি। দুই মিথ্যার দ্বন্দ্বে একজন জিতবেই, কিন্তু দেশবাসী বিজয়ী আর পরাজিতকে সমানভাবে ঘৃণা করবে, নির্বাচন দ্বন্দ্বের এইটিই বড় শিক্ষা। আজ গণতন্ত্রের আদর্শ মার খাচ্ছে ধনীদেরই চক্রান্তে, কারণ তারা জনসাধারণের ভিতরকার পাশব শক্তিকে খুঁচিয়ে বীভৎস ক'রে তুলতে চায় এই ভোট আর ইলেকশন নিয়ে। জোচ্চুরি, ঘুষ, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, গণিকাবৃত্তি—এরাই হোলো ধনতন্ত্রের ভিত্তি, এই প্রবৃত্তিগুলোই জনসেবার ছদ্মবেশ ধ'রে বড় বড় শ্লোগান্ নিয়ে ইলেক্‌শনে নামে, সরল হৃদয় জনসাধারণ লুব্ধ হ'য়ে এর অপেক্ষাও বীভৎস দুর্নীতির 'বোগি' নিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করে। পাপের একটা নিজস্ব সৃষ্টি-শক্তি আমরা দেখি, সে হচ্ছে তার আত্মস্ফীতি,—পুণ্যবানকেও সে রক্তপান করায়, তাকে হিংস্র আর অমানুষ ক'রে তোলে। কিন্তু গণতন্ত্রের আদর্শ ত' তা নয়, সে নিজের সত্যে উজ্জ্বল, নিজের পুণ্যে সে সক্রিয়। সকল মানুষকে সমান অধিকার দেওয়া, সকল মানুষকে সমানভাবে আহার দেওয়া আর প্রতিপালন করা, এটা ত' গণতন্ত্রের সস্তা বুলি, এ বুলি অনুযায়ী ধনিকতন্ত্রও চলে—তার বহু প্রমাণ আছে; কিন্তু গণতন্ত্রের কথা তা নয়, তারা বলে, সকল মানুষকে সমান অধিকার দেওয়ার চেয়েও বড় জিনিস দেবো, সকল মানুষকেই বড় ক'রে তুলবো, তারা পৃথিবীর সকল ভালো কাজের

উপযোগী মহৎ হয়ে উঠতে পারে—এমনভাবে প্রতিপাদন করব। তাই যে দেশেই গণতন্ত্র উঠে দাঁড়াতে চায়, ওরা বলে এনার্কিজম, আপরাইজিং, মিউটিনি, ডিসওবিডিয়েন্স,—ওরা ল এণ্ড অর্ডারের ঢাল-তলোয়াল নিয়ে ছুটে আসে। কারণ যে রাজত্বে ওদের বাস করা অভ্যাস সেখানে গণতন্ত্রের এই মহৎ আদর্শ নেই, তাই গণদেবতার এই আবির্ভাবকে ওরা নাম দিয়েছে অরাজকতা।

অনিলবাবু বললেন, কিন্তু এই সব কথা প্রচার করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, মিস্টার চৌধুরী।

বীরেশ হেসে বললে, তা জানি, সাম্যবাদ আমি প্রচার করছিনে, আপনাদের চর আছে আশে পাশে। তাছাড়া এসব গ্রামের লোককে অল্প সময়ে বোঝানও যাবে না।

হাকিম বললেন, কিন্তু আপনার এই সরল সত্য আর কল্যাণের আদর্শ কি ভাবে প্রচার করবেন?

অতসীলা জবাব দিল, তুমি ত দেখছ উনি কত কাজ একসঙ্গে আরম্ভ করেছেন—স্কুল, লাইব্রেরী, টাউনহল, রেডিও, সিনেমা, ব্যাঙ্ক—এতগুলো স্কীম উনি প্রস্তুত করেছেন,—এ গাঁয়ে এগুলো ত কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। এই সব নিয়ে উনি প্রচারকার্যে নামবেন।

অনিলবাবু বললেন, ক্যাপিটালিস্টদের কথা ত' তুমি জানো। তারা স্বার্থরক্ষার জন্যে তিন মাসের মধ্যে এগুলো তৈরি ক'রে দিতে প্রস্তুত, অথচ উর এগুলো একে একে শেষ করতে পাঁচ বছর লাগবে, গ্রামবাসী কাদের বেশি বিশ্বাস করবে বলো দেখি?

অতসীলা উদভ্রান্ত হয়ে বীরেশের দিকে তাকালো। বীরেশ বললে, তার জন্যে ভয় নেই। একটার প্রতিষ্ঠা ব্যবসায়ীর স্বার্থের ওপর, অন্যটার প্রতিষ্ঠা দেশসেবার আদর্শে—এইটেই সবাইকে বুঝিয়ে দেব।

আমাদের গতি দ্রুত নয়, মৃদু—কিন্তু দৃঢ়। ওরা সাধারণ প্রতিষ্ঠান খাড়া করবে বাইরে থেকে ওপর দিয়ে এসে, আর আমাদের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান দেশের হৃদয়ের পথ দিয়ে সহজে আত্মপ্রকাশ করবে। সার্কাস পার্টি বাইরে থেকে জমি ভাড়া ক'রে আমোদ বিলোয়, ম্যাজিক দেখায়—কিন্তু তাদের হুল্লোড়ে আনন্দ নেই, মাধুর্য নেই। আমাদের এক একটি প্রতিষ্ঠান হবে গ্রামবাসীর শুভ ইচ্ছা আর বুদ্ধির স্বরূপ, মায়ের সঙ্গে যেমন সন্তানের সম্পর্ক তেমনি প্রতি প্রতিষ্ঠানের স্নায়ুতন্ত্রের যোগ থাকবে গ্রামের নাড়ীর সঙ্গে। আমরা সবাইকে চীৎকার ক'রে পথের ধারে ডেকে কাঙালী ভোজন করাবো না, সবাইকে অভ্যর্থনা ক'রে ডেকে বন্ধুর মতন ঘরে তুলবো।……

আদর্শবাদীর উজ্জ্বল মুখের আভায় অরুণীলা মুগ্ধ হয়ে কতক্ষণ কী দেখছিল সেই জানে। ফস্ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো, আমি যাবো।

হাকিম বললেন, কোথায় যাবে তুমি?

আমি বীরেশবাবুদের প্রচারকার্যে যাবো গ্রামে গ্রামে।

কিন্তু তুমি যে হাকিমের স্ত্রী?

অরুণীলা সুন্দর হাসি হাসলো। বললে, মায়ের সেবায় যাবো, স্বামী-মশাই কি বাধা দেবেন?

বীরেশ বললে, আপনার এই উৎসাহই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু একাজ আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, মিসেস্ সেন। চৈত্রমাসের রোদ, জল জলাশয় শুকিয়ে গেছে, গোরুর গাড়ীতে সারাদিন থাকা, আহার আশ্রয় অনিশ্চিত,—আপনি বরং—

পরীক্ষা করছেন, কেমন? কিন্তু হাকিমের হুকুম যেমন নড়ে না, হাকিমের স্ত্রীর সিদ্ধান্তও তেমনি অটল। সরকার মশাই আর পাইকরা আমার সঙ্গে থাকবে।

অনিলবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, তোমার যাওয়ার অর্থ জানো, আমার সামাজিক অবস্থাটা কল্পনা করতে পারো ?

পারি—অনুশীলা বললে, মফঃস্বলের হাকিমের স্ত্রীরা অদ্ভুত জীব। স্বামীর বেতনের ওপর তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, গোপনে নতুন নতুন শাড়ীর অর্ডার পাঠানো, অনধিকার রাজনীতি-চর্চা, দম্ভে আর 'স্নবারিতে' রোমাঞ্চ হয়ে স্কুলে হাকিম অথবা বড় চাকুরেদের স্ত্রীর সঙ্গে উঁচুস্বরে কথা ব'লে তাদের ধন্য করা। ওসব ত দেখলুম গো, আর কেন ? "নেটিভ গ্রামের রাস্তা ঘাট নেই, তাই আমাদের মোটর কেনা হচ্ছে না, উনি ভীষণ সেন্‌সিটিভ, আমার ব্লাড-প্রেসার এত হাই, উইমেন্স জার্নালগুলোয় আজকাল ভারি বাজে লেখা বেরোয়, টেগোরের লেটেষ্ট বই—" এসব নিয়ে ত অনেক আদিখ্যেতা করা গেল, এবার 'মাস'-এর সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় হলে মন্দ কি ? আমি যাবো, তুমি ব্যবস্থা ক'রে দাও। ওরা হয়ত তোমার আড়ালে একটু বলবে, এটা হাকিমের বউয়ের একটা ভাল্‌গার মুড্‌—কিন্তু তা'তে অনেক কাজ হবে।

অনিলবাবু মুখের হাসি টিপে বললেন, কি কাজ হবে শুনি ?

অনুশীলা বললে, দেশের লোককে চেনো না ? তারা কলিযুগের শেষ কল্পনা ক'রে বলবে, গাঁয়ে রণরঙ্গিণীর আবির্ভাব হয়েছে, মা মা—রক্ষা করো—ব'লে তারা লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না'ক তুমি !"

অনিলবাবু আর বীরেশ দুজনেই হেসে উঠলো।

সেইদিনই সকলের নিষেধ অমান্য ক'রে অনুশীলা যাবার জন্য প্রস্তুত হোলো। হাকিমের স্ত্রীর সম্বন্ধে শঙ্কা আছে, সুতরাং লোকের গাড়ী আর নৌকার অভাব হলো না। দেবীপুরের চারিদিকে এই সংবাদ রটে গেল। দপ-দামামার শব্দে সমগ্র জেলা মুখর হয়ে উঠলো।

ছয়

একমাস পরে আবার ধীরে ধীরে যবনিকা উঠলো।

শেষ বসন্তকালের আতপ্ত বাতাস মধ্যাহ্নের প্রান্তরের উপর দিয়ে বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ নিশ্বাস ফেলে চলেছে। আকাশ পাণ্ডুর ধূসর, মেঘের চিহ্ন কোথাও নেই। ঝড়ের পরে সমস্তটাই যেন অবসন্ন, কেবল চারিদিকে তার ছিন্ন চূর্ণ ভগ্ন খণ্ডগুলি বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

খোলা জানালার বাইরে চেয়ে একান্ত শ্রান্ত মনে বীরেশ নীরবে বসেছিল। তাদের এই বাড়ী গ্রামের একেবারে প্রান্তে, দূরের কাছারির সাড়াশব্দ স্তিমিত হয়ে এত দূরে আসে। এদিকের খবর নেবার প্রয়োজন কারো নেই। এ বাড়ীটা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ভূতপূর্ব সমবায় সমিতি গোটা চারেক মাটির ঘর তৈরী করে; খড়ের খুঁটি আর খড় ছাড়া এ বাড়ীর আর কোনো মূলধন নেই। নির্মাণের মজুরি শোধ করার আগেই সমিতি ইহলীলা সম্বরণ করে, মজুররা এসে এর দরজা, জানালা, কাঠের মাচা ইত্যাদি খুলে নিয়ে পালায়। এমনি অবস্থায় একদিন হাকিমের আগ্রহ ও উৎসাহে বীরেশরা এখানে আশ্রয় পায়। সে সব অনেক দিনের কথা হ'লো বৈ কি।

আজকে নতুন ক'রে এই গ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা একবার জেনে নেওয়া দরকার। প্রথম থেকে তার উৎসাহ ছিল, আন্তরিকতা ছিল, কিন্তু কূটনীতিকে সে মূলনীতি ব'লে স্বীকার করতে পারেনি। বৃহৎ জনতাকে যারা আয়ত্ত করে তারা যে কেবল আদর্শবাদী তাই নয়, তারা বৈষয়িক চক্রান্তকে আদর্শের ভিত্তি ক'রে তোলে। পৃথিবীতে

সকল আদর্শবাদ-ই মার খায়, কারণ তাদের বাস্তব ভিত্তি পাকা নয়। আদর্শবাদ হোলো আকাশ-প্রদীপ, সে স্বপ্নপ্রয়াণ; কল্পনাকে সে অতখানি মনোহর করে বলেই অতখানি ফাঁকা। বারে বারে মন ভোলাতে চায় ব'লেই মিথ্যার ফাঁকিতে সে ভরা। ক্ষমতা বাইরে থেকে আসে না, করুণা ক'রে কেউ আরোপ করে না—ক্ষমতার উদ্ভব হয় ভিতর থেকে, নিচের থেকে।

ঝড় একটা তাদের জীবনের উপর দিয়ে ব'য়ে গেল! কিন্তু তাদের প্রকাণ্ড পরিকল্পনা এবং কর্মসূচীর মধ্যে যেন কোথায় একটা ভুল থেকে গেছে। অঙ্গনা অতখানি বুদ্ধিমতী কিন্তু এ-ভুল সেও আবিষ্কার করতে পারেনি। অথচ নারীর অত্যাশ্চর্য উৎসাহ সে প্রকাশ করেছে বিশদভাবে। সে হাকিমের স্ত্রী, তার সামাজিক সম্মান, এই গ্রামে তার প্রতিপত্তি—সমস্তই বিপন্ন করে সে বেরিয়ে পড়েছিল। ভুল সে করেনি, আকস্মিক উচ্ছ্বাসের উন্মাদনে সে গ্রামের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েনি, ফাঁকা আদর্শের চোরাবালির উপর প্রাসাদ নির্মাণ করতে সে ছোটেনি—কিন্তু তাদের দলের মূল কর্মনীতির ভিতরে যে ত্রুটি ছিল, ভাবপ্রবণতার মোহাঞ্জন তাদের চোখে না থাকলে সেই ত্রুটি তারা অপসারিত করতে পারতো। সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ কূটকৌশল অবলম্বন ক'রেছিলেন অসত্য আর অন্যায়কে বিনাশ করার জন্য। লোক-কল্যাণের মহৎ স্বপ্নে একদিকে তিনি ছিলেন যেমন আদর্শবাদী, কূটচক্রান্ত-জাল বিস্তার ক'রে শত্রুকে বিনষ্ট করতেও তিনি তেমনি ছিলেন ঘোর বাস্তববাদী। অথচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নাম হোলো ধর্মযুদ্ধ। যুদ্ধের ব্যাপারে ধর্ম এবং ন্যায়পরতা পাণ্ডবগণের পক্ষে না থাকা সত্বেও ধর্মযুদ্ধ নাম দিয়ে এটা চলে গেল! উদ্দেশ্য মহৎ এবং হিতকর হ'লে মিথ্যার সাহায্যে মিথ্যাকে নষ্ট করা

অন্যায় নয়। বড় রাজনীতির মূলমন্ত্রই এখানে। কিন্তু সততা আর স্যায়পরতার দম্ভ ছিল বীরেশের মনে, চারিদিকের মিথ্যা এবং সংশয়ে রুদ্ধশ্বাস হওয়ার ফলে তার এই অভিযানকে সে নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রাচীনকালে তপোবনে ধ্যানাসনে ব'সে থাকতেন মুনি, তাঁর আসনের চারিদিকে প্রেত-পিশাচ আর রাক্ষসের তাণ্ডবলীলা চলতো। কিন্তু মুনির সত্য তপস্যায় এক সময়ে বশীভূত হয়ে তারা হয় আত্মসমর্পণ করতো, নচেৎ পালিয়ে যেতো প্রাণভয়ে। বীরেশ মনে করেছিল, নির্মল সততায় সে চারিদিকের দৈন্য, সংশয়, কলহ, ইতরতা আর স্বার্থপরতাকে পরাজিত ক'রে সার্থক হবে।

অনুশীলার কথাটা সে ভোলেনি। অনুশীলা আগে থেকেই বলেছিল,—সে কি বীরেশবাবু, এ যে নির্বাচনের ব্যাপার, এখানে যে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলাই উচিৎ। কথাটা সামান্য, কিন্তু এই সামান্য কথাটাই তার পিছনে গত একমাস কাল যেন নিয়তির মতো ধাওয়া করেছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে সে জানে। সেও একজন আইনজ্ঞ, কূটকৌশল প্রয়োগে সেও কারো অপেক্ষা কম নয়। কিন্তু তবু, অনুশোচনা তার নেই। নির্বাচনের কুৎসিত কোলাহলের মধ্যে বিজয়ী আর পরাজিত সমানভাবেই ঘৃণিত, তবু এরই মধ্যে সান্ত্বনা রইলো, তাদের অভিযানের পথে কলঙ্কের দাগ নেই। তারা পরাজিত হয়েছে বটে কিন্তু নিজের কাছে তারা ছোট হয়নি।

আজ দুপুরে তার কিছু হিসাব পত্রের কাজ ছিল। একটি সপ্তাহ সে আর ঘর থেকে বেরোয়নি। জনসাধারণের কাছে যে প্রতিষ্ঠা সে গত তিন বৎসরে অর্জন করেছিল, এই নির্বাচনের পরাজয়ে সেটুকু তার ধূলিসাৎ হয়েছে। দশজন প্রার্থীর মধ্যে ছয়টি আসন তার হাতছাড়া হয়েছে, মাত্র

চাবিটি তার দখলে। তার দলের সংখ্যা কম, এবং এই চার জনের মধ্যেও কেউ কেউ তার হাতছাড়া হ'তে পারে এমন আশঙ্কাও আছে। হিসাব নিকাশের কাগজপত্র ওলটাতেও সে শঙ্কিত হচ্ছে। সমবায় সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ ক'রে সে নির্বাচনের খরচ জুগিয়ে এসেছে, তাদের দোকানের সংরক্ষিত তহবিলেও ঘাটতি পড়েছে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ নির্বাচনের পরাজয়ের পর দেখা যাচ্ছে তাদের মাথার উপর প্রকাণ্ড ঋণভার; এবং এই দেনাশোধ না করলে তহবিল তছরূপের দায়ে তাকে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হতে হবে। টাকার পরিমাণ অনেক। এই টাকার সংস্থান তার কোথাও নেই। বীরেশ মনে মনে দিশাহারা ও ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

এমন সময় রজনী এসে ঘরে ঢুকলো। চোখে মুখে তার অতিশয় ক্লান্তি আর অবসাদ, তার ভাবভঙ্গীতে বিশেষ বিরক্তি। ঘরে ঢুকে জামাটা কোনোমতে খুলে সে তার ক্যাম্বিশের ফিতাবাঁধা খাটে শুয়ে পড়লো। বললে, উঃ কী রোদ, সব জ্ব'লে পুড়ে গেল। আর ভালো লাগে না।

বীরেশ কথার জবাব দিল না। নির্বাচনে হেরে যাবার পর এক সপ্তাহ রজনীর সঙ্গে তার কথাবার্তাই হয়নি। রজনী বলেছিল, এ দ্বন্দ্বে নেমে কাজ নেই। আমরা ব্যবসাটা জমাট ক'রে তুলি। আগে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হোক, টাকা পয়সা জমুক। টাকায় পৃথিবী কেনা যায়, এ ত' সামান্য ইলেক্‌সন!—তার কথা ফলেছে। কেবল হার হয়নি, দোকানও ডুবতে বসেছে। পাওনাদারদের কিস্তি শোধ করা যায়নি, তারা মালপত্র দেওয়া বন্ধ করেছে। টাকার সংস্থান আর কোথাও নেই। এতদিন সংগ্রাম করে যে ব্যবসাটি দাঁড় করানো গিয়েছিল, যার উপর ভিত্তি ক'রে তাদের আশা, আশ্বাস আর উচ্চাভিলাষ গ'ড়ে উঠেছে, সেটুকু আজ চূর্ণ বিচূর্ণ। অথচ এই দুর্ভাগ্যের জন্য রজনী দায়ী নয়। জলে, ঝড়ে, রোদে-

এই দীর্ঘ তিন বৎসর কাল তারই পরিশ্রমে, তারই একাগ্রতায়, তারই একান্ত উৎসাহে যে কারবার দাঁড়িয়ে উঠতে পেরেছিল, বীরেশের একটা সামান্য খেয়ালে, তার অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর একটা প্রবৃত্তির তাড়নায়, অপমানে, লজ্জায়, আঘাতে রজনীর সেই তপস্যার প্রাসাদ আজ ভেঙে পড়লো। জীবনে সুযোগ বড় বেশি সংখ্যায় আসে না। বন্যার মতো স্বভাব নিয়ে সে আসে। যদি তার জল সময় মতো ধ'রে রাখতে পারা যায় তবেই ভালো, নচেৎ ফসল ফলাবার মাঠ শূন্যই প'ড়ে থাকে।

বীরেশ মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, পোস্ট আফিসে আজ খোঁজ করেছিলি, রজনী?

শুষ্ক কণ্ঠে রজনী জবাব দিল, হ্যাঁ।

বীরেশ আশা ক'রে রইলো, সম্পূর্ণ কথাটা রজনী ক্রমশঃ বলবে। কিন্তু তার কাছ থেকে আর কোনো সাড়া এলো না। অনেকক্ষণ পরে বীরেশ পুনরায় প্রশ্ন করলো, ক্যালকাটা ট্রেডিংয়ের টাকা কি এসে পৌঁছয়নি রে?

রজনী এইবার সমগ্র পৃথিবীর উপর বিতৃষ্ণ ও বিরক্ত হয়ে বললে, না, টাকা তারা আর পাঠাবে না। নতুন মাল হাতে না পেলে বাকি টাকা তারা আর দেবে না। ইচ্ছে হয় নালিশ করো।

বীরেশের কাছে জবাব না পেয়ে পুনরায় রজনী বললে, এদিকে বেতওয়ালারা আর জোলারা আমাদের একঘরে করেছে। ইলেকশনে হেরে যাবার ফলাফল এবার ফলছে। তখন বলেছিলুম—

তখন কি বলেছিল সে-কথাটা নিজেও সে আর উল্লেখ করলো না, চুপ ক'রে গেল। বীরেশ তেমনি শান্ত এবং মৃদুকণ্ঠে পুনরায় বললে, সিটি অর্ডার সাপ্লাই কি বলে?

সিটি অর্ডার সাপ্লাই? তারা টাকাও দিয়েছে, মাল নেওয়াও বন্ধ

করেছে। টাকা তুমি নিজের হাতেই খরচ করেছ ইলেক্‌শনের হুজুগে—মনে নেই? উত্তেজনার মুখে তুমি ত যথাসর্বস্ব তলিয়ে দিয়েছ। রঞ্জনী তাকে অনেকটা যেন ধমক দিল।

বীরেশ বললে, সবই সত্যি। আপাতত উপায় কি তাই বল। দেনার জন্যে নালিশ করলে ত ভীষণ কেলেঙ্কারী। সুগার মিলের কর্তারা ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জব্দ করতে পারে।

রঞ্জনী বললে, আমাদের দলের যারা রিটার্ণড্‌ হয়েছে তারা বড় বড় গেঁয়ো নেতা, অর্থাৎ ভাঁড়ে মা ভবানী! তারা সাচ্চা লোক হতে পারে, কিন্তু পেটে ভাত নেই। তুমি যাদের বেছে বেছে খাড়া করেছ তারা সবাই এই। সুগার মিলের কর্তারা কেবল সুযোগ বুঝে জব্দই করবে না, কেবল গ্রাম ছাড়া-ই করবে না,—জেলে পাঠিয়ে এবার জানাবে সবলের সঙ্গে দুর্বলের কী তফাৎ।

বীরেশ কিছুক্ষণ পরে বললে, বাবার কাছে টাকা চেয়ে আর একবার লিখবো?

রঞ্জনী বললে, সেবারের চিঠি কি ভুলে গেছ? তুমি তাঁর ত্যাজ্যপুত্র, এবারে চিঠি দিলে তিনি জবাবও দেবেন না। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে অপমানিত হয়ে ফিরতে হবে। তাঁর 'অপরাইটনেস্‌' স্নেহে অন্ধ হবে না, মনে রেখো।

কথাটা সত্য, নিষ্ঠুর হলেও সত্য। জীবনে সে আর কোনদিন সে-পথ মাড়াতে পারবে না। বাবা তাঁর দানপত্র করে কোথায় গেছেন, অথবা কোথায় তিনি আছেন তাও বীরেশের জানা নেই। আত্মীয় পরিজন সম্পর্কে আর কারো কাছেই সে কোনোকালে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। বীরেশ স্তব্ধ হয়ে রইলো অনেকক্ষণ। পরে বললে, যদি নলিনীকে সব কথা জানাই?

রজনী বললে, আমাকে রাগিয়ো না। তোমার অভাবের খবর পেয়ে নলিনী একদিন হাজার টাকা অর্থাৎ তার যথাসর্বস্ব পাঠিয়ে দিয়েছিল। তোমার জন্যে সে বিয়ে করেনি, তোমার জন্যে সে গৃহত্যাগ ক'রে কোন্ বিদেশে গিয়ে সামান্য মাস্টারী করে দিন চালাচ্ছে। যথেষ্ট শাস্তি মেয়েমানুষ হয়ে তোমার জন্যে সে মাথায় তুলে নিয়েছে। আজ এত টাকা তার কাছে তুমি চাইবে কোন্ লজ্জায়, সে দেবেই বা কোথা থেকে?—অসম্ভব, আর কোথাও কিছু নেই?—এই বলে উত্তেজনায় উঠে রজনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে চারিদিক থেকে যেন তার উপরেই বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। চারিদিকে অভাব, রিক্ততা,—যতদূর দৃষ্টি আর কল্পনা যায়, শূন্য নগ্ন মরুভূমি যেন ধু ধু করছে। নেই, নেই, নেই······

কিন্তু দিগন্তব্যাপী এই নিদারুণ শূন্যতার দিকে চেয়ে নলিনীর কথাই বেশি ক'রে মনে পড়ছে। বহুদিন তার খোঁজখবর আসেনি। নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন কাজে ঢুকে সে জানাবে বলেছিল, হয়ত জানাতে ভুলে গেছে। হয়ত প্রয়োজন মনে করেনি। অভিমান আজ কিছু করা চলবে না; অভিমানের অতীত তপস্যায় নলিনী নীরব। কোনোদিন হয়ত নিজেকে সে প্রকাশ করবে না। যে ভালোবাসা পরম শ্রদ্ধা আর সম্মানে রূপান্তরিত, সেই ভালোবাসা নিয়ে নলিনী চ'লে গেছে বৈরাগিনী হয়ে। নলিনী অভিমান জানায়নি, অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রে যায়নি। তার দাবি উগ্র নয়, আক্রমণশীল নয়। পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পথ অবরোধ করেনি, পথে টেনেও নামায়নি। মুখ বুজে চলে গেছে কোনো প্রার্থনা না রেখে, কোনো পরিচয় না দিয়ে।

বিবাহ সে করেছে সত্য, কিন্তু সেই তথাকথিত স্ত্রীর সম্বন্ধে তার চেতনা অথবা অনুভূতি কিছু নেই। সে যেন কোন্ জন্মান্তরবাসিনী

নারী। তার সঙ্গে আত্মীয়তা নেই, প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখে সুখে বীরেশ তাকে কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু আজ এই দুর্দিনে নলিনীকেই কেবল মনে পড়ছে। সেই আগেকার একটা প্রকাণ্ড পরিব্যাপ্ত জীবন, সে-জীবন নলিনীর জ্যোতির্ময়তার পরিমণ্ডলে অনেকটা যেন মহিমান্বিত ছিল! প্রণয় সেখানে বড় কথা ছিল না, কারণ সর্বপ্রকার প্রণয়ের যে মূলীভূত কারণ, সেই ক্ষেত্রে দুজনেই ছিল যথেষ্ট পরিমাণে নির্বিকার। গোপন সুড়ঙ্গ পথ ধ'রে তাদের সেই সাধীত্ব আত্মতৃপ্তির লালাসিক্ত পথে ছুটতে ছুটতে নিজেদের পরিশ্রান্ত করেনি, তারা ছিল সজাগ, ছিল সহজ। পরিবার ও পরিজনের মধ্যে সকলের কাছে সুপ্রচারিত সেই সাধীত্ব ছিল অতি মধুর, অতি স্বাস্থ্যকর। তারা নিজেদের কেবল প্রচারই করেনি, প্রকাশও করেছিল। একথা তারা সর্বপ্রকার আচরণের দ্বারা জানিয়ে এসেছে, নরনারীর-সম্পর্কের মধ্যে আর যাই থাক্, তস্করবৃত্তি নেই। যে-আলাপ তারা করেছে সকলের মাঝখানে ব'সে, সেই আলাপই করেছে তারা কলিকাতার নির্জন পার্কের বেঞ্চে আসন নিয়ে। গোপন যেটুকু ছিল, সেটুকু সরীসৃপ-সুলভ অবলেহী বৃত্তি বশত নয়, সে আবরণটুকু তাদের নিকলুষ মাধুর্যে ভরা। আজ এই দুর্যোগে আর অবমাননার মধ্যে নলিনী তার প্রাণ-প্রাচুর্যভরা উৎসাহ নিয়ে উপস্থিত নেই,—বীরেশের শরীরের একটা প্রধান অঙ্গ অসাড়, দুর্ভার। দুর্দিনের দুশ্চিন্তা অপেক্ষা সেই বেদনার অনুভূতিই তার কাছে যেন প্রবল হয়ে দেখা দিল।

আর একজন রয়েছে তার অতি নিকটে। এত নিকটে এবং এমন ভাবে তাকে আবৃত ক'রে রয়েছে যে, বীরেশের যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। অত্যন্ত সঙ্গোপনে তার কথা না ভাবলে তাকে জানা যায় না। একটি কথার অগণ্য অর্থ, একটি চাহনির অসংখ্য ব্যাখ্যা, এবং

একটি গভীর অজস্র ভাষা।……অনুশীলার কথা ভাবছে সে। উজ্জ্বল হাসিতে সে যেন অনন্ত, যাদুকরী আভায় সে যেন শ্রোতাকে অভিভূত আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, প্রতিমান অপেক্ষা দৃশ্যমানতায় বীরেশ যেন সেখানে স্তব্ধ হয়ে থাকে। রজনী জানে না, অনিল বোঝে না, কিন্তু সকলের মাঝখানে ব'সে কেমন যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্রে অনুশীলা তার কাছে আপন হৃদয়ের সংবাদ পাঠায়। তার অঙ্গুলি সঞ্চালনে, তার পদপল্লবে, তার চূর্ণ হাসির আওয়াজে যে ভাষা জেগে ওঠে, সে যেন টেলিগ্রাফের শব্দ-উৎপাদনের মতো। সকলের কাছে যা অপরিজ্ঞাত থেকে যায়, বীরেশের কাছে তা যেন পরিপূর্ণ অর্থ বহন ক'রে আনে। বীরেশ ভীত হয়ে ওঠে তার সান্নিধ্যে।

ভীত হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। অনুশীলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে প্রশ্রয়ের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে আসে। সেই স্ফুলিঙ্গ থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রচণ্ড প্রতিরোধ-শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তি বীরেশের আছে; কিন্তু সেই শক্তি সকল সময়ে তার থাকে না। অথচ এর রহস্য আগে তার জানা ছিল না। মেয়েদের সঙ্গে তার পরিচয় খুব বেশী নয়, নলিনীকেই সে কেবল জানে। কিশোরকাল থেকে নলিনীকে সে জানে সহচারিণী, নলিনী তার বন্ধু, নলিনী তার আপন আত্মারই অখণ্ড প্রতিরূপ। কিন্তু এ-মেয়ে নলিনীর জাতি হ'তে উদ্ভূত নয়, এ বিদেশিনী, অপরিচিতা। পিয়ামিড্ দেখলে যে বিস্ময়, চীনের জীবন্ত ড্রাগন সহসা পথের মাঝখানে এসে দাঁড়ালে যে অভিভাব,—এ যেন তাই। অনাত্মীয়া মহিলা যাঁরা, তাদের অনেকের সঙ্গেই বীরেশের কুটুম্বিতা ঘটেছে। তাদের সঙ্গে বীরেশ সম্পর্ক পাতিয়ে এসেছে সহজে, স্বচ্ছন্দে; সংশয়ের কুশাঙ্কুর কোথাও ফোটেনি। কিন্তু অনুশীলা হোলো পৃথিবীর আদিম নারীজাতির একটি খণ্ডাংশ, চিরকাল ধ'রে পুরুষের কামকামনাকে

যারা আলোড়িত করেছে, অনুশীলা তাদেরই দলে। অনুশীলা সেই আবহমানকালের পরম্পরা।

দুই বন্ধুতে তারা একদা যে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করেছিল, সেই ঘটনা চতুর্থ বৎসরে এসে পৌঁছলো। জয় আর পরাজয়ের ভিতর দিয়ে এই দীর্ঘকালটা হোলো একটা বিস্তৃত নাটক। কত সংঘাত, কত ধূলিসাৎ, কত আশা আনন্দ বেদনা উত্তেজনার বিপ্লব-সংঘর্ষ তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেল। কত ভাঙন, কত নির্মাণ, কত অশ্রুর অব্যক্ত ভাষা, কত বা ক্ষণিক আনন্দের নিঃশব্দ আলোড়ন! তার এই দীর্ঘদিনের কল্পনায় নিঃশব্দ অনুপ্রাণনা যুগিয়েছে নলিনী, আর বাস্তব জীবনের সংগ্রামে সংঘাতে প্রবল উৎসাহ যুগিয়েছে অনুশীলা। তাদের এই বৃহৎ নাটকে পাত্রের সংখ্যা যত বেশিই হোক, নায়িকার সংখ্যা মাত্র একটি। তারই অঙ্গুলি সংকেতে, তারই নিষ্কম্প নির্দেশে সমস্তটাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে,—বীরেশ যেন সেই দৃশ্য আজ স্পষ্ট দেখতে পেলো। সে দেখেছে সাম্রাজ্যের জন্য অনুশীলার কী অসাধারণ অধ্যবসায়, স্ব-মত প্রতিষ্ঠার জন্য কী প্রচণ্ড সংগ্রাম, বিরোধীকে দলিত করার জন্য কী অদ্ভুত চক্রান্তজাল। দুই শিক্ষিত চোখের তারায় একদিকে যেমন বিদ্যুজ্জ্বালা ঝলকিত হয়ে ওঠে আক্রোশে, তেমনি করুণ মৃৎপ্রদীপের আলোও উদ্‌ভাসিত হয় মধুর বন্ধুতায়।

সহসা তার চমক ভাঙলো বাইরে থেকে কার পায়ের শব্দে। আড়ৎদারদের আজকে টাকা দেবার কথা ছিল, সেই কথাটা বীরেশের মনে পড়ে গেল। সে সজাগ হয়ে উঠে বসলো।

আরে মথুরানাথ যে? এসো, এসো—কী খবর? বুড়ো মানুষ এত ভোরে কি বেরোতে আছে? ব'সো, টাকা হও।

মথুরানাথ ঘরে ঢুকে ঠাণ্ডা মেঝের উপর ব'সে প'ড়ে বললে, আর বাবু, এ বছর বৃষ্টি নেই, সব জ্বলে পুড়ে গেল। না খেয়ে মরবে সবাই।

তারপর? তুমি আছ কেমন, মথুরানাথ?

আপনারই দয়া, বড়বাবু। পেটে ভাত জুটো দিচ্ছি সে আপনারই ইচ্ছে। বড়বাবু, আপনার দেনা যে এইভাবে শোধ করতে হবে, আগে জানলে,—মথুরা আপনার পায়ের লোক, পায়ের তলাতেই থাকবে। কিন্তু ওদের কোনোকালে ভালো হবে না—

তার অশ্রু-গদগদ কথায় বীরেশ বললে, কি হয়েছে মথুরা, কোনো খবর আছে?

কপালের ঘাম আর চোখের জল মথুরা একসঙ্গেই মুছে ফেললো, তারপর তার ছেঁড়া ছিটের কোটের ভিতরকার পকেট থেকে একখানা বড় খাম সুদ্ধ চিঠি বা'র করে নিঃশব্দে বীরেশের হাতে তুলে দিল।

চিঠি খুলে বীরেশ পড়ছে দেখে মথুরানাথ পুনরায় বললে, আমাকে দিয়ে এত পাপ করিয়ে নিল, এ অধর্ম আমার সইবে না, বড়বাবু, আমার যেন সর্বনাশ হয়।

চিঠি পড়া শেষ করে বীরেশ একবার বিবর্ণমুখে তার দিকে তাকালো, তারপর সহসা এদিক ওদিক চেয়ে যেন কা'কে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু রজনীর ভরসা করা বৃথা, তার হাতেও এর কোনো প্রতিবিধান নেই। চিঠিখানা পুনরায় বন্ধ ক'রে সে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

বড়বাবু?

গলা ঝাড়া দিয়ে বীরেশ বললে, কি বলো?

আমার কোনো অপরাধ নেই, বড়বাবু।

না হে মথুরা, তুমি কেন অপরাধী হবে? গলা পরিষ্কার ক'রে বীরেশ বলতে লাগলো, এ বাড়ী থেকে ওরা আমাদের নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দিতে পারে, কারণ এ বাড়ী সমবায় সমিতিরই সম্পত্তি। ওদের দল এখন ভারি, আমরা হটে যেতে বাধ্য। সাত দিন সময়ও ওরা দিতে চায় না। আমাদের হাত থেকে কাগজপত্র, ব্যাঙ্কের বই, যা কিছু অধিকার আর দায়িত্ব—সবই ওরা আইনের বলে কেড়ে নিয়েছে। আমাদের ঘাড়ে প্রকাণ্ড দেনা, যদি শোধ করতে না পারি, জেল খাটতে হবে। কিন্তু কি জানো মথুরা, আমাদের এই গ্রাম আর এই জেলা ছেড়ে চ'লে যেতে হয়,—নৈলে আর উপায় নেই। আমাদের তাড়াবার এমন সুযোগ আর ওরা পাবে না।

আপনারা যাবেন কেন বড়বাবু?

আমাদের থাকার আর জায়গা নেই যে হে? তুমি ত জানো মানুষের দাম কম, যে-আসনে সে বসে সেই আসনটার দাম বেশি। আমরা পোজিশন্ হারিয়েছি, আমরা এখন বেড়াল-কুকুরের বেশি কিছু নই।......আচ্ছা, তুমি এখন যাও। ওদের ব'লো, আইন অমান্য আমরা করবো না। এ বাড়ী যথাসময়ে ছেড়ে দিয়ে যাবো।

তার পায়ের ধুলো নিয়ে চোখের জল মুছে মথুরানাথ উঠে চ'লে গেল।

এর পরে ওদের জীবনে আবার একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব ঘটলো।

কী যেন কাজকর্মে রজনী দুদিন মহাব্যস্ত। তার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলবার অবকাশও সে দেয় না। বাইরে-বাইরে বৈষয়িক ব্যাপারে সে সারাদিন কাটায়। স্নানাহারের সময়ও তার নেই। এদিকে এবাড়ী ছেড়ে না দিলেই নয়। তিন দিনের মেয়াদ তাদের উত্তীর্ণ হ'তে চললো।

সেদিন যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য বীরেশ রজনীর জন্য উন্মুখ হয়ে বসেছিল।

ভোরের দিকে রজনী বেরিয়ে গিয়েছিল। প্রায় ন'টা নাগাৎ সে ফিরলো। কিন্তু সঙ্গে তার সেই পুরনো গাড়োয়ানের সেই ভাঙা গাড়ী-খানা। গাড়ী এসে একেবারে দরজার ধারে দাঁড়ালো।

শশব্যস্তে ঘরে এসে রজনী খবর দিল, বীরেশ, একবার বাইরে আয় রে। মা, দিদি, ভগ্নিপতি সবাই এসেছেন।

তাই নাকি?—ব'লে বীরেশ দ্রুতপদে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

একজন বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা এবং তার সঙ্গে কন্যা ও জামাতা। সঙ্গে চার পাঁচ বছরের একটি বালক। বীরেশ হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে সকলেরই পায়ের ধুলো নিল। বললে, মাসিমা, দিদিমা, জামাইবাবু—আপনারা সবাই এলেন। কী ভাগ্য আমাদের?

মাসিমা আশীর্বাদ ক'রে বললেন, ভারি খুশি হলুম তোমাকে দেখে। তেমনি আছ তুমি। কিন্তু বাবা, হাতে ক'রে সব গড়লে, আবার নিজের হাতেই কি সব ভাঙতে হয়?

বীরেশ হকচকিয়ে এদিক ওদিক একবার তাকালো। কথাটা সে ঠিক বুঝতে পারেনি। দিদি, জামাইবাবু এবং রজনী—সকলেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মাসিমা বললেন, অল্প বয়স কিনা, মন তোমার এলোমেলো। তা' বেশ, তুমি যা বুদ্ধিমান ছেলে, এবার থেকে সব পারবে। বড় মানুষের ঘরে তোমার জন্ম, তুমি একাই একশো।

দুর্বোধ্য তাঁর ভাষা। কিন্তু তবু তাঁদের নির্লিপ্ত আচরণে এবং নীরস কণ্ঠস্বরে বীরেশের মন কেমন যেন সংশয়ে আর দ্বন্দ্বে দুলতে লাগলো। কিন্তু চিত্তবিকার গভীর ভাবে তাকে কোনোদিন আচ্ছন্ন করেনি। নিজের

চমক নিজেই সহসা জেগে গিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে বললে, আসুন মাসিমা, আসুন আপনারা সবাই ভেতরে,—আজ কী যে আনন্দের কথা বলতে পারিনে। আগে এসে বিশ্রাম করুন আপনারা, পরে খুব গল্প করা যাবে।

পাগল ছেলে!—মাসিমা হাসিমুখে বললেন, এসেছি যখন তখন কি আর ফিরে যাবো বাবা। এই তোমার কাছাকাছি থাকবো,—ওরে রজনী, গাড়ী যেন চ'লে যায় না। জিনিসপত্রগুলো তোর কোন্ ঘরে আছে বল্ দিকি রে?

কিন্তু রজনী বাইরে থেকে কোনো সাড়াশব্দ দিল না, ঘোড়ার গাড়ীর পাশে নিজেকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে তার দিদির সঙ্গে কি যেন কথাবার্তা বলতে লাগলো।

বীরেশ বললে, আপনারা কি এখুনি চ'লে যাবেন, মাসিমা?

যাবো আর কোথায় বাবা, তোমাদের এই গ্রামেই থাকতে এলুম কিছুদিন। হরিহর চক্রবর্তীকে জানো ত? তার ওখানেই যাচ্ছি। তোমার কাছেই রইলুম, ভয় কি?

রজনী কি আপনাদের সঙ্গে যাবে?

মাসিমা বললেন, হাঁ বাবা, ও এখন থেকে আমারই কাছে থাকবে। তুমি কিছু মনে ক'রো না, অনেক করেছ তুমি ওর জন্যে। ওরই ভাগ্য খারাপ, নৈলে তোমার এমন কেন হবে, বাবা?—কই ললিত কোথায় গেল? এদিকে একবার এসো বাবা, ললিত। ওকে চেনো ত? আমার জামাই।

ললিত এসে দাঁড়ালেন বিব্রত কুকুরটির মতো।

শাশুড়ী বললেন, সময় ত নেই, কথাটা এখনই সেরে নাও। তোমার ওই দোকান আর কারবারের কথা হচ্ছিল। ওটা কি বাবা তোমাদের দুজনের নামেই আছে?

ললিত প্রশ্ন করলেন, আপনারা কি সমান অংশীদার ?

বীরেশ বললে, আজ্ঞে হাঁ।

ডকুমেন্ট একটা আছে ত ? রেজেষ্ট্রি হয়েছিল ?

না, দরকার হয়নি। টাকাকড়ি সমস্তই আমার আমানত করা, তবে রজনী অর্ধেক ভাগ পাবে এই কথা আছে।

ললিত হেসে বললেন, কিন্তু ধরুন, ভবিষ্যতে যদি একটা—অবশ্য যদি সত্যকার বন্ধুত্ব হয় তবে কোনোদিন বিবাদ না বাধতেও পারে। কিন্তু কি জানেন, এসব বিষয়ে পাকাপাকি একটা বন্দোবস্ত থাকলে ভবিষ্যতে কোনো পক্ষেরই আর দুশ্চিন্তা থাকে না। আপনি ত নিজেই ওকালতি পাশ করেছেন, আপনাকে বলাই বাহুল্য !

বীরেশ বললে, আপনারা কি চান বলুন ?

শাশুড়ী এবার আসল কথাটাই পেড়ে ব'লে ফেললেন, আমি বলি বাবা, আধাআধি বকরার আগে তোমাদের লেখাপড়াটা হয়ে যাক্।

হাসি মুখে বীরেশ এবার বললে, আধাআধি বকরা ত হবে মাসিমা, কিন্তু এ কারবারে আধাআধি টাকা রজনী দেয়নি। সমস্ত টাকা আর সমস্ত দায়িত্বই আমার। এ যাবৎ সমস্ত দেনা আর সব বিপদই আমার উপর দিয়ে গেছে। রজনী বরাবর তার পারিশ্রমিক নিয়ে এসেছে, আমি আজ পর্যন্ত একটি কানাকড়িও নিজের জন্যে খরচ করিনি। এই কারবারের এক পাই অংশেও তার অধিকার নেই,—সমস্তটা আমারই সৃষ্টি।

কথাগুলি সত্য, সেই কারণেই কটু, রূঢ়। ভিতরে ভিতরে তার সমগ্র হৃদয় দগ্ধ হচ্ছিল, কিন্তু বাইরে তার গলার আওয়াজ লেশমাত্রও অশান্ত অথবা অভদ্র হয়নি। একদিকে শাশুড়ী, অন্যদিকে জামাতা—উভয়েই নিরুত্তর বিহ্বলতায় তার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে

সহসা তীব্র জ্বলন্ত হাসি হেসে মাসিমা বললেন, তুমি উকীল বটে বাবা,—যা মনে করেছিলুম তুমি ত তা নয়? তাহলে রজনী আমার সবদিক থেকেই ফাঁকি পড়লো, কেমন বীরেশ?

তাঁর বিষাক্ত, তীক্ষ্ণ এবং অপমানকর মন্তব্যে বীরেশ কোনো জবাব দিল না। কেবল মুখ ফিরিয়ে বললে, তাহ'লে এ অবস্থায় কি করা যায়, ললিতবাবু?

ললিত বললেন, আপনি যা বলছেন তাই যদি সত্য হয়, তবে রজনী ত কিছুই পেতে পারে না।

এইটিই সত্য, রজনীও জানে—আপনারাও হয়ত জানেন!

শাশুড়ী রুদ্ধ আক্রোশে ব'লে উঠলেন, তাহ'লে তুমি ত আমার ছেলের চারটে বছর মাটি ক'রে দিলে, বাবা। তুমি নিজেও নষ্ট হ'লে, ওকেও মাথা তুলতে দিলে না। বাপ বোধ হয় এইজন্যেই তোমাকে বাড়ী থেকে বা'র করে দিয়েছিল!

বীরেশ একবার রুদ্ধ চক্ষে তাঁর দিকে তাকালো। একটা প্রচণ্ড অসংযত উক্তি তার মুখের আগায় এসে পড়েছিল। কিন্তু নিজেকে সবলে সংযত ক'রে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বাইরে এসে সে ডাকলো, রজনী? এদিকে আয় একবার।

গুরুগম্ভীর তার কণ্ঠস্বর। এ গলার আওয়াজ বন্ধুর নয়, সহকর্মীর নয়,—এ কণ্ঠ অভিভাবকের। এ আহ্বান অমান্য করার সাধ্য রজনীর ছিল না। ভীরু এবং অনুগত সেবকের মতো সে কাছে এসে দাঁড়ালো। বীরেশ সহসা হাসিমুখে তার কাঁধে হাত রেখে বললে, তুই যে আমাকে ছেড়ে যেতে চাস আগে জানাসনি কেন রে, বেশ, যেখানেই থাকিস মন দিয়ে কাজ করবি। আমাদের কারবারের অবস্থা খুবই ভালো, তবে

টাকাকড়ি আপাতত আটকা পড়েছে বটে। তুই ত জানিস্, শিগ্‌গিরই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

শাশুড়ী ও জামাই পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বীরেশ পুনরায় বললে, মাসিমা রাগ করেছেন, আমি নাকি তোর ভবিষ্যতের কোনো ব্যবস্থা করিনি। আমার সাধ্য খুবই কম। তবে তুই এই কারবারের জন্যে অনেক পরিশ্রম করেছিস। আমি আজ থেকে এ কারবার তোর হাতেই ছেড়ে দিলুম, তোকেই দান করলুম। ললিতবাবু, আপনি আসছে সোমবারে রজনীকে নিয়ে কাছারীতে আসবেন, আমি ওর নামে ডকুমেন্ট তৈরী ক'রে দেবো।—যা রে রজনী তোর জিনিসপত্র গাড়ীতে তুলে নে।

তিন বছরে আসবাবপত্র কিছু কিছু জমেছিল বৈ কি? কিন্তু নিজের জন্য কিছু রাখতে বীরেশের একেবারেই রুচি হোলো না। জোর-জবরদস্তি ক'রে সে রজনীর সঙ্গে প্রায় সমস্তই গাড়ীতে তুলে দিল।

শাশুড়ী ও জামাতা বিহ্বল বিস্ময়ে কেমন যেন নির্বোধ ও নির্বাক হয়ে গাড়ীতে উঠলেন। দিদির চোখে মুখে ছিল বিমূঢ়তা। রজনী ফিরে এসে কাতরকণ্ঠে একবার বিদায় নেবার চেষ্টা করতেই বীরেশ তাকে ধ'রে গাড়ীতে তুলে দিয়ে বললে, এখানেই ত রইলুম রে, আবার দেখা হবে। কাজ কারবার মন দিয়ে চালাস্।

গাড়ী ছেড়ে দিল। ঘরে ফিরে এসে ক্ষুধার্ত শ্রান্ত বীরেশ জানালার ধারে ব'সে পড়লো। এদিকের পল্লীটা নির্জন, শূন্য ঘর দুটো খাঁ খাঁ করছে। আজ থেকে সে সম্পূর্ণ একা।

তাদের উভয়েরই ভাগ্যসূত্র একত্রেই গ্রথিত হয়েছিল বটে, কিন্তু বহু দুর্দিনেই রজনীটা আজ তাকে ছেড়ে গেল।

রিক্ত ও নিঃস্ব ঘরখানার মেঝের উপর ঠাণ্ডায় সে একসময় বড় ক্লান্তিতে শুয়ে চোখ বুজলো। নিজেকে অনেক দিন পরে কেমন যেন পরিত্যক্ত, উপেক্ষিত, পদাহত মনে হ'তে লাগলো। পিতার সঙ্গে মতভেদ হয়ে সে যেদিন সব ছেড়ে চ'লে আসে, পথে পথে যেদিন ঘুরতে হয়, যেদিন ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্ন ছিল না,—সেদিন নিজেকে এত নিরুপায় মনে হয়নি। যাকে বিবাহ ক'রেও সে স্ত্রী বলতে পারে নি, এবং যে-নলিনীকে কাছে না পেয়ে তার চিরজীবন বিপন্ন হয়েছে,—তাদের জন্তও এত বেদনা তার বুকে বাজেনি। যে-সংগ্রাম আর সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে এই-কয় বছর সে উত্তীর্ণ হয়ে এলো, দীর্ঘরাত্রির যে-দুশ্চিন্তা, অশান্তি, চিত্তক্ষোভ আর অপরিমেয় দুর্দশা-ভোগের মধ্যে সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল,—সে সব কিছুই তার অধ্যবসায়কে নির্জীব করতে পারে নি, তার উৎসাহ এবং উদ্যম অনির্বাণ ছিল। কিন্তু বাজবারে, দুর্দিনে, বিপদে, অসম্মানের ভিতরে যে-বন্ধু ছিল তার নিত্যসহচর, দিনে দিনে যার সঙ্গে ঘটেছিল অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা আজ তার এই অদ্ভুত আচরণ বীরেশ বিমূঢ় বিস্ময়ে অনুভব করতে লাগলো। আক্রোশ তার হোলোনা, অভিমান তার মনে জন্মলো না,—কেমন যেন একটা বিয়োগ বেদনায় তার হৃদয়ের অন্তস্থলের একটা বন্ধু টন্‌টন্ করতে লাগলো।

তবু রজনীর অপরাধ কিছু নেই। যে কোনো ব্যক্তিকে তার বিশেষ পরিপ্রেক্ষণে বিচার না করলে এমন ঘটনাই ঘটে থাকে। রজনী বারবার জানিয়েছে, তার বেরিয়ে আসা জীবিকার অন্বেষণে। সে স্বার্থবাদী, সে অর্থ চায়—ঋণ চায় না; সে প্রতিষ্ঠা চায়, প্রতিপত্তি চায় না। কাজ-কারবারের পথটা সুগম হলেই সে তুষ্ট, ক্ষমতা আহরণের দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। বস্তুগত সুখস্বপ্নের দিকে তার

ঝোঁক, নিভৃত আত্মকেন্দ্রিক জীবন তার প্রিয়, নির্ঝঞ্ঝাট আহার-বিহার, আর নির্ভুল ব্যক্তিগত তৃপ্তিই তার কাম্য। বড় আদর্শের ধার সে কোনদিনই ধারে না, গ্রামের উন্নতির জন্য দুঃখ বরদাস্ত করতে সে প্রস্তুত নয়, প্রকাণ্ড ক্ষমতাকে আয়ত্ত ক'রে জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করা তার ধারণাতীত, সর্বব্যাপী দেশসেবার দায়িত্ব নিয়ে বহু মানুষের নেতৃত্ব করা সে কল্পনাও করে না। আজ যদি সে বীরেশকে ত্যাগ ক'রে একান্তে গিয়ে নিজের বৈষয়িক উন্নতির জন্য চেষ্টা পায় তবে তাকে দোষ দেওয়া চলে না। যারা সংসারী, যারা গৃহগতপ্রাণ, বিপদের মাঝখানে জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মহৎ দুঃসাহস যাদের নেই, তারা রঞ্জনীর এই বিষয়-বুদ্ধি দেখলে খুশি হবে। তার আচরণে কোথাও ত্রুটি খুঁজে পাবে না। আদর্শবাদীর রঙীন স্বপ্নে তারা না পায় যুক্তি, না পায় আশ্বাস। রঞ্জনী আর যাই করুক ভুল করেনি, আর যাই হোক, নিষ্ফল আইডিয়ায় মোহগ্রস্ত হয়নি। গৃহস্থ-জীবনের পক্ষে সে সত্যই উপযোগী।

পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তে সূর্য অস্তে নামলো। সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই। বীরেশের চমক ভাঙলো।

কাল সকালে তাকে সকলের সামনে এই ঘর খালি করে দিতে হবে সমিতির কর্তাদের এই নির্দেশ। অধিকার বজায় রেখে গায়ের জোরে সে এখানে থাকতে পারতো, কিন্তু বিবাদের প্রতি তার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা! নিজের শক্তিকে সে ভিতরে উপলব্ধি করে, সেই শক্তি তাকে কাজের দিকে ভবিষ্যতের পথে ঠেলে নিয়ে যায়, বাইরের অসামাজিক মত্ততায় তার রুচি নেই। ছেড়ে যখন সে দেবেই, তখন আজই তার

চ'লে যাওয়া ভালো। বীরেশ পা ঝাড়া দিয়ে সোৎসাহে উঠে দাঁড়ালো।

বাইরে বেরিয়ে কাছারির পথে কিছুদূর গিয়ে সে একটা লোককে ধ'রে আনলো। আসবাবপত্র, বাসনকোসন যা কিছু ছিল প্রায় সবই সে রঞ্জনীর সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং সে নিজের বাক্স আর সামান্য বিছানাটা লোকটার মাথায় তুলে দিয়ে পথে এসে নামলো। তিনবছর আগেও সে এই গ্রামে এসেছিল ঠিক এমনিই রিক্ত অবস্থায়। আজ আবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলো। কেবল তফাৎ এই, সেদিন সে নির্বিঘ্ন ছিল, আজ তার মাথার 'পরে প্রকাণ্ড ঋণের ভার,— এই গুরুদায়িত্ব ছাড়া তার আজ আর কোনো সম্বল নেই।

তাঁতীবৌ-এর দরজার কাছে সে যখন এসে দাঁড়ালো তখন প্রায় সন্ধ্যা। এই বাড়ীতে সাড়া দিয়ে প্রবেশ করার প্রয়োজন তার নেই, এই ঘর তার মাতৃমন্দির। বাক্স বিছানা নিজের হাতে নিয়ে দুটো পয়সা লোকটাকে মজুরি দিয়ে সে সটান ভিতরে ঢুকে গেল। জোলা ঘরে নেই। এই সময়টার এদের কাজ বেশি হয়, কর্তা বোধ হয় সেই তাগিদেই বেরিয়েছে।

ভিতরে এসে বীরেশ ডাকলো, মা?

সাড়া না পেয়ে দাওয়া পেরিয়ে উঠানের কাছে আসতেই যে দৃশ্য বীরেশের চোখে পড়লো তা'তে দ্বিতীয়বার সে আর সাড়া দিল না। মুন্নি আর রহমনের সমাধীর উপর একরাশ জুঁইফুল ছড়িয়ে তাঁতীবৌ তার ওপর নত হয়ে রয়েছে। বোঝা গেল, করুণ ভাবাবেশের জন্যই বীরেশের গলার আওয়াজ সে শুনতে পায়নি। বীরেশ সেখানেই নিঃশব্দে দাঁড়ালো।

কিছুক্ষণ পরে তাঁতীবৌর সম্বিত ফিরলো। জলভরা চোখে মুখ

৮

ফিরিয়ে তাকাতেই দেখলো বীরেশকে। যে সন্তানের বিয়োগ-বেদনায় তার মাতৃহৃদয় থেকে রক্ত ক্ষরিত, তার সেই সন্তানই যেন ভিন্ন রূপে তার সুমুখে হাজির। হাসিমুখে সে বললে, ওমা এসেছ বাবা,...আমি ভাবি আমার রহমন বুঝি ডাকলো মাটির তলা থেকে! এসো বাবা, এসো। মাকে বুঝি এতদিনে মনে পড়লো?

বীরেশ বললে, সন্তান ক্ষমা পাবে জেনেই ভুলেছিলুম, মা! কোথাও যদি জায়গা না পাই, সবাই যদি ছেড়ে যায়, আমি জানি এই তীর্থ আমার ঘুচবে না।—বলতে বলতে তার গলাটা যেন ধ'রে এলো।

তাঁতিবৌ অতশত বোঝে না। সে কাছে এসে বললে, কই, হরিকে দেখলুম, হর কোথায় গেল? রজনী কই বাবা তোমার সঙ্গে?

আজ সে আসেনি, মা।

কেন?

সে এতদিনে তার জায়গা পেয়েছে।......তার মা, তার বোন, তার সবাই। তারা গেছে ও গাঁয়ে হরিহর চক্রবর্তীর বাড়ী।

তাঁতীবৌ অশিক্ষিত হোক, অজ্ঞান নয়। চক্ষের নিমেষে সে যেন কী আবিষ্কার করলো। তারপর কাছে এসে হেঁট হয়ে বীরেশের মুখখানা দেখে বললে, হুঁ, নাওয়া খাওয়া হয়নি দেখছি সারাদিন। সে গেছে মা-বোনের সঙ্গে, আর ওখানে তোমার খাওয়া হয় নি! তাহলে আবার সেই আগেকার অবস্থাই হয়েছে!

হয়ত তার চেয়েও খারাপ, মা।

তা ত' বটেই, অমন বন্ধু পর হয়ে গেল! আমি কোথায় মনে করছি, আমার ছেলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। অতটা শা করিনি। আহা বাছারে!—ভয় কি, এ তোমারই ঘরদোর বাবা, তোমার সব আমি

ক'রে দেবো। এসো তোমার ঘরে। চট্‌ ক'রে একটা ডুব দিয়ে এসে তোমার রান্নার ব্যবস্থা করে দিই।

তাঁতীবৌ স্নান ক'রে এসে ভিজা কাপড়ে রান্নার আয়োজন করতে লাগলো; কাঠ ধরালো। চাল-ডাল ধুয়ে আনলো। আলো জ্বাললো।

এক সময়ে চুপি চুপি বললে, কর্তা বাড়ী নেই, দেখতে পেলে বলবে, মাগীর আবার মাথা খারাপ হয়েছে। কিছু নয়, বাবা,—চারটি ফুল তুলে এনে খুন্নি আর রতনের মাটির ওপর দিচ্ছিলুম। আজকের এই তারিখেই ওরা মরে ওলাউঠোয়। তাদের কথা ভাবছিলুম বলেই ত' তুমি এলে!···তাঁতীবৌর চোখ দুটো আবার ঝাপসা হয়ে এলো!

বিহ্বল শ্রদ্ধায় বীরেশ নত হয়ে রইলো। তার সব ব্যথা, সকল অভিমান যেন এই নারীর কয়েকটি কথায় ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। রজনী সম্বন্ধে তার ক্ষোভের আর লেশ রইলো না।

উনুনে কাঠ ধরিয়ে দিতেই সে বললে, তাঁতী-মা—মায়ের কাছে ছেলের কি কোনো জাত আছে? আজ থেকে তোমার হাতে একমুঠো ভাত না খেলে আমার যে খাওয়াই হবে না!

তাঁতীবৌ মুখ তুলে তার প্রতি তাকালো। বললে, আমি যে মোছলমান, বাবা!

মুসলমান মেয়েরা কি সন্তানের মা নয়?

তাঁতীবৌ কি যেন ভাবতে লাগলো। তারপর বললে, কর্তা বাড়ী নেই, জিজ্ঞেস করতুম।

তাহ'লে আমি অপেক্ষা করি, মা?

তাঁতীবৌর হাত পা যেন অবশ হয়ে এলো। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বললে, কিন্তু আমার যে পাপ হবে, বাবা। জেনে শুনে ত আমি কখনো পাপ কাজ করিনি!

বীরেশ বললে, মুসলমানের ধর্মে কি একে পাপ বলে ? বোধ হয় বলে না। তোমার কি এই বিশ্বাস, আমাকে হাতে ক'রে রুটি খেতে দিলে তোমার পাপ হবে ?

দেখতে দেখতে তাতীবৌর মুখখানা প্রভাত-আকাশের মতো আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে এলো। সে ব'লে উঠলো, না, তা হবে কেন ? দিচ্ছি বাবা তোমাকে বেঁধে বেড়ে।

এই বলেই উদ্দীপ্ত উৎসাহে কোমর বেঁধে সে কাজে নামলো।

তিনটি সপ্তাহ কেটে গেল। এই সময়টায় বীরেশ নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করেছে। অতীত জীবন মন থেকে সে মুছে দিল। এখনকার হিসাব নিকাশ বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে। ইতিমধ্যে রজনীর নামে কারবার সে লিখে দিয়েছে। মুনফার ভাগ রজনীর, দেনার ভার তার। এটা হঠাৎ বিসদৃশ পরার্থপরতা ব'লে মনে হতে পারে, অনেকেই বলবে স্বার্থত্যাগের বাড়াবাড়ি, কিন্তু এই নীতিই বীরেশ মেনে এসেছে। আবার সে দল গড়বে, আবার সে বক্তৃতা দেবে, গ্রামবাসীদের ওপর বিশ্বাস সে হারায়নি। দল গ'ড়ে বর্তমান সমিতির কর্তাদের ওপর কাজের চাপ দিতে হবে, শোষণ-নীতিকে যতদূর সম্ভব সায়েস্তা রাখা দরকার। চাষীরা এই সময় আবার দাদন নিচ্ছে, অতিরিক্ত সুদের চাপ তাদের ওপর না পড়ে। গ্রামের সংস্কারে আজও কর্তারা হাত দেয়নি। নির্বাচনের পর দুমাস প্রায় কেটে গেল। কর্তৃপক্ষ যদি চুক্তিভঙ্গ করে তবে গ্রাম চাষীদের মধ্যে আবার অসন্তোষ সৃষ্টির সম্ভাবনা। বীরেশ যেন অনেকটা আশান্বিত হ'তে লাগলো।

সেদিন একটা ছুটির বার। আগের রাত্রে অনেক পরিশ্রম করে পরের দিন সমবায় সমিতির বিশেষ অধিবেশনের জন্ম বীরেশ একটি প্রস্তাব রচনা করেছিল। অপর পক্ষের দল ভারি, তার প্রস্তাব নাকচ হতে পারে, কিম্বা সংশোধন প্রস্তাবে তাকে কোণঠাসাও করতে পারে,—সকল দিক বিবেচনা করে বীরেশ অনেক মাথা খাটিয়ে খসড়া রচনা করেছিল।

তাঁতীবৌ আর কর্তার সঙ্গে কথাবার্তা সেরে সে কাজে যাবে এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এলো, বড়বাবু আছেন নাকি?

আছি, কে তুমি?—বীরেশ সাড়া দিল।

হাকিমের ওখান থেকে এসেছি, একবার দয়া করে বাইরে আসবেন, বড়বাবু?

বীরেশ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে গিয়েই বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সামনেই সর্বাভরণা সালঙ্কারা হাকিমের মহামান্তা স্ত্রী!

হাসিমুখে অনুশীলা বললে, থাক্, আর আগ বাড়িয়ে এসে খাতির ক'রে কাজ নেই। সব বোঝা গেছে।

বীরেশ বললে, সে কি, এখানে আপনি?......এমন সময়?

অনুশীলা বললে, কোনো অন্যায় হয়নি, আমার খুশি।—দেখি, আপনার ঘর কোন্‌টা? চলুন, একটু ব'সে যাই। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেছে।

পশ্চিমের ঘরখানা বীরেশের। ভিতরে সেই প্রকাণ্ড খড়ের গাদা। পাশেই কেরোসিন কাঠের একখানা নড়বড়ে তক্তা। তাঁতীবৌ তার কাঁথাপত্র আর ভাঙা কলসীগুলো এ ঘরেই রাখে। ঘরের দক্ষিণ দিকের চালা ফুটো, নিচের দিকে চেঁচাবাঁশের দেয়াল অনেকটা ফাঁক হয়ে ভেঙে গেছে। এইটুকুর মধ্যে বীরেশের লেখাপড়া আর বসবাসের সংস্থান।

ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে অনুশীলা উচ্চ দীর্ঘ কলকণ্ঠে হেসে উঠলো। তারপর হাকিমের স্ত্রীর পক্ষে যা নীতিবিরুদ্ধ ও বেমানান, যার নাম বালিকা-সুলভ চটুলতা, অনুশীলা তাই ক'রে বসলো। দুমাস পরে বীরেশের দেখা পেয়ে এবং হাতের কাছে বৃহৎ খড়ের গাদা দেখে তার শৈশবের স্বভাবলঘুতা আবার ফিরে এলো। কাপড়চোপড়, সাজগোজ, প্রসাধন, দৃষ্টিশোভনতা কিছুই সে মানলো না। উল্লাসের আতিশয্যে সপ্তবিংশতিবর্ষীয়া রাজপুরুষের স্ত্রী অনুশীলা সহসা লাফ দিয়ে খড়ের গাদার উপর উঠতে গিয়ে আঁটীসুদ্ধ পিছলে গড়িয়ে মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে একটা অতি হাস্যকর কাণ্ড বাধিয়ে বসলো।

এমনই আকস্মিক, এমনই অপ্রত্যাশিত যে, বীরেশ কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত বিমূঢ় অবস্থায় থেকে নিজেও সহসা হো হো ক'রে হেসে উঠলো। বললে, আপনি ত ভারি অদ্ভুত ছেলেমানুষ, মিসেস্ সেন ?

ধুলোবালি ঝেড়ে উঠে হাসিমুখে অনুশীলা বললে, খড়ের গাদায় আমরা ছোটবেলায় লুকোচুরি খেলতুম। কী আমোদ, কী নিবিড় নেশা সেই ছোটবেলায়!

উল্লাস যেন দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে তার সর্বাঙ্গে।

এবার শুনি। বলুন, আপনার দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসের কারণ কি ? না শুনে এক পাও নড়বো না।

বীরেশ বললে, দাঁড়ান। আগে আপনার ডিগ্‌বাজী খাওয়াটা একটু হজম ক'রে নিই। কী দুরন্ত আপনি ? যদি কোথাও চোট লেগে যেতো ?

বেশ হোতো। কপাল ফুটো হোতো। রক্তটা নিজে দেখতুম, আপনাকেও দেখাতুম। আপনি হায় হায় করলে আরো তৃপ্তি পেতুম। আপনার আক্কেল-বিবেচনা একটুও নেই। মানুষের জীবনে হার-জিত

ঘটলে এই ভাবেই বুঝি তারা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়ায়?—অনুশীলা ভীষণ অভিযোগ জানালো।

বীরেশ বললে, সত্যই তাই। আপনার কাছে লজ্জাতেই আমি মুখ দেখাতে পারিনি। চিরকালের লজ্জা।

কিন্তু ভেবে দেখেছেন, এ আপনার লজ্জা নয়, গৌরব?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বীরেশ তার দিকে তাকালো।

অনুশীলা বললে, মেয়েমানুষ হয়ে বড় বড় কথা বললে আপনাদের মতন এন্টি-ফেমিনিস্টরা হাসাহাসি করবে, এ আমি জানি। কিন্তু এ ত' আপনি জানেন, সত্য আর ন্যায় চিরকাল বর্বরের হাতে মার খায়। রাবণ একদিন স্বর্গের দেবতাদের বন্দী করেছিল, হিটলার আজ সারা ইউরোপ জয় ক'রে বেড়াচ্ছে। এমন হয়। ধর্মের মধ্যেও মানি ঢোকে, দুর্বলতা দেখা যায়। অসুরদলের অত্যাচার সৃষ্টি হয় কল্যাণের মঙ্গলকেই বিশুদ্ধ ক'রে তুলতে। কুরুবংশের জন্ম হয়েছিল পুরনো ধর্মকে নষ্ট ক'রে নতুন ধর্ম সৃষ্টিতে সাহায্য করতে। আপনি মার খেয়েছেন, কারণ সত্য আর ন্যায়বিচার আপনার হাতে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চায়। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন বারে বারে মার খাচ্ছে, অন্যদিকে তারই সত্য জ্বলে উঠছে চারিদিকে দপ্ দপ্ ক'রে। আর আপনিও যদি মুখ লুকিয়ে বেড়ান, এরা তবে কা'র মুখ চেয়ে বাঁচে, বীরেশ বাবু?

বীরেশ বললে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আপনার উপমা ত খাটলো না, মিসেস্ সেন? যাদের টাকা আছে, জমি আছে, তারাই এখন পৃথিবীর সর্বত্র মালিক। তারা নীচ জাত হলেও ব্রাহ্মণ, অসভ্য হলেও দেবতা। আমার নিজের এক ছটাক জমি নেই, হাতে টাকা নেই, মন তাজি নয়, প্রতিপত্তি যা ছিল নষ্ট হয়ে গেছে। পৃথিবীতে বহু আদর্শবাদী এমনি ক'রে মার খেয়ে গেছে, তারা বার বার মাথা তুলতে গিয়েও হার মেনেছে।

বিশ্ব জগতের এই হোলো একটা সর্বব্যাপী নিয়ম, মানুষেরই পায়ের তলায় বড় বড় সভ্যতা, বড় বড় কল্যাণ দলিত হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ তার বিদ্যা, তার প্রজ্ঞা, তার মননশীলতা নিয়ে মাথা উঁচু করতে গেছে, আর অসুরশক্তি রাজসিকতার ছদ্মবেশ ধ'রে এসে ব্রাহ্মণের কাল্‌চারকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিয়েছে।

অনুশীলা বললে, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি কিন্তু আপনার কথা স্বীকারও করবো না। ক্লান্ত সভ্যতার কত আলো যুগে যুগে নিভে গেছে, কিন্তু আবার এসেছে নবীন। আমি হিন্দুর মেয়ে, জন্মতত্ব আর মৃত্যুরহস্য দুই মানি। সংহার আর সৃষ্টির নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতি বারে বারে নতুন হয়ে দেখা দিচ্ছে, সেখানে কিছুই ব'সে নেই, কিছুই ক্লান্ত নয়। আপনি হাতে ক'রে যা গড়েছেন তা যদি ধ্বংস হয়, ভয় কি? কিন্তু আপনার বাসনা আর আপনার স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যা ফুটলো, আপনার সেই ব্যক্তিপরিচয় পেয়েই ত' মানুষ নিত্যকাল তৃপ্ত। স্বয়ং ভগবান যে ধর্মরাজ্য আমাদের দেশে সৃষ্টি করেছিলেন তাও ভেঙেছে, রামরাজ্যও গুঁড়ো হয়ে গেছে। যে দিল্লীশ্বর ছিলেন স্বয়ং জগদীশ্বরের প্রতীক, আজ দিল্লীর পথের ধুলোতেও তাঁকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু তবু রয়ে গেছেন শ্রীকৃষ্ণ আর রাজা রামচন্দ্র, সম্রাট অশোক আর সম্রাট আকবর। আপনার টাকাকড়ি, জমিজমা, সহায় সম্বল নেই বলছেন? কিন্তু পৃথিবীতে বড় প্রতিভাই বড় দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হয়ে গেছে। আপনার হৃদয় আছে, আদর্শ আছে, বিদ্যা আর প্রতিভা আছে, তাই আপনার এই খ'ড়ো চালার মধ্যে ছুটে এসেছি, সারা পৃথিবীই ছুটে আসবে আপনার এই দরজায়। আপনি কোটিপতি কিম্বা চিনির কলের মালিক হ'লে আপনাকে গ্রাহ্যও করতুম না।

- বীরেশ জবাব দিল না, চুপ ক'রে রইলো।

অশুশীলা পুনরায় বললে, পরাজয় কেবল আপনার নয়, এই দুর্ভাগা গ্রামেরও, এই কথাটা বুঝতে পারলেই আপনি উঠে দাঁড়াতেন। আপনার আশ্রয় কেড়ে নিয়েছে, মাথায় আপনার প্রকাণ্ড ঋণভার, একমাত্র বন্ধু আপনাকে অগাধ জলে ভাসিয়ে স'রে পড়েছে, আপনার অন্নসংস্থান অবধি নেই—এই ত আপনার সকলের বড় সুযোগ, বীরেশবাবু? আপনার মতন এমন সৌভাগ্য পৃথিবীতে ক'জনের হয়? নিজেকে প্রবল নাড়া দিয়ে এবার আলোড়িত ক'রে তুলুন। আপনার সামনে ঝড়, দুর্যোগ, বিপদ, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা—এই হোলো আপনার সম্বল, এদের নিয়ে আপনার যাত্রা। আমরা কেউ আপনার পাশে এসে দাঁড়াবো না, বিপদের অংশ নেবো না, উৎসাহ আর সান্ত্বনা আপনার জন্যে নয়, আজ থেকে আপনার আত্মশক্তির উদ্বোধন হোক।

সমস্যা ও অসুবিধা যে সত্যকার কোথায় তা বীরেশ জানে। বললে, মানুষকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা খুব কঠিন কাজ নয়, মিসেস্ সেন?

অশুশীলা আহত দীপ্ত কণ্ঠে বললে, জানি, কিন্তু পুরুষকে উত্তেজিত করতেই আমি এসেছি। মাটি গরম হয় না, পাথরই তেতে আগুন হয়ে ওঠে। মুখে বলা খুব সহজ, কিন্তু কাজে করা খুব কঠিন ব'লেই ত এসেছি আপনার কাছে! কঠিন ব্রত আপনাকে নিতে হবে কঠিনতর তপস্যায়। এই নিরুপায় গ্রাম আমার মুখ দিয়ে আপনার কাছে ভিক্ষে চাইছে।

বীরেশ বললে, আমার লোকেরা আবার মাথা তুলবে এমন কোনো সুযোগ ওরা রাখেনি। ইতিমধ্যেই কো-অপারেটিভের টাকা চিনির কলে খাটিয়ে ওরা প্রত্যেক শেয়ারের ওপর বেশি ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করেছে। দেনায় চিরকাল ডুবে থাকতে চাষীদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা যে-কোনো উপায়ে সচ্ছল অবস্থায় থাকতে পেলেই খুশী।

তার ফল কি হয়েছে জানেন? বহু সম্পত্তি উঠেছে নিলামে, ওরা সেগুলো কিনে খাস ক'রে নিয়েছে। একদিন যারা জমির মালিক ছিল, আজ তারা সেই জমির মজুর মাত্র। মিসেস্ সেন, এর মধ্যে আদর্শবাদের স্থান কোথাও নেই, এখানে কেবল দরকার শারীরিক বলপ্রয়োগ; বন্ধুর মতন যারা পাশে ব'সে আছে, যারা টাকা দিচ্ছে, যারা নিজেদের শ্রমিকের বন্ধু ব'লে জানাচ্ছে, তারা সকলের বড় শত্রু। শোষণ করার পথ ওদের বহুবিধ,—অক্টোপাসের মতো। এক হাতে ওরা খাওয়ায়, কিন্তু বহু হাতে রক্ত শোষণ করে। চাষীদের কতকগুলো প্রাথমিক প্রয়োজন মিটিয়ে ওরা সমস্ত ধন সম্পদ চালান দিচ্ছে বাইরে,—এর প্রতিরোধ নেই।

অরুণীলা বললে, সত্যিই কি নেই?

আছে।—বীরেশ বললে, আপনার মন আবেগমুখী, নৈলে বলতুম আছে। যুগে যুগে প্রতারিত, বঞ্চিত আর উৎপীড়িতের দল যে ভাবে এর প্রতিকার করেছে, যে ভাবে নিরন্ন আর অপমানিত জনতার হিংস্র ব্যবস্থায় এই স্ফীতকায় অনাচার আর প্রবল অন্যায়ের অপমৃত্যু ঘটেছে,—তার কথা আপনাকে বলতে পারতুম। অর্থাৎ কি জানেন, নতুন সভ্যতা সৃষ্টির আগে আগে চলে প্রকাণ্ড ধ্বংস, সংহারের তাড়নায় স্তূপাকার জঞ্জাল-জটিলা মুছে চ'লে যায়,—সেই বিপ্লব কল্যাণের পথ ধ'রে চলে। হয়ত আসবে সেই তাণ্ডবের দিন।

অরুণীলা বললে, আপনি আনতে পারেন না সেই দিন?

বোধ হয় পারিনে। বিপ্লবের দরকার হয়ত ছিল, কিন্তু বিপ্লব আমি আনতে চাইনি। এই গ্রামে যারা আছে তারা সম্পূর্ণ মানুষ নয়, তারা হাড়-পাঁজরা বের করা এক অদ্ভুত জীব; এদের আগে মানুষ করতে না পারলে এরা অস্ত্র হয়ে উঠতে পারবে না। তাই ঠিক করেছি আগে এদের

লেখাপড়া শেখাবো। এরা দারিদ্র্য চিনুক, এদের অবিচার-বোধ আসুক, নিজের দেশকে জানুক। প্রথম পাঠ আগে শেষ হোক।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। সমিতির অধিবেশনে আজ তাকে প্রস্তাব উপস্থিত করতেই হবে। যত বড় নিরাশার কারণ থাকুক না কেন, চারিদিক থেকে কর্তব্যেরই আহ্বান আসছে। বীরেশ বললে, চলুন, আজ আবার একটা মিটিং আছে।

অঞ্জলীনা বললে, কালকের খবর আপনি তবে জানেন না। মিটিং যে নেই এ কথা জেনেই তবে এসেছি।

মিটিং নেই? কেন?

কর্তারা সদরে যাবেন, জেলা হাকিমের ওখানে লাঞ্চে নেমন্তন্ন। সকালে উঠে মিষ্টার সেন আগেই গেছেন। আমি এখন একা, বেকার।

হাসি মুখে বীরেশ বললে, তা হ'লে বাঁধা থেকে ছাড়া পেয়েছেন বলুন?

অনেকটা তাই বটে।—অঞ্জলীনা থমকে একটু পরে বললে, কিন্তু যা ভেবে এলুম, তা হোলো না। আশা করিনি আপনার কাছে ব্যর্থ হবো। এবার দেখছি নতুন 'হিরো'র সন্ধান করতে হবে। পরাজয়ের শোধ না তুললে চোখে ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই। আপনার অপরাধ কি, আপনিও ত সেই বাঙালী! হাউইয়ের মতো জ্বলে উঠে ছাই হয়ে মিলিয়ে যান।

অঞ্জলীনা মাথা নত ক'রে নিল। চাপা উত্তেজনায় তার মুখ চোখ রাঙা। প্রথম আসা থেকেই তার ভাবভঙ্গীতে কেমন যেন অস্থির অশান্তি,—ধৈর্য ধরার তার অবকাশ নেই, উপদেশ অথবা যুক্তি শোনার অভিরুচি নেই। আপন কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত উল্কার মতো সে যেন চতুর্দিকে বেড়াচ্ছে। তার ভিতরে ঠিক যেন বিষক্রিয়া ঘটছে।

বীরেশ বললে, বেশ, আপনি ঠিক কি চান, বলুন মিসেস সেন?

অদ্ভুত একটা আবেষ্টন বটে। ক্ষুধা তৃষ্ণার প্রশ্ন নেই, আতিথেয়তা অথবা আসনের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই,—খ'ড়ো ঘরের চালার মধ্যে ব'সে অনাত্মীয় নরনারীর অসম্ভব জল্পনা-কল্পনা। তাঁতিবৌ একবার উঁকি মেরে অতি সন্তর্পণে দেখে গেল, হয়ত তার আল্লার উদ্দেশে আর একবার প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করলো, এ-সৌভাগ্য যেন আরো কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়। কর্তা পা টিপে টিপে ঘরে এসেছে, পা টিপে টিপে স্নানাহার করেছে, এবং শ্রদ্ধা ও সম্মানের চিহ্নস্বরূপ নিজের অস্তিত্ব লোপ করার জন্য পা টিপে টিপেই নিজের ঘরটিতে দস্যুর মতো ঢুকে নিঃসাড়ে প'ড়ে রয়েছে।

জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রের তাপে অনুশীলার সুন্দর মুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছে। অস্নাত রুক্ষ চুলের রাশির মধ্যে গত রাত্রির প্রসাধনের মৃদুমদির সৌরভ তখনো নিঃশেষ হয়নি। কপালে,—চুলের গোড়ায় আর গলায়—ঘামের ধারা নেমেছে। সন্তানের মা সে আজও হয়নি, তরবারীর ফলকের মতো কঠিন তার দেহের বাঁধন। বীরেশ তার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নত ক'রে নিল।

অনুশীলা বললে, মিস্টার সেন একদিন আপনার কাছে একটা প্রস্তাব করেছিলেন, সেদিন সে কথা আপনার কানে যায়নি। আমিও আজ সেই কথা আপনাকে বলবো। আপনি একেবারে রিক্ত হননি।

মুখ তুলে বীরেশ বললে, কি বলুন ত?

আমার আদেশ, আপনাকে আর একটা দুরন্ত জীবনের মধ্যে ঝাঁপ দিতে হবে। বীরেশবাবু, আমার স্বামী হলেন সরকারী কর্মচারী, বাঁধা নিয়ম আর ব্যবস্থার পাকা রাস্তায় তাঁর প্রত্যেকটি দিন ছক-কাটা। আজ থেকে ছ'মাস পরে তিনি কি করবেন আমি জানি, দশ বছর বাদে আমরা কি ভাবে থাকবো তাও নির্দিষ্ট। কিন্তু আপনি নতুন, আপনি বিচিত্র! আপনার বাঁধন নেই, ভীষণ একটা মুক্তিতে আপনি ভয়ঙ্কর। আপনার

কাছে নেমে আমি ভয়ানক মার খেলুম। আমার সেই পরাজয়ের গ্লানি আপনার সাহায্যেই মুছে ফেলতে চাই। আমি সাহায্য করবো আপনাকে,—প্রকাণ্ড প্রচণ্ড শক্তি আপনার মধ্যে সঞ্চার করবো! আমার হাতে আপনি নিষ্ঠুর অস্ত্র হয়ে উঠবেন। আর সেই অস্ত্রে চূর্ণ করে দেবো ওদের ষড়যন্ত্র।

বীরেশ বললে, বলুন, কি করতে হবে, আমাকে?

অঙ্গশীলা বললে, আসুন আমার সঙ্গে।

কোথায় যাবো?

যেখানে আমি পাঠাবো। অন্যায়ের পথও যদি হয়, প্রতিবাদ করবেন না। আপনার শক্তি আর সাধ্যকে আমি চিনি, সুতরাং আমাকে বিশ্বাস করুন। আসুন—ব'লে অঙ্গশীলা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

রহস্যময়ীর নির্দেশের কোনো প্রতিবাদ বীরেশের মুখে এলো না। উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, এত রোদে যেতে আপনার কষ্ট হবে না।

সঙ্গে পাল্‌কি আছে। আসুন।

এমন সময় তাঁতীবৌ গুড়ি-গুড়ি এসে সহসা ঘরের চৌকাঠে মাথা রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। শশব্যস্তে বীরেশ বললে, ওকি, কি হোলো তোমার, তাঁতী-মা?

কান্না আর থামে না।

হাকিমের স্ত্রী এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ। চট্ ক'রে অঙ্গশীলা এগিয়ে এসে তাঁতীবৌর হাত ধরে তুললো। বললে, খুব খুশি হয়েছি, খুব আনন্দ পেয়ে গেলুম। কই, কি আনবে আনো, খেয়ে যাই।

তাঁতীবৌ উঠে আনন্দে গদগদ হয়ে তার ঘরের দিকে চ'লে গেল। অঙ্গশীলা বললে, বুঝতে পারেননি ত? ওরা কেঁদে আনন্দ প্রকাশ করে,

মনে করে সব সময়ই বুঝি ওরা অপরাধী। ওদের ঘরে কিছু খেয়ে গেলে তবেই ওদের ভয় কাটে।

দুখানি থালায় কয়েকখানি বাতাসা আর এক ঘটি জল এনে তাঁতীবৌ হাজির করলো। বাতাসা তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে অনুশীলা আর বীরেশ জল পান করলো। তাঁতীবৌ আর একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পথ ছেড়ে দাঁড়ালো।

যাবার সময় তাঁতীবৌর কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে অনুশীলা বললে, আর একদিন এসে গল্প ক'রে যাবো, কেমন তাঁতী-মা? আজ চললুম।

ওরা চলে গেল। তাঁতীবৌ পথের ধারে দাঁড়িয়ে আঁচলে আনন্দাশ্রু মুছে বিড় বিড় ক'রে বললে, আমার মুন্নি আর রহমন।

মাথার উপরে প্রচণ্ড মাঠের রোদ। এ বছরে এখনও বৃষ্টির চিহ্নমাত্র নেই। রোদের তাতে মাঠের বীজ পর্যন্ত জ্বলে গেছে। ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের রব উঠেছে। অথচ গত বছরে অতিবৃষ্টির ধাক্কা এখনো কেউ সামলে উঠতে পারেনি। গ্রামের দুর্দিনের চেহারা কেমন, সে অভিজ্ঞতা বীরেশের হয়েছিল।

সমস্ত পথটা অভিভূতের মতো বীরেশ চললো। মাঝে মাঝে ঘূর্ণী হাওয়ায় ধুলো উড়ে চলেছে, কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। চুম্বকশক্তির গল্প সে শুনেছে। ডুবো জাহাজকে অগাধ সমুদ্রের নিচে থেকে চুম্বকের দ্বারা কেমন করে টেনে আনা হয়, সে সংবাদও তার জানা ছিল। অনুশীলার ব্যক্তিত্ব তাকে আবৃত করে আচ্ছন্ন ক'রে টেনে নিয়ে চললো আপন খেয়ালের পথে। উদ্দেশ্য একটা আছে, কিন্তু সেটা এখনও প্রকাশ পায়নি। এ নলিনী নয় যে, অন্যের রুচি আর স্বাতন্ত্র্যের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। নলিনী হ'লে তার বিপদে আর দুঃখে অংশ গ্রহণ করতো, কল্যাণ হস্ত প্রসারিত ক'রে সেবা করার

স্তব্ধ বসে থাকতো ; তার নিরাশায়, তার লাঞ্ছনায়, তার বেদনায় গোপনে অশ্রুপাত করতো এবং তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্ত টেনে বার করতো মহাকবিদের কাব্যগ্রন্থ। তার ছিল মধুর কবিতা, রস-কল্পনা, ছিল তার মধ্যে বেদনা-ব্যাকুল সঙ্গীত, ছিল অনন্ত সৌর নক্ষত্রলোকের স্বপ্ন রচনা। নলিনী দেখায় ফুলের সৌন্দর্য, অরুণীমা ফলের অমরতা। নলিনী তার করুণ মধুর গানে জীবনে বৈরাগ্য আনে, অরুণীমা রণ-দামামার শব্দ তুলে যুদ্ধযাত্রার পথ দেখায়। নলিনী ঘরে ডেকে আনে কল্যাণীর করুণ সেবায়, অরুণীমা ঘর থেকে টেনে এনে অনাবিষ্কৃত দুর্গমের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নলিনী হোলো মলিন শান্ত সন্ধ্যা-তারকা, অরুণীমা হোলো চঞ্চল উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড। একজন হোলো মধুর বিরতি, আর একজন প্রবল অগ্রগতি।

বাংলোয় তারা যখন এসে পৌছালো, বেলা দুটো বাজে। গাড়ি থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে অরুণীমা এসে নিজের হাতে ড্রয়িং রুমে বেতের চেয়ার এগিয়ে দিল। অনিল এখনও আসেন নি। জানালা দরজা সকাল থেকে বন্ধ ছিল, ড্রয়িংরুমের ভিতরটা স্নিগ্ধ শীতল। এ বাড়ীতে বীরেশ অতি প্রিয়, আজ দুমাস পরে তা'কে পুনরায় আসতে দেখে পাচক, বেয়ারা, আয়া—সকলের মুখেই হাসিখুশি। বীরেশ এসে কেদারায় বসবার সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারা গিয়ে সোৎসাহে টানাপাখা টানতে লাগলো। মিষ্ট মধুর হাওয়ায় পরিশ্রান্ত বীরেশ চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে আরাম ক'রে বসলো। এ বাড়ী তার নিতান্তই পরিচিত।

নিজের হাতে অরুণীমা তরমুজের সরবৎ তৈরি ক'রে আনলো। মাথায় ঘোমটা আর পায়ে জুতো নেই, এমন অবস্থায় সে আর কারো কাছেই আসতো না। হাকিমের স্ত্রী ব'লে আর যেন চেনা

যায় না ; বেণী দুলিয়ে সে কুমারী হরিণীর মতো লঘু বিসর্পিত গতিতে বেরিয়ে এলো ! বীরেশের হাতে গেলাস দিয়ে সে তার পাশে ব'সে পড়লো ঝুপ ক'রে। বললে, খেয়ে দেখুন ত, বোধ হয় ভালো হয়নি। মুখে খুব বক্তৃতা দিতে পারি, কিন্তু কাজে আমি একেবারে নভিস্‌। আমার জল কিন্তু খুব ঠাণ্ডা, বরফের মধ্যে কলসী বসানো থাকে। ওকি হাসছেন যে ?

পাচক আর এক গ্লাস শরবৎ এনে অঞ্জলীলার হাতে দিয়ে গেল।

বীরেশ বললে, জল আপনার ঠাণ্ডা, কিন্তু রক্তটা ভারি গরম ! গত চার বছরে ভাবতেই পারিনি যে, আপনি একজন পাকা বক্তা। এই দেখুন সকালে আমার মনে যে নিরাশা ছিল, এখন যেন সেই মেঘ কেটে গেছে। অন্তত মানসিক জড়তা কাটিয়ে উঠে বসতে পেরেছি মনে হচ্ছে। শাস্ত্রে বলে, মেয়েরা শক্তি। এবার থেকে শাস্ত্রে বিশ্বাস করতে হবে দেখছি।

হয়েছে থামুন।—অঞ্জলীলা বললে, চার বছর ধ'রে আপনি আমাকে গ্রাহ্যও করেন নি, আমলও দেন নি। আপনার মুখে স্তুতিবাদ শুনলে আমার ভয় করে।

ভয় ? কেন ?

মেয়েদের স্তুতিবাদ যারা করে তারা কবি। তারা অলস। তারা ফুরফুরে হাওয়ায় কবিতা খুঁজে বেড়ায়, কাজ করে না। আপনি বরং এন্টি-ফেমিনিস্ট থাকুন, তা'তে বেশি কাজ হবে।

হাসিমুখে বীরেশ বললে, বেশ ত, এবারে কাজের কথাই বলুন। দেখা যাক, নিয়ো-ফেমিনিস্ট হয়েও আমার দ্বারা কাজ হয় কি না।

হবে নিশ্চয়ই—দাঁড়ান্‌, আগে আপনার স্নানাহারের ব্যবস্থা ক'রে

দিই।—এই ব'লে হেসে সমস্ত ঘরের হাওয়া তরঙ্গদোলায় দুলিয়ে অনুশীলা চ'লে গেল।

এর কতক্ষণ পরে দুজনে স্নান ক'রে মাথা আঁচড়ে এসে খাবার টেবলে বসবে এমন সময় হাকিম সাহেব সহসা এসে হাজির হলেন। আনন্দে কলরব ক'রে উঠে তিনি বললেন, তপস্যা করেও যাকে দুমাস পাওয়া যায়নি, সে একেবারে ট্রেসপাস ক'রে বসলো, এ ত' সহজ কথা নয়! কোন্ মন্ত্রের গুণ?

হাসিমুখে বীরেশ অনুশীলাকে দেখিয়ে বললে, বুঝতেই পারছেন।

অনুশীলা বললে, আজকাল মন্ত্রের আর দরকার নেই। তুড়ি দিলেই আসে এখনকার ছেলেরা। দুমাস খবর নিইনি, আজ ঘুষ দেবার লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছি।

অনিলবাবু বললেন, আনতে পেরেছ তা হলে, বলো?

না এসে যাবেন কোথায়? তাঁতীবৌ কো-অপারেটিভ সাবান বোঝে না, তাঁতী কর্তা ইকনমিকস্ পড়েনি। একমাত্র বন্ধু—শ্রীমান রজনী,— সেও পালিয়েছে আইডিয়ালিজমের দাপটে; গাঁয়ের লোক ব্যাপক্যাল্ নয়, এ অবস্থায় মানুষ বাঁচবে কি নিয়ে?

বীরেশ হাসিমুখে বললে, হয়েছে আপনার? এবার কিন্তু আমার পালা। আমি না হয় বেকার, না হয় একঘরে। আর আপনি? সকাল বেলায় স্বামী রায় লিখতে যান, পাচক রান্না করে—আপনার কোনো কাজ নেই। বাজে নভেল প'ড়ে আপনার দুপুর বেলা কাটে না। বিকেলে স্বামী আসেন বটে কিন্তু তারপরে আছে ওঁর ক্লাব। আপনার ফ্যাশন-সেক্টর নেই, সিনেমা নেই,—সম্প্রতি আবার আপনি আনপপুলার —আপনার নিজের কি নিয়ে কাটে বলুন ত? একটি সখী নেই, একা বেকার থাকার কোনো অবলম্বন নেই। সুতরাং আমাকে ধরে এনেছেন আপনি নিজেরই দরকারে।

তাদের বিবাদ অনিলবাবু মিটিয়ে দিলেন। বললেন, আর কিছু নয়, তোমাদের দুজনের জন্যেই আমি দুঃখিত। বুঝতে পারা যাচ্ছে দুজনেই বেকার এবং একজনকে নৈলে আর একজনের চলা কঠিন।

চাকর এসে অনিলের হাতের কাছে শরবতের গ্লাস রেখে চ'লে গেল। অনুশীলা বললে, অতএব হে কর্মবীর, এবার ভোজনপর্ব আরম্ভ ক'রে আমাদের কৃতার্থ করুন। বেশ, সবই আমার দোষ, আমারই সব প্রয়োজন, অপরাধও যা কিছু সব আমার। বাংলা দেশে মেয়ে হয়ে জন্মেছি, এর চেয়ে অন্যায় আর কি হ'তে পারে?

তথাস্তু।—ব'লে হাসিমুখে বীরেশ খেতে ব'সে গেল।

আজ অনিলের আনন্দের আতিশয্য অল্প নয়। শরবতের গ্লাসে দুই চুমুক দিয়ে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, বললেন, যাই বলোনা ভাই বীরেশ, দেশের লোকের কাছে হেরে গিয়ে তুমি রাগটা তুললে আমাদের ওপর। এ অঞ্চলে দুমাস তুমি পদার্পণ করোনি।

প্রায় চার বছর হ'তে চললো, অনিলবাবু কোনোদিন বীরেশকে 'তুমি' ব'লে ডাকেন নি। আজ সহসা নিকট সম্পর্কের এই সম্ভাষণ শুনে সে একটু সচকিত হোলো। কিন্তু এমনি আকস্মিক ও এমনি সহজ যে, কিছু মনে করবার অবকাশ রইলো না। তার মুখের চেহারায় অনুশীলা তৎক্ষণাৎ সেটা অনুভব করতে পারলো, একটু অস্বস্তিবোধ করলো, কিন্তু গায়ে না মেখে সে মাথা নীচু করেই খেতে লাগলো। এ বাড়ীতে বীরেশের আসন লঘু নয়, এখানে বন্ধুত্ব অপেক্ষা সম্মানের আসনই প্রধান।

বীরেশ বললে, মন্দ কি, অজ্ঞাতবাস করলে যদি শক্তি সংগ্রহ করা যায়, আপত্তি নেই ত?

অনিল বললেন, বেশ, তাহ'লে আশা করছি ভবিষ্যৎ কুরুক্ষেত্রটা মন্দ জমবে না। তোমার প্ল্যানটা কেমন হবে একটু বর্ণনা করো শুনি।

অনুশীলা আসল কথাটা এইবার পাড়লো। মুখ তুলে বললে, সেই জন্যেই ওঁকে এখানে ধরে আনা। উনি নতুন কাজে নামতে চান, আমরা যেন ওকে সব রকমে সাহায্য করতে পারি। এই দেশ ছেড়ে উনি কোথাও যেতে রাজী নন্। আমরাই বা ওঁকে যেতে দেবো কেন?

অনিল বললেন, কিন্তু আমাদের যদি বদ্‌লি হয়ে যেতে হয় কোথাও?

সে পরের কথা। যদি যাই, জেনে যাবো এই গ্রামের মাটি আমাদেরই। যেখানে কাজ করেছি, যেখানে ব'সে স্বপ্ন দেখেছি, যে মাটি আমাদের কাঁদিয়েছে, আনন্দ দিয়েছে, সেই মাটিই আমাদের মাতৃভূমি। বদ্‌লি হ'লেও এ গ্রাম আমাদেরই থাকবে।—অনুশীলা বলতে লাগলো, সুতরাং এই অঞ্চলেই বীরেশবাবুর কর্মক্ষেত্র, ওর ভাগ্য এখানেই বাঁধা। তুমি চাওনা হাকিম, ওর খুব উন্নতি হোক?

স্ত্রীর মুখে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য দেখে অনিল সহসা হেসে উঠলেন,—কী আশ্চর্য, কোনদিন কি তোমার মনে হয়নি যে, আমি ওঁর উন্নতিই চাই?

বীরেশ উস্‌খুস্‌ ক'রে কি যেন বলতে গেল, অনুশীলা বাধা দিয়ে বললে, চুপ করুন আপনি।—আচ্ছা, উন্নতিই যদি তুমি চাও, তুমি এই দুমাস ওঁকে ডাকলে না কেন?

অনিল বললেন, তুমি ত দেখি দুমুখো সাপ! আমি ওঁকে ডাকবো ওঁর উন্নতি করে দেবার জন্যে? আমি কি বীরেশের অভিভাবক? এ যুক্তি কেবল বাঙালী মেয়ের মুখেই শোভা পায়।—হাকিম মুখভরা হাসি হাসতে লাগলেন।

বীরেশের মুখচোখ রাঙা হয়ে উঠলো। গত চার বছরে এই ক্ষুদ্র পরিবারটির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় আর অন্তরঙ্গতা হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য অনেকখানি অনাত্মীয়া নারী স্বামীর

কাছে অভিযোগ জানাচ্ছে, এ দৃশ্য অভিনব বটে। এই আগ্রহাতিশয্য পুরুষের পক্ষে লজ্জার বিষয়, বলাই বাহুল্য। তার নিজের শক্তির উপর তার বিশ্বাস অপরিসীম, কিন্তু এই নারী সেই বিশ্বাসের মূলকে যেন শিথিল ক'রে দিচ্ছে।

অনিল বললেন, তুমি ত জানো অত্র, অযোগ্যের আর অলসের স্থান কোথাও নেই। আমাদের স্বভাবের মধ্যে আছে আদিম দুর্বলতা; সহজে কার্যোদ্ধার, পরিশ্রমে ফাঁকি, কৌশলে বাজীমাৎ—এই সব হোলো আমাদের প্রিয়। আমরা কাজ করিনে, অধিকার দখল করতে ভয় পাই, আমাদের অক্ষমতা ডিঙিয়ে যদি কেউ ভাগ্য ফেরায় আমরা তাকে ঈর্ষা করি, সুবিধে পেলে শত্রুতা করি। আমরা মাস্টারী ফলিয়ে বেড়াই, যদি কেউ আমাদের বিদ্যে বুদ্ধির অসারতা দেখিয়ে দেয়, আমাদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগে, তাকে তেড়ে মারতে যাই। আজ সমস্ত দেশ যখন সত্যি সত্যি শিক্ষায় আর সভ্যতায় আমাদের চেয়ে এগিয়ে চলেছে, আমাদের আহত আত্মাভিমান আর অপমানজনক অযোগ্যতা আর কিছু না পেয়ে তাদের গায়ে কাদা ছুঁড়ে মারছে, আর নিজেরই নির্লজ্জ ঈর্ষাকে অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে চেঁচাচ্ছে, প্রাদেশিক বিদ্বেষ! তুমি ত দেখতে পাচ্ছ কোথাও সৎবুদ্ধি নেই, কল্যাণচিন্তা নেই, প্রাণকে বড় ক'রে তোলবার কোনো স্বপ্ন নেই,—আমাদের সকলের মধ্যে নৈরাশ্যের কালোছায়া। আমি যদি বীরেশকে ডেকে তার উন্নতি আর ভবিষ্যতের কথা বলতে যেতুম, সেটা বাঙালী গোষ্ঠীপনার গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতা বলে মনে হোতো। আমি ওকে হাতে ধরে কাজ করাবো তবে উনি করবেন—এ কোনোকালে সম্ভব হয়? বিলেত থেকে বছরে কুড়ি হাজার ছেলে-মেয়ে পালিয়ে যায়, তারা জগতের নানা দেশে ছড়িয়ে প'ড়ে কাজ করে—একদিন স্বদেশে ফিরে আসে বিজয়ীর বেশে। যারা সত্যি কাজ করে তারা সুপারিশের অপেক্ষা

রাখে না, লাঠি খেয়েও হাটে না। যাই হোক, আজ আমি কথা দিচ্ছি—বীরেশ যদি কোনো কাজ আরম্ভ করে, আমি সেই কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করবো।

আহারাদির পরেও টেব্‌ল ছেড়ে উঠবার উৎসাহ তাদের দেখা গেল না। ড্রয়িং রুমের ঘড়িতে বেলা চারটে বাজলো।

অরুণীলা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, শুনেছ, বীরেশবাবু নাকি একটা শিক্ষা-পরিকল্পনা নিয়ে আজকাল ব্যস্ত। আমের আঁটি পুঁতে গাছ গজিয়ে বোল ধরিয়ে ফল পাকিয়ে রস খাইয়ে তবে উনি ছাড়বেন।

তার বলার ভঙ্গীতে বীরেশ আর অনিলবাবু হেসে উঠলেন। বীরেশ বললে, মন্দ কি? মূল ধরে চিকিৎসা।

অরুণীলা বললে, কিন্তু আঁটি পেলেন কোথায়? শুনুন, আঁটিটাই হোলো শক্তি। সেই শক্তি আপনার হাতে না এলে না হবে শিক্ষাপ্রচার, না হবে গ্রামের কাজ। যে ব্যবস্থা আপনার জন্যে করা হয়েছে তারই জন্যে আজ আপনাকে ডেকে আনা। আমার ভাই ললিতবাবু কিছুকাল আগে ফিজিক্‌স্ আর কেমিষ্ট্রিতে বিলেতী টাইটেল এনেছেন, তিনি মেটালর্জি আর মিনারালজিতে একজন এক্‌স্পার্ট, তিনি সুচিয়ার ওপারে চন্দন পাহাড়ের জঙ্গলে কাজ করতে চান্‌, তার সঙ্গে আপনাকে কাজে নামানো হবে। রাজি আছেন ত?

বীরেশ মুখ তুলে তাকালো। বললে, অনেকদিন আগে আপনারা না একবার বলেছিলেন এই কথা?

হ্যাঁ, অনেকদিন আগে, যখন এই গ্রামে প্রথম এসেছিলেন।

অনিলবাবু বললেন, চন্দন পাহাড়ের জঙ্গলটা কোনো জমিদারের অধীন নয়, গভর্ণমেন্টের খাস। মাইলের পর মাইল জঙ্গল আর পাহাড়। আগে জন্তু-জানোয়ার বহু ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। ওখানকার জঙ্গলে

এক রকম বাষ্প তৈরী হয়, সেটা নাকি বিষাক্ত। হরিণ, শুয়োর, এরা টেঁকতে পারে না। ছোট ছোট নালা আছে, সেগুলো বর্ষায় নদীর মতন হয়, আর তার জল থেকে তেল, ধাতু, গ্যাস—বিভিন্ন বস্তুর উদ্ভব হয়। অনেকে সন্দেহ করে পাঁচ হাজার বছর আগে ওখানে ছোটোখাটো একটা ভল্‌ক্যানো ছিল। লোহার ওরস্‌, তামার ইন্‌গ্রেডিয়েন্ট এবং আরো যেন কি কি—এসব পাওয়া যায়। সব দিক ভেবে দেখছি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনেক আছে।

বীরেশ বললে, ললিতবাবু ওখানে কী কাজে নামতে চান্‌?

প্রথমটা তিনি রিসার্চ করবেন কিছুদিন। তারপর কাজে নামতে চেষ্টা করবেন।

গভর্ণমেণ্ট রাজি হবেন কেন?

অঞ্জলীলা বললে, গভর্ণমেণ্ট মানে অনিল সেন আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। যদি অনিল সেন চেষ্টা-চরিত্র করেন তাহ'লে কালেক্টর বাধা দেবেন না ব'লেই বিশ্বাস।

অনিলবাবু হেসে বললেন, না গো না, সরকারী কর্মচারী ব'লে অনিল সেন একেবারে অমানুষ নয়। তোমার ভায়ের ভাগ্য যদি ফেরে আমার চেষ্টায়, তবে আমিও ত কমিশন কিছু পাবো। কিন্তু ললিতের টাকা কোথায়? গভর্ণমেণ্টের হাত থেকে ইজারা নিয়ে কাজকর্ম আরম্ভ করতে গেলে প্রথমেই অন্তত পাঁচ হাজার টাকা দরকার। তার চিঠিতে বুঝলুম, তার হাতে টাকা নেই।

অঞ্জলীলা বললে, বেশ ত, বীরেশবাবুর হাতে হাজার কয়েক টাকা আছে আমি জানি, তাই নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দাও?

বীরেশ হতবুদ্ধির মতো এই বিচিত্র স্ত্রীলোকটির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। সে একেবারে নিঃস্ব, একটি কানাকড়িও তার হাতে নেই।

এই কল্পনাপ্রসূত হাজার কয়েক টাকার কথায় সে ভাবলো, এ বুঝি অরুণীমার পরিহাস। কিন্তু পরিহাস তার মুখে চোখে নেই! মুখ তার কেবল গম্ভীর নয়, প্রখর বিষয়বুদ্ধি আর দায়িত্ববোধে সে-মুখ চিন্তাপ্রবণ। কিন্তু যা সত্যি নয়, যা ভিত্তিহীন—তার প্রতিবাদ করার জন্য বীরেশ উন্মুখ হয়ে উঠতেই অরুণীমা তাকে থামিয়ে দিল। বললে, আগে স্বামী স্ত্রীর কথা হোক, তারপরে আপনার বক্তব্য শুনবো।

বীরেশ নির্বোধের মতো থেমে গেল।

অনিলবাবু বললেন, তোমার বাবার সম্পত্তির এখনো ভাগ হয়নি। কোম্পানির কাগজ যা কেনা আছে তা এখন বিক্রি করা চলছে না। তা ছাড়া পাঁচ ভায়ের মেজাজ পাঁচ রকমের। ললিতের অংশের টাকাকড়ি এখন অগাধ জলে। অথচ এদিকে বীরেশের নামে গভর্নমেন্ট লীজ দেবে না, ওকে সন্দেহ করে। আমার নিজের নামেও হবে না, আমি সরকারী লোক। বীরেশ যদি ললিতের নামে বেনামী কারবার করে তাহ'লে ললিতের অন্য ভাইরা একদিন এই কারবারের উপর দাবি জানাতে পারে, কারণ, বিষয় এখনো ভাগ হয়নি। বরানী বীরেশকে ছেড়ে গেছে, তাকেও আর বিশ্বাস করা চলবে না। সুতরাং বাধা অনেক।

টেব্‌ল ছেড়ে অরুণীমা উঠে দাঁড়ালো। বললে, কিন্তু তবু এই কাজ আরম্ভ করতে হবে, হাকিম। পৃথিবীসুদ্ধ এসে যদি পথ আটকে দাঁড়ায়, পৃথিবীকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।···তোমরা পুরুষ হয়ে পথ দেখতে পাওনা, আমি মেয়ে হয়ে সহজ বুদ্ধিতেই পথ চিনতে পারছি।

তোমার পথ যদি সুগম না হয়?

তাহলে দুর্গমেই যেতে হবে।—বীরেশের দিকে আঙুল দেখিয়ে অরুণীমা বললে, এই শক্তিকে তুমি বসিয়ে রাখতে চাও, হাকিম?

সাত সমুদ্র যে জয় করতে পারে, তাকে খেয়া নৌকো চালাতে হ'লে ক্ষতি কার? তোমার, আমার, সারাদেশের। ওর সামনেই বলব তোমাদেরের কথা। রাজার মতো প্রজা পালন করতে যার জন্ম, সে এই গ্রামে বসে গোরু চরাবে? অসম্ভব। তোমরা কাকে যদি না নামো, আমি নামবো আজ থেকে। মেয়ের আঁচল ধ'রে থাকবে তোমরা,—এই হোলো এত বড় বাঙ্গালী জাতির পরিণাম? পুরুষের পায়ে হাত বুলিয়ে পরাশ্রিতের মতন থাকবো, এই কি আমাদের নিয়তি? অসম্ভব। আমরা বহুকাল ধ'রে নিচে নেমেছি, তোমাদেরও টেনে নামিয়েছি অগাধ নিচে। মা হয়ে বেঁধে রেখেছি, বোন হয়ে পথ আগলেছি, স্ত্রী হয়ে পায়ে প'ড়ে কেঁদেছি, তাই তোমাদের এত অধঃপতন, এত নিষ্ক্রিয়তা—এই অবরোধ ভেঙে দাও!...সুচিত্রা পার হতে গিয়ে যদি নৌকো না পাই, আমি সাঁতরে যাবো ওপারে। যদি দিনের আলোয় লোকে যেতে না দেয়, রাত্রে পালিয়ে যাবো ঘর ছেড়ে। তুমি জানোনা হাকিম, কী অপমানে এই দেহের কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠেছে, কী লজ্জার পাঁকে ভরে উঠেছে এই দেহের ঘট। একদিন অহঙ্কার ক'রে বীরেশবাবুর কাছে বেরিয়ে পড়েছিলুম, মনে করেছিলুম মায়ের হুকুম সবাই মানবে, মায়ের পতাকার নিচে সবাই বুঝি এসে জড়ো হবে! কিন্তু তা হয় নি, মায়ের প্রভাব ধ্বংস হয়ে গেছে, মায়ের দাম ফুরিয়ে গেছে। কেন জানো? আমরা নিজের মর্যাদা রাখিনি, কেবল অজ্ঞান আর মিথ্যের ধোঁকায় ভুলিয়েছি তোমাদের। অন্ধ বাৎসল্যে তোমাদের মুগ্ধ করেছি, স্নেহের প্রশ্রয়ে তোমরা হ'য়ে উঠেছ কাপুরুষ। দেশের সাহিত্য, দেশের শিক্ষা, দেশের সমাজ—সর্বত্র এই নিষ্ফল মাতৃত্বের অত্যাচার। আজ অপমান ক'রে তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—তার কণ্ঠে জ্বালা আছে, কিন্তু বেদনা নেই। তাদের অসম্মান করার ভেতর দিয়ে নিজের ফাঁকিই আমি ধ'রে

ফেলেছি। এবার সব ভেঙে দাও, সব ব্যবস্থা উল্‌টে দাও। আজ থেকে নতুন ক'রে আবার সব সৃষ্টি হোক।

অগ্নিশিখার মতো জ্বলতে জ্বলতে অনুশীলা অন্দর মহলের দিকে চলে গেল।

বিমূঢ় বিস্ময়ে স্তব্ধ অভিভূতের ন্যায় বীরেশ কতক্ষণ ব'সে রইলো তার নিজেরই জ্ঞান ছিল না। সহসা বাহিরে আকাশে নববর্ষার গুরু গুরু ঘন ঘোষণায় তার চমক ভাঙলো। অখিলবাবু তাঁর পেশকারের আহ্বানে কতক্ষণ আগে ওদিককার মহলে লাইব্রেরী ঘরে চ'লে গেছেন। সম্মুখের প্রাঙ্গণে কালো মেঘের অন্ধকার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। এক ঝলক স্নিগ্ধ হাওয়া তার চিন্তান্বিত ক্লান্ত ললাটের ওপর দিয়ে ব'য়ে গেল। গা ঝাড়া দিয়ে সে উঠবে এমন সময় ছায়াচারিণীর মতো অনুশীলা এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে অতি সন্তর্পণে কাছে এসে দাঁড়ালো। পেয়ালাটা টেবিলের উপর রেখে সে বললে, আপনার কি বলবার আছে, বলুন?

তার চোখে মুখে আগেকার সেই বিদ্রোহ আর নেই। যেন অতি কোমল, যেন ওই দূরের জলভারানত মেঘের মতোই স্নিগ্ধ, সকরুণ। বীরেশ মুখ তুলে এই আশ্চর্য নারীর অপরূপ লাবণ্যের দিকে কিয়ৎক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর নিজের সলজ্জ মুখ নত ক'রে কম্পিত কণ্ঠে বললে, কিছু বলবার নেই, মিসেস্ সেন।

অনুশীলা বললে, টাকা আপনার নিশ্চয়ই আছে। হাকিম একটা ইন্‌সিওর করেছিলেন, তার দরুণ হাজার তেরো টাকা আমার আছে, সেই টাকায় আপনি কাজ আরম্ভ করবেন, জমির লীজ আমি নেবো নিজের নামে। তারপর আপনার নামে ট্রান্সফর্ করে দেবো।

সবিস্ময়ে বীরেশ বললে, আপনার সহোদর ভাইকে বাদ দেবেন ?

ছোড়দা হবেন আপনার কোম্পানীর সায়েন্টিস্ট।

কিন্তু এতে আপনার স্বামী অবশ্যই আপত্তি করবেন।

আমার স্বামীকে আপনি এখনও চেনেন নি, মিস্টার চৌধুরী।

বীরেশ বললে, কিন্তু সহোদর ভাইয়ের স্বার্থ আপনি আমার জন্যে বলি দেবেন ?

আপনি বুঝি আর একবার সুখ্যাতি শুনতে চান ? তবে শুনুন।— অঞ্জলীলা বললে, ছোড়দা ভালো ছেলে, উচ্চশিক্ষিত, কেরিয়রিস্ট,— কিন্তু প্রতিভা নয়। প্রতিভা যদি নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে অন্যের কিছু ক্ষতিও করে, সেও সইবে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় প'ড়ে প্রতিভার অপমৃত্যু সইবে না। এ কাজে আপনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আর স্বাতন্ত্র্য থাকুক, এই আমি চাই।

উচ্ছ্বসিত বীরেশ এইবার সহসা জড়িত ভগ্নকণ্ঠে ব'লে উঠলো, আপনার এই ঋণ···এই কৃতজ্ঞতা শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মিসেস্ সেন।

খুবই সম্ভব,—অঞ্জলীলা এদিক ওদিক চেয়ে বললে, হাকিম তখন আপনাকে 'তুমি' বলে ডাকছিলেন, আমিও যদি সেই সম্ভাষণ নিয়ে কাছে আসি, সে অধিকার কি তুমি দেবে না ?···তুমি ত আমার চেয়ে বয়সে খুব বেশি বড় নও, বীরেশ ?—এই বলে কম্পিত ডান হাতখানা বাড়িয়ে সে বীরেশের মাথার চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে লাগলো।

উন্মত্ত স্নেহাশ্রুতে বীরেশের মুগ্ধ দুই চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এলো। নত মস্তকে সে বললে, তুমি অন্যের স্ত্রী, তোমার কতটুকু অধিকার আমি জানিনে। বয়সে আমি হয়ত কিছু বড়, কিন্তু তোমার মহিমা

আর উদারতার কাছে আমি আজ অনেক ছোট হয়ে গেলুম অনুশীলা।

প্রাঙ্গণে প্রান্তরে তখন নববর্ষার ঝরো ঝরো ধারা নেমেছে।

উদ্যোগপর্বের প্রথম বছরে অনিল সেনকে যথেষ্ট সাহায্য করতে হয়েছিল। অনুশীলা রইলো স্বামীর পাশে পাশে। অবস্থা-বৈগুণ্য সে স্বীকার করেনি। গভর্ণমেন্টের দলিলপত্র তৈয়ারী ব্যাপারে নিজের নামটাই সে সর্বত্র চালিয়েছে। স্বামী হলেন হাকিম, একটা মহকুমার কর্তা,—এমন স্বামীকে কর্মক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে ব্যবহার ক'রে নেওয়া অনুশীলার পক্ষে কঠিন হয়নি। আইন-কানুনের জন্য চেহারা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার তার নেই, সে বুঝতেও চায় না,—কিন্তু নিজের স্বার্থটা ষোলো আনা বোঝে। টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সে পালন করেছে বর্ণে বর্ণে, কিন্তু সাধারণ মেয়ের মতো তার মন ভাবাবিল নয়, অন্ধের মতো টাকা ঢেলে দিয়ে বীরেশকে সে মুগ্ধ করতে চায়নি। ভেবে চিন্তে হিসাব নিকাশ ক'রে স্বামীর সঙ্গে সকল প্রকার আলাপ আলোচনার পর বীরেশকে সে কারবারে নামিয়েছে। সেই কারণে কারবারের বনিয়াদটা হয়েছে পাকা। বাঙালীসুলভ অস্থির মতির আকস্মিক উচ্ছ্বাসের চোরাবালীর উপর বীরেশের কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দেবীপুর গ্রামে তাদের যে-পরাজয় ঘটেছে, ভবিষ্যতে সেই প্রকার ব্যর্থতার কোনো সম্ভাবনা থাকে, এমন কোনো ছিদ্র, এমন কিছু দুর্বলতা অনুশীলা রাখেনি। স্বামীর দুইজন বিশেষ উকিল বন্ধু এবং বীরেশকে সামনে রেখে এর পর পাকা ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে। যেমন তেমন ক'রে গাছ পুঁতলে ফুল ফোটে না। ফুলগাছে

ফুল একদিন অবশ্যই ফুটবে, কিন্তু গাছ পোঁতার কাজটা ভালো হওয়া চাই। অনুশীলার লক্ষ্য ছিল সারবান মৃত্তিকার দিকে। উপযুক্ত জল সেচনে সে মৃত্তিকা প্রাচীন বয়সে ফলবতী হবে কিনা, এই হিসাবটা সে নির্ভুল ক'রে নিয়েছিল।

দ্বিতীয় বছরের মাঝামাঝি উত্তীর্ণ হ'তে চললো। প্রথম বছরের খরচের মাত্রাটা ছিল অনেক বেশি। কারণ আয়োজন ও প্রতিষ্ঠার খরচ প্রথম দিকে কম নয়। অনুশীলা এ তথ্য জানে। কাজ কিছু হয়েছে বটে, তবে বাণিজ্য হয়নি। নদীর এপার থেকে ওপারের কাজের পরিচালনা সে লক্ষ্য করেছে। একটা আধুনিক পদ্ধতিতে পরীক্ষাগার এবং তার সঙ্গে কর্মীদের একটা বাংলো নির্মিত হয়েছে। সেখানে বীরেশের সঙ্গে থাকে ললিত আর দুচারজন সহকর্মী। কুলীকামিনদের একটা চালা নির্মাণেরও কাজ চলছে। দূরের গ্রাম থেকে তারা যাওয়া আসা করে।

গত বছর এমন দিনে এখান থেকে অনিলের বদ্‌লি হয়ে যাবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু নানারূপ সুপারিশ আর আনাগোনার পর আর একটা টার্ণ তার জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে। এতে অনুশীলারই হাত ছিল। সে গিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ইংরাজী ভাষায় দরবার করেছে। স্বামী ছিল তার পিছনে পিছনে। চিনির মালিকরা যথেষ্ট কারসাজি করা সত্ত্বেও অনুশীলার অভিপ্রায়ই সার্থক হয়েছিল। এ-গ্রামের যারা গায়েপড়া অভিভাবক, তারা অনিল সেনকে বদলী হ'তে দেখলে সুখী হয়। নির্বাচন সংগ্রামে হাকিমের স্ত্রীর কার্যকলাপ তারা আজো ভোলেনি। শত্রুর জড় না মরলে তাদের দুর্ভাবনা ঘুচবে না; যাই হোক্, এক্ষেত্রে অনুশীলাই জয় ক'রে এসেছে।

মাঝখানের কয়েক মাস এই মহকুমার বড়ই দুঃসময় গিয়েছে। অনাবৃষ্টির ফল স্বরূপ এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। যথেষ্ট পরিমাণে

আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও চাষীরা চিনি-ব্যবসায়ীর ব্যবহারে ও আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। দাদনের হার এবছর কমেছে, কিন্তু সুদ বেড়েছে। গ্রামে রাস্তা কেটে লোক ভোলানো হয়েছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ দেখা দেবার পর থেকে রাস্তা নির্মাণের কাজ বন্ধ। ফর্দ বাড়াবার দরকার নেই, কিন্তু জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে চিনিওয়ালারা কাজের লোক বটে, কিন্তু তারা গরীবের আত্মীয় নয়। বীরেশের দলের জন্য একটা চাপা সমবেদনা যেন আশ-পাশের সমস্ত গ্রামেই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। গ্রামবাসীদের দুর্দশায় অনুশীলা কেমন একপ্রকার কুটিল আনন্দে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ভাবলো, ওষুধ ধরেছে!

এমন দিনে হঠাৎ একদিন রজনী এসে অনিল সেনের বাংলোয় দেখা দিল। এ-বাড়ীতে সে অপরিচিত নয়। আরদালি তাকে চিনতে পেরে ভিতরে গিয়ে খবর দিল। অনুশীলা তার নাম শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কিন্তু আত্মসম্বরণ ক'রে চাকরকে বললে, বলো গে, হুজুর এখন আদালতে, এখন ত দেখা হবে না।

আরদালি বাইরে গিয়ে আবার ফিরে এলো। বললে, তিনি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চান।

আমার সঙ্গে?—বিরক্তিতে অনুশীলা কঠিন হয়ে উঠলো। কিন্তু বাড়ীতে এসেছে ভদ্রলোক, অশোভন রূঢ়তায় ফেরৎ দেওয়া একটু কঠিন। অতিশয় অনিচ্ছায় ইংরেজী বইখানা একপাশে রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে এলো।

তাকে দেখে রজনী বললে, নমস্কার। কেমন আছেন?

মুখখানা মেঘের মতো ক'রে অনুশীলা বললে, ভালো না থাকলে আমাদের চলবে না। বসুন।

রজনী বললে, হাকিম আছেন আদালতে আমি জানি। আমি

সুবিধাবাদী লোক, সেইজন্তেই গা ঢাকা দিয়ে আপনার কাছেই আবেদন নিয়ে এসেছি।

'কি বলুন ?

আপনাকে মনে করিয়ে দিতে এলুম যে, আমি আজো সেই বিশ্বাস-ঘাতকই আছি, আজো আপনাদের উপকারের দেনা শোধ করবার উৎসাহ আমার নেই।

এই বলতে এলেন নাকি ?

না, দু-একটা কথা আরো আছে। আমি সেই মায়েরই সন্তান, যারা সন্তানের বাঁচবার উপায় রাখে না, অথচ পরমায়ুর জন্তে পাঁচুঠাকুরের দো'রে মানৎ করে, যারা ছেলের কল্যাণ করতে গিয়ে কালীঘাটে দুটি ক'রে নিরপরাধ পাঁঠার প্রাণ বলি দেয়।

অনুশীলা একখানা চেয়ার টেনে ব'সে বললে, আপনার আসার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারছিনে, রজনীবাবু।

রজনী বললে, আমিও ঠিক বুঝিনি, মিসেস্ সেন। তবে ক'দিন থেকেই মনে হচ্ছিল, যার টেবিলে ব'সে অতি দুর্দিনে অন্নগ্রহণ করেছি, তাঁর কাছে মনে প্রাণে ক্ষমা চাইলে হয়ত আমি আবার নিজের উন্নতি করতেও পারতুম।

অনুশীলা এইবার তার আপাদমস্তক তাকালো। হাকিমের বাড়ী আসবার জন্ত সবচেয়ে ভালো জামা কাপড়ই সে প'রে এসেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ধোপদস্ত ধুতি আর পাঞ্জাবী যথেষ্ট সতর্কতা সত্বেও জরা ও দৈন্যের পরিচয় দিচ্ছে। এবং সহসা তার পায়ের দিকে নজর পড়তেই অনুশীলা দেখলো, তার নগ্ন দুখানা পা বহু দূর থেকে হেঁটে আসার জন্ত ধূলোয় কাদায় একেবারে বিবর্ণ।

অনুশীলা বললে, আপনার কাজ কারবারের খবর কি ?

হাসিমুখে রজনী বললে, খবর যে কুশল নয় তা আমার চেহারাতেই মালুম। তবে এদেশে সব চেয়ে সুসাধ্য যে কাজ অর্থাৎ বিবাহ, সেটি আমি আগেই সেরে রেখেছি। কিন্তু এতেই একটা বিপদ ঘটলো মিসেস্ সেন। এক সতীন ঘরে আসতেই আর এক সতীন গৃহত্যাগ ক'রে গেলেন, আমি পড়লুম অগাধ জলে।

অরুণীমাকে পুনরায় ঘৃণা ও বিরক্তি দমন করতে হোলো। সে বললে, আপনার বুঝি আগেও এক স্ত্রী ছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিলেন বটে, তবে তিনি অশরীরি। শাস্ত্রে তাঁকে বলে ধনলক্ষ্মী। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন-যারা বলে, তারা বাতুল। অর্থ ভাগ্যটা বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে, এবং দুর্বুদ্ধিটাকেই কাজে খাটানো যায়। একদিন দুর্বুদ্ধির গুণেই ত বীরেনকে পথে বসিয়ে ভাগ্যটা কিছু ফিরিয়েছিলুম।

আপনি কিছু প্রসন্ন হ'লে বলতে পারতুম আপনার আশীর্বাদ চাই। কিন্তু বোধ হয় আর কিছু পাবার অধিকার নেই। কারবার আমার ডুবে গেছে। এর কারণ, আমার চেষ্টা ছিল, কিন্তু মস্তিষ্ক ছিল না। মস্তিষ্কটা বীরেনের সঙ্গেই চ'লে গেছে, ছ'বছর আগে এ-গ্রামে যেদিন যে-অবস্থায় ভাগ্য অন্বেষণে এসেছিলুম, আজ আবার সেই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি। সেদিন বীরেনের সঙ্গে উপবাস করেছি, আজ সস্ত্রীক উপবাস করতে হবে। সেদিন আপনাদের কাছে ক্রেডিট ছিল, আজ সে মূলধনও নেই।

কিন্তু তার দুঃখের কাহিনী শোনবার জন্য অরুণীমা একটুও প্রস্তুত নয়। তার মুখে বীরেনের নাম উচ্চারণও অরুণীমার কাছে কেমন একটা অসহনীয় যন্ত্রণার মতো মনে হচ্ছিল। সে উঠে দাঁড়ালো। বললে, আচ্ছা, আমি চললুম, আমার স্বামী যখন থাকবেন, সেই সময় আপনি—

কিন্তু কাজ যে আমার বাকী রইলো, মিসেস্ সেন?—রজনী

সহসা ব্যাকুল হয়ে বললে, আশীর্বাদ ভিক্ষে করতে এসেছিলুম আপনার কাছে, কিন্তু—

অঞ্জলীলা এবার ফেটে উঠলো। বললে, রজনীবাবু, বারবার আশীর্বাদ চেয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আমার আশীর্বাদের দামও নেই, আশীর্বাদ করার বয়সও নেই। আপনার বন্ধুকে অতি দুঃসময়ে আপনি ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলেন এই কেবল জানি! ক্ষমা যদি চাইতে হয় তাঁর কাছেই চাইবেন। বরং আমাকেই আপনি ক্ষমা করবেন, কারণ আপনি আজ যত সাধুতারই পরিচয় দিন—আপনাকে অকৃতজ্ঞ ব'লে যে বিশ্বাস আমার হয়েছে, সেই বিশ্বাস আমার কোনদিন যাবে না। আপনাকে দেখেই আমি জেনেছি যে, আপনি সর্বস্বান্ত। কিন্তু সত্যিই বলছি আপনাকে, আপনার সম্বন্ধে আমার মন একটুও টলবে না।

রজনীর মুখ চোখ অপমানে রাঙা হয়ে উঠলো; বললে, যদি সমস্ত জীবন ধ'রে আমি প্রায়শ্চিত্ত করি, মিসেস্ সেন?

সে-খবর আমি রাখবো না। তবে আশা করব, প্রায়শ্চিত্তে আপনার নিজেরই উপকার হবে।

রজনী উঠে দাঁড়ালো। বললে, মিসেস্ সেন, একদিন যে-সম্মান আপনাকে করেছিলুম, আপনার আজকের আচরণের পরেও সেই সম্মান আমার অক্ষুণ্ণ থাকবে। আপনি একরোখা, তাই আপনি অপরাইট্, সোজা মানুষ ব'লেই আপনার পথ বাঁকা। বীরেশের কাছে মুখ দেখাবার উপায় আমার নেই। তবু মনে করেছিলুম, যদি আপনার সুপারিশ সংগ্রহ করতে পারি, আর একবার তার কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো। কিন্তু তা হোলো না। আমি কলকাতাতেই চ'লে যাচ্ছি, এদিকে আর আমার আর নেই। তবে বলা রইলো, যদি কোনোদিন আপনাদের কোনো উপকারে আসতে পারি, তা হ'লে আমার গৌরবই বাড়বে।

অনুশীলা নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল। কয়েক পা গিয়ে রঞ্জনী আবার ফিরে দাঁড়ালো। বললে, আমিই না হয় অপরাধী, কিন্তু আমার স্ত্রী নিরপরাধ—তিনিই আমাকে জোর করে পাঠিয়েছিলেন আপনার কাছে। বীরেশ একদিন তার স্ত্রীকে বিনা দোষে ত্যাগ করেছিল, কিন্তু আমি? তার জন্যে ভিক্ষে করতেও দুঃখিত হবো না! নমস্কার।

বীরেশ যে বিবাহিত, এই অদ্ভুত সংবাদ গত ছয় বছরের মধ্যেও অনুশীলার কানে ওঠেনি। সহসা তার সমস্ত কাঠিন্য আর দৃঢ়তার উপরে রঞ্জনী যেন একটা ফুৎকার দিয়ে সবটা নিভিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। চেয়ারখানা টেনে অনুশীলা তার অবশ অচেতন দেহটাকে কোনোমতে বসালো। রঞ্জনীকে আর একবার চেঁচিয়ে তার ডাকতে ইচ্ছা হোলো, কিন্তু তার গলা যেন ভিতর থেকে শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। স্তব্ধ, আহত, অপমানিত মুখে সে নীরবে ব'সে রইলো। প্রাঙ্গণ পার হয়ে রঞ্জনী পথে নেমে মাঠ পেরিয়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সমস্তটাই রহস্যময়, সমস্ত যেন সংশয় ও সন্দেহে কুয়াশাচ্ছন্ন। বীরেশকে সে জেনে এসেছে মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে,—তার অতীত জীবনকে সে জানতে চায় নি। তার প্রতিভা, তার কর্মশক্তি, তার অম্লান অধ্যবসায়, তার স্বভাবের সৌকুমার্য, তার বিদ্যা ও বুদ্ধির আভিজাত্যময় সম্পদ,—কোথাও ত্রুটি নেই। অভাবে, বিপদে, দুঃখে, হতাশায়, বেদনায়,—বীরেশের সকল অবস্থাই সে জানে। দৈন্য-দারিদ্র্যের মধ্যেও নির্লিপ্ত সে—রাজপুত্র পথের ভিখারী হলেও তাকে চিনতে ভুল হয় না; মণিরত্ন পঙ্কিল হলেও তার দাম কমে না। কিন্তু আজকের এই সংবাদের জন্য অনুশীলা প্রস্তুত ছিল না। এ সংবাদ আঘাত করে গেল তার মর্মমূলে। যাকে একান্ত ক'রে কাছে পাওয়া, সে একান্ত দূরের মানুষ—এমন সন্দেহ করার অবকাশ তার ছিল কোথায়? একান্ত ক'রে অনুশীলা যাকে বিশ্বাস করেছে, সে,

যে একান্ত ভাবেই আত্মগোপন ক'রে রইলো,—একথা কি তার স্বপ্নেরও গোচর ছিল ?

রজনী এসেছিল এক কাজে, ব'লে গেল অন্য কথা। যেন সে এক প্রকার অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বীরেশের স্ত্রীর সংবাদটা দিয়ে গেল। তার বলার হয়ত প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু অনুশীলার যে শোনার প্রয়োজন ছিল,—রজনী একথা অনুভব করেছে। গত দু'বছরের ইতিহাস রজনীর সবটা জানা নেই। নির্বাচন-যুদ্ধে রজনী ছিল নির্লিপ্ত, তার কাজ-কারবার নিয়ে ব্যস্ত। প্রথম থেকেই সকল কাজে ও কথায় নিরুৎসাহ ছিল ব'লেই তাকে বাদ দিয়ে ব্যাপারটা চলেছিল। সেই সময়টায় বীরেশের সঙ্গে অনুশীলার ক্রমবর্দ্ধমান অন্তরঙ্গতার আনুপূর্বিক কাহিনী রজনীর জানা নেই। তারপরে রজনী বন্ধুকে ছেড়ে একদিন চ'লে গেল।

কিন্তু গত দু'বছরের ইতিহাস অনুশীলা ছাড়া আর কে জানে ?

বীজ পড়ে মৃত্তিকার নিচে, একটা প্রচণ্ড ধোঁয়াকময় বেদনা মৃত্তিকার রহস্য-পাথারের স্তরে স্তরে নিঃশব্দে আলোড়িত হ'তে থাকে ; একদিন কেঁদে কেঁদে উঠে দাঁড়ায় অঙ্কুর, জেগে ওঠে প্রাণস্পন্দন। এই ত গত ক'বছরের অপ্রকাশিত কাহিনী ! উপরতলায় অনুশীলা প্রখর বক্তৃতা দিয়ে বীরেশের প্রতিভায় জীবন সঞ্চার করেছে। তাকে তাতিয়েছে, খাতিয়েছে,—তাকে স্থির থাকতে দেয়নি কোনো বিশ্রামের মধ্যে। তাকে আঘাত করেছে, বিদ্ধ করেছে, বিপর্যস্ত করেছে, চৌম্বকশক্তির আকর্ষণে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। নিস্তব্ধ রাত্রির নিঃশব্দ মুহূর্তগুলি স্বামীর পাশে থেকেও সে ওই ছন্নছাড়া প্রতিভার ভবিষ্যৎ কল্যাণ-স্বপ্নে ব্যয় করেছে। স্বামী বিস্মিত হয়েছে অপর পুরুষের উন্নতির প্রতি আসক্তি দেখে। অনেক সময়ে ক্ষুব্ধ হয়েছে তার এই অহেতুক অধ্যবসায় লক্ষ্য ক'রে। অবশেষে

একদিন সে ঝাঁপ দিল নির্বাচন সংগ্রামে। সে এক চৈত্র মাসের রোদ, জল জলাশয় শুষ্ক, আকাশ কাংস্যবর্ণ, পথে পথে অনাহার, পদে পদে বাধা। সেদিন অনেক স্থলে হাকিমের স্ত্রীর সম্মান রক্ষা হয়নি। অনেকে হেসেছে, উপেক্ষা ও বিদ্রূপ করেছে। সেদিন কি সে গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষার জন্য স্বামীর সুনিশ্চিত পদমর্যাদা আর পর্যাপ্ত ঐশ্বর্য ছেড়ে গৃহত্যাগ করেছিল? পরাজয়ের অসম্মান বহন করেছিল সে কা'র জন্য? প্রতিভাকে কর্ম-শক্তিতে বিকশিত ক'রে তোলার অজুহাতে স্বামীকে ভুলিয়ে অত টাকা সে ব্যয় করেছিল কা'র সেবায়?···

কিন্তু উপরতলার অজস্র কাহিনী বাদ দিলে নিচের দিকে যে বস্তু থাকে তার মাধুর্য অরুণীলারই নিজস্ব। আত্মবিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার আশ্চর্য রূপ। তার স্বামী তার কাছে কম নয়। বিদ্যায়, বিবেচনায়, উদার স্বভাবে, সুশ্রী চেহারায়, অটুট স্বাস্থ্যে অনিলকে স্বামীভাবে পাওয়া গৌরবের কথা, এতে অরুণীলার কোথাও সংশয় নেই। হাকিম হিসাবে তার চেহারায় অনেকেই একটা কর্তব্যবোধের কাঠিন্য দেখতে পায়, রাগ করলে তার চোখ দুটো রাঙা হয়ে ওঠে। তার ছাঁটা চুল আর ছাঁটা গোঁফে একটা তেজস্বী দৃঢ়তা দেখে অনেকেই তাকে নিষ্ঠুর প্রকৃতি ব'লে ভুল করে। কিন্তু তার আসল পরিচয় আদালতের বাইরে। কেউ কোনোদিন তার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি, কেউ কোনোদিন সামাজিক জীবনে আঘাত পেয়ে যায়নি। স্ত্রীর প্রতি তার প্রণয়ের উচ্ছ্বাস নেই, তপস্বীর মতো সকল সময়েই নীরব, সাদর অভ্যর্থনায় কোথাও তার বিন্দুমাত্র ফাঁকি নেই। স্বামীকে স্বপ্নেও যদি প্রতারণা করা যায়, তবে তার অপেক্ষা আত্ম-অপমান আর কিছুতেই ঘটবে না। স্বামী তার অভিভাবক নয়, স্বামীকে নিয়ে তার কোনো ভয় নেই, স্বামীকে প্রতারণা করার কোনো হেতু তার নেই। স্বামী তার বন্ধু, স্বামী তার পরমাত্মীয়।

স্বামীর যোগ্যতা আর ভালোবাসা আর উদার পরিহাসবুদ্ধির কাছে সহস্র বীরেশও ম্লান। অরুণীলা একথা বিশ্বাস করে।

কিন্তু তবু একটা কথা থেকে যায়, তার একমনস্কতায় ভাঙন ধরেছিল কেন? এক মন কেন হয় খণ্ড-খণ্ড? এ এক জীবনের অভিশাপ সন্দেহ নেই। তাম্র রেশমের গোছার মতো রাশি রাশি এলোমেলো বীরেশের মাথার চুল হাওয়ায় ওড়ে···তার যত্ন নেই, তার বিন্যাস নেই,—মনে হয় আশ্বিনের আকাশ থেকে বুঝি নেমে আসে ওর মাথার উপরে শ্বেত-পারাবত। চোখ দুটোয় বিশ্বের অসীম উদাস স্বপ্নচ্ছায়া। তার মন্থর অবসন্ন ক্লান্তির পাশে থাকে যেন প্রবল শক্তির একটা স্পন্দন-যন্ত্র। তার কালো দীর্ঘায়ত নির্বাক চাহনির ভিতর অন্ধকার রাত্রি যেন আপন প্রাণের মায়া বুনে চলে। সংসারে সে অযোগ্য, কর্তব্যে সে অপটু, হৃদয়াবেগ প্রকাশে সে অক্ষম, কিন্তু তার কণ্ঠে, সুগৌর বিস্তৃত বক্ষপটে, তার দুই দীর্ঘ বাহুর বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে যেন একটা বিপুল প্রকাশশীলতা সংহত হয়ে রয়েছে। তুষারমৌলী মহাদেবতার মতো সে অচঞ্চল, কিন্তু ভিতর থেকে শক্তি স্ফুরিত হ'লে সে সর্বজয়ী দুরন্তপনায় মানুষের আতঙ্ক সৃষ্টি করে. তার কাছে এলে হৃৎকম্প হয়, তবু তাকে খুঁচিয়ে জাগাতে ভালো লাগে. উদ্দীপ্ত ক'রে তুললে প্রাণ উল্লসিত হয়ে ওঠে!

অনিল অযোগ্য নয়, বীরেশ অপদার্থ নয়, নিজেও সে অর্বাচীন নয়। যে অসামাজিক এবং অবৈধ আসক্তি স্ত্রীজাতিকে একটা অবাস্তব, রসকল্পনার দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে, সত্য বলতে কি, অরুণীলা সে কথা কল্পনাও করে না। সে বালিকা নয়, সোনার হরিণের আকর্ষণে নিজের গণ্ডী ভেঙে মেয়েরা কোথায় গিয়ে পৌঁছয়—সংসারে এসকল ঘটনার সংবাদ সে জানে। আধুনিক কালে ব্যভিচারিণীদের একটা সুলভ খ্যাতি উন্নাসিক সমাজে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই খ্যাতির আবরণের নিচে যে

ঈর্ষা আর চৌর্যবৃত্তি, যে সংশয় আর অশ্রদ্ধা, যে চিত্তদাশিল্য আর আত্ম-সম্ভ্রমহানি সে তার কলেজী বন্ধু-মহলের আশে পাশে দেখে এসেছে, সে বড় ঘৃণ্য। কিন্তু তবু আজ বীরেশের বিবাহের সংবাদ শুনে তার মনে হচ্ছে, তার ছয় বছরের পরিশ্রম আর উদ্দীপনা সমস্তই ব্যর্থ। সে যেন কেমন মিথ্যার পিছনে ছুটেছিল! সেই বস্তুর জন্যই সে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, যার ওপর তার কোনো দখল নেই।

সহসা পায়ের শব্দে তার অবিরাম মনোবিকারের স্রোত ঝপ্ ক'রে থেমে পাক খেয়ে উঠলো। হেমন্তের বেলা অবসন্ন। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিককার কৃষ্ণচূড়ায় ক্লান্ত রোদ এরই মধ্যে বিদায় নিতে চাইছে। খড়-বোঝাই একখানা গোরুর গাড়ী একটু আগেই ধুলো উড়িয়ে গেছে, তার চাকার আর্তনাদ তখনও ধূলিজালের ভিতর দিয়ে কানে আসছিল।

বারান্দার উপরে অনিল উঠে এলো। পেশকারের সঙ্গে সাইক কাগজ পত্র নিয়ে লাইব্রেরীর দিকে চ'লে গেল। চাকর এসে তার হাত থেকে নিল টুপি আর ছড়ি। অনিল পূর্বদিকের বারান্দা পেরিয়ে এদিকে এসে রঞ্জনীর পরিত্যক্ত চেয়ারখানায় ব'সে পড়লো।

এখানে চুপ চাপ বসে যে?

অনুশীলা এতক্ষণে কথা কইলো। বললে, এই একটু রোদ পোয়াচ্ছিলুম।

অনিল বললে, কিন্তু রাণীসাহেবা আজ এত আনমনা কেন? আবার কোন্ কিছিয়ে আছ শুনি!

আমি বুঝি কিছির খুঁজেই বেড়াই?

হাসিমুখে অনিল বললে, আশ্চর্য নয়। আবার ত গ্রামে সাড়া পড়ে গেছে, তোমরা নাকি আবার একটা ভীষণ ফাইট্ নেবে। এবার কা'র ওপর আক্রমণ?

যদি বলি তোমার ওপর ?

বেচারি আমি! অনিল বললে, রক্ষে কর দেবী ; সাতে নেই, পাঁচে নেই, অম্বলে নেই, ঝোলে নেই। হাকিমী করি, খাই-দাই-বেড়াই। আমার ওপর আক্রমণ চালালে একটুও ডিফেণ্ড করব না,—তখুনি সারেণ্ডার করব। বলবো, যো হুকুম রাণীসাহেবা। এখন শুনি, তোমার মেজাজ শরিফ্ নয় কেন। ওদিকের খবর কিছু এসেছে নাকি ?

কোন্ দিকের ?—অনুশীলা যেন বুঝতেই পারে নি।

শ্রীমান বীরেশ আর ললিত। যাক্—ছোকরা দুজন এতদিনে একটা কূলকিনারা পেয়েছে। দু'বছর ধ'রে খুব খেটেছে, কি বলো ? টাটা থেকে একটা ভালো অর্ডার পেয়েছে, হাজার-পঞ্চাশেক টাকা। একটা ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গেও ওদের নতুন অর্ডারের কথাবার্তা চলেছে।—কই,এমন একটা সুসংবাদ দিলুম, তোমার মুখে চোখে কোনো সাড়া নেই কেন ?

অনুশীলা বললে, রুচি নেই।

হেতু ?

বৈরাগ্য।

অহেতুক ?

অনুশীলা ম্লান হাসি হাসলো। বললে, বেল পাকলে কাকের কী ?

অনিল বললে, কিন্তু কারবারটা যে তোমার নামে গো ? ওরা পাবে কমিশন, তুমি পাবে লাভের অঙ্ক !

না, চাইনে আমি কিছু—অনুশীলার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপলো। বললে, তুমি থাকলেই আমার সব রইলো।

অনিল তার মুখের দিকে তাকালো। বললে, একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে ? তুমি উৎসাহ হারালে ও বেচারিরা যে দ'মে যাবে গো। ওদের গাছে উঠিয়ে মই কেড়ে নিয়ো না।

অরুণীমা আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, ওরা পুরুষ মানুষ, এখান নিজের পথ ওরা নিজেরাই বুঝে নিতে পারবে। আমরা আর এখন থেকে ওদের নিয়ে মাথা ঘামাতে পারবো না। যথেষ্ট হয়েছে।

হাসতে হাসতে অনিল উঠে দাঁড়ালো। তারপর স্ত্রীর কাছে এগিয়ে তার গালের ওপর হাতখানা বুলিয়ে বললে, আচ্ছা তাই হবে, এসো। আজ আমিই তোমাকে চা ক'রে খাওয়াবো।

স্ত্রীর কোমরে হাতখানা জড়িয়ে সাদর স্নেহে অনিল তাকে নিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো।

কী করো গো, চাকর-বাকররা দেখতে পাবে যে?

অনিল বললে, মন্দ কি, দেখলে উৎসাহ বোধ করবে।

অরুণীমা স্বচ্ছ হাসিমুখে বললে, বলবে, হাকিমের কীর্তি!

কিন্তু একথাও বলতে পারে, রাণীসাহেবার বিরহ ঘুচলো।

চায়ের আসরে ব'সে অরুণীমা বললে, আজ রুক্মিণী এসেছিল দুপুরবেলায়।

তাই নাকি? ছোকরা সাহস করলো, এখানে আবার আসতে? কি করে আজকাল?

ওর কাজ কারবার সব নষ্ট হয়ে গেছে। এসেছিল অপরাধের ক্ষমা চাইতে।

অনিল বললে, আর কি উদ্দেশ্য?

যদি আর একটা কিছু সুবিধে হয়?

হোলো কিছু?

অরুণীমা হাসলো। বললে, ভারি অসভ্য তুমি। তুমি না হাকিম?

টোস্টে কামড় দিয়ে অনিল বললে, হয়ত অসভ্য না হ'লে হাকিম হওয়া যায় না।

না, তা নয়। হাকিম না হলে অসভ্য হওয়া যায় না।

স্পর্ধা তোমার! সরকারী কর্মচারী কি কখনও অসভ্য হয়?

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অনুশীলা বললে, অসভ্য মানেই সরকারী কর্মচারী।

ব্যস্, এখানেই থামো। অনিল বললে, আর টুঁ শব্দ করলেই কিন্তু রাজদ্রোহ!

জানি গো জানি, তোমাদের সিডিশনের আইন বেলুনের মতন যত খুশি ফোলানো যায়।

নিশ্চয়ই। তার কারণ দেশটা অনেক বড়, একে আয়ত্তে আনতে গেলে আইনের ব্যাপকতা থাকা চাই। তারপর, রঞ্জনী আর কি বললে, শুনি?

বললে, বিয়ে করেছে।

যাক্, এতদিনে তা হ'লে ভদ্রলোক হোলো!

অনুশীলা বললে, বিয়ে যারা করেনি তারা বুঝি ভদ্রলোক নয়?

না। তারা গোঁয়ার। এই যেমন তোমার বীরেশ। আচ্ছা, বলো দেখি, লোকটার কি কোনো 'সেন্স অফ হিউমার' আছে? কেবল কাজ, কেবল ব্যস্ততা, কেবল আইডিয়ালিজ্‌ম্। নিজের কাজকে ও দেশের কাজ মনে করে, দেশের কাজকে মনে করে নিজের। ওর হাসবার সময় নেই, গান বাজনার দিকে ঝোঁক নেই, মেয়েছেলের দিকে নজর নেই, ওর সঙ্গে আমার কথা কইতেই ভয় করে। বিয়ে করলে এই দোষ ঘটতো না, একটু মধুর রস আসতো মনে, অন্তত আর কিছু না হোক্, মাত্রাজ্ঞান আসতো। মহাদেবের রুক্ষ জটার ভিতর থেকে যখন জাহ্নবীর ধারা নামলো, তখন তিনি হলেন রসময়। আগে ছিলেন সন্ন্যাসী, এখন হলেন শিব। তোমার বীরেশের একটা বিয়ে ঘটিয়ে দাও দেখি অনু?

অতসীলা শুদ্ধ হয়ে শুনলো স্বামীর কথা। তারপর বললে, বীরেশ যে বিবাহিত তা বুঝি তুমি জানো না?

তাই নাকি? বিয়ে করেছে? কদ্দিন?

এখানে আসবার আগে।

কই, আমাদের বলেনি ত? বেশ, বেশ, তাহ'লে মন্দ নয়। ওই জন্যেই বোধ হয় ছোকরার এত উৎসাহ কাজকর্মে। তুমি শুনলে কোত্থেকে?

বীরেশের মুখ থেকে যে সে শোনে নি, একথা স্বামীর কাছে প্রকাশ করতে অতসীলার বাধলো। বীরেশের গোপন-কাহিনী-রক্ষার পাত্রী সে নয় এ যেন তার কাছে একটা ভয়ানক অপমানের কথা মনে হোলো। সে কেবল বললে, শুনেছি আমি।

অনিল বললে, আমাদের এতদিন বলেনি কেন? আর কিছু না হোক, একটা উপহারও ত পাঠাতে পারতুম। যাক্, শুনে খুশি হলুম। ছোকরার তাহ'লে এখনো আশা আছে। বিয়ের কথা যখন বলেনি, তাহলে একটা কিছু গোলযোগ ঘটিয়ে এসেছে, কি বলো?

জানিনে, পরের কথায় আমাদের কি দরকার?

কিন্তু পর ব'লে তুমি ত মনে করো নি?

পর পরই, তাকে আপন মনে করা ভুল।

অনিল বললে, কিন্তু তুমি ত বলতে, পর যখন আপনার হয়, তখন আত্মীয়ের চেয়েও আপন।

অতসীলা হাসিমুখে বললে, মানুষ নিজের মতামত বার বার বদলায় বলেই মানুষ বুদ্ধিজীবী!

তা বটে। থাক্‌গে, এ প্রসঙ্গ আমাদের নাড়াচাড়া করার দরকার নেই।—ওঃ, ভালো কথা মনে পড়েছে। বলতে বলতে অনিল ব্যতিব্যস্ত

হয়ে উঠলো,—ভালো কথা! আজ টিফিনরুমে ঢুকতেই আরদালী একখানা চিঠি আমার হাতে দিল। বোধ হয় তোমার ওখান থেকে—এই যে, দেখো ত? তোমারই নামে।

পকেট থেকে একখানা খাম বার করে অনিল স্ত্রীর হাতে দিল।

চিঠিখানা নিয়ে খুলে অনুশীলা পড়তে লাগলো।

কি গো, বাপের বাড়ীর নাকি?

না, এ আমার বন্ধুর।

চা খাওয়া শেষ করে অনিল উঠে লাইব্রেরী ঘরের দিকে চ'লে গেল; অনুশীলা সেইখানে বসে একমনে পড়তে লাগলো তার চিঠি:

ভাই অনুশীলা,

গত সাত আট বছর তোর কোনো খবর জানতুম না। আমার চিঠি পড়ে খুব অবাক হবি বেশ বুঝতে পারছি। তুই বিয়ে করেছিস, কে যেন বলেছিল, কিন্তু তুই যে হাকিমের বউ তা জানতুম না। আমার মামীমার কাকার কাছে শুনলুম তুই এখন দেবীপুরে। আমি মাস্টারী ছেড়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। প্রথমে যাবো খাঁনপুরে দাদামহাশয়ের ওখানে। শুনলুম, তোদের দেবীপুরের পাশেই খাঁনপুর। যদি তোর সঙ্গে এক আধদিন আড্ডা দিতে ইচ্ছে করে তাহ'লে কি হাকিমের হুকুম নিতে হবে? তোর সঙ্গে সেই কলেজের দিনগুলো মনে পড়ে। কত কাণ্ডই করা গেছে! তুই আই-এ পাশ করে পালালি অন্য কলেজে, আর আমি বি-এ দিয়ে গেলুম পোষ্ট গ্রাজুয়েটে। শুনলে সুখী হবি, আমি আজও বিয়ে করার সময় পাইনি, বোধ হয় ওটা আর হয়ে উঠবে না মনে হচ্ছে। মন্টেসরী পাশ করতে একবার ইতালী যেতে পারি। দেখা হ'লে খুব গল্প করা যাবে। চিঠির উত্তর দিস। ত্রিশের ওপরে এসে পৌঁছেছি, তবু তোর কথা

মনে ক'রে আবার যেন দশ বছর আগেকার জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।

ভালোবাসা নিস। হাকিমকে নমস্কার জানাচ্ছি। তোর ওপড় হাকিমী চিকিৎসা কেমন চলছে? ইতি—বাঁকিপুর, ডিসেম্বর ১১।

তোদের সেই

নলিনী

আগে নাম ছিল পাথরচাকী, এখন তার নতুন নামকরণ হোলো নবনগর! চন্দন পাহাড়ের কোলে ছিল ছোট একখানা গ্রাম, দুচার ঘর চাষী, নমঃশূদ্র আর সাঁওতাল সেখানে থাকতো। আগে শীতের দিনে সুচিত্রার তট ঘেঁসে একদল বেদে আর বেদেনী এসে তাদের তাঁবু ফেলতো, কিন্তু গ্রামে আহারাদির কোনো ব্যবস্থা হয় না দেখে তারা আর এ-অঞ্চলে আসে না। মাঝখানে এদিকে একটা বড় জ্বর দেখা দিয়েছিল।

সুতরাং সরকারের কাছ থেকে ইজারা নেবার পর আজকাল নবনগরের সীমানা পুরনো গ্রাম পেরিয়ে এগিয়ে এসেছে একেবারে সুচিত্রার তীরে। এখন নদীর কোলে বাঁধানো ঘাট, আর সেই ঘাট থেকে উঠলে রাঙা কাঁকরের সুন্দর ছায়াবহুল পথ সোজা নতুন কুঠিবাড়ী পেরিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। আগে চন্দন পাহাড়ের চারিদিকে ছিল বন-জঙ্গল, নাবাল জমি, খাল, জন্তুজানোয়ারদের স্বাধীন চলা ফেরার জায়গা,—সে জায়গা এখন আর চেনবার উপায় নেই। আজকাল সেখানে কারখানা, আফিসঘর, পাওয়ার হাউস, পরীক্ষাগার, জলাধার,

ছোট তিন চারটে ব্যারাক, কুলীধাওড়া—বহু প্রকার ব্যবস্থায় আগেকার সেই তুর্গম বন্ধ্য অঞ্চল ভ'রে গেছে। এখন সেখানে হাট বসে, দোকান-পাটের খদ্দের জমে যায়। সন্ধ্যা আসন্ন হলেই নবনগরের পথঘাট ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় হাসতে থাকে। চারিদিকের অন্ধকার দৈত্যপুরীর মাঝখানে এই ক্ষুদ্র নবনগর যেন কিশোরী বালিকার মতো প্রাণ-চেতনায় চঞ্চল। দুতিন বছরের মধ্যে এর এত উন্নতি দেখে আশেপাশের গ্রাম একেবারে বিস্ময়বিহ্বল।

দেবীপুরে যা সম্ভব হয়নি, নবনগরে তা সার্থক হয়েছে। এখানে সমবায় সমিতি নেই বটে, তবে কর্মচারী আর শ্রমিকদের জন্য একটি ব্যাঙ্ক তৈরী হয়েছে। চাষবাসে মন্দা পড়ায় জন্য অনেক চাষী এপারে এসে নবনগরের কাজে লেগে গেছে। কোনো দল লোহা গলাবার কারখানায়, কোনো দল পাওয়ার হাউসে, কোনো দল বা জলাধারের হেপাজতে নিযুক্ত। অফিস চালাবার কাজে জন কয়েক যুবক কলকাতা থেকে এসে বীরেশের কাছে পরীক্ষা দিয়ে তবে এখানে নিযুক্ত হয়েছে। তাদের অনেকের চেষ্টায় একটি প্রাইমারী আর একটি মাধ্যমিক শিক্ষালয় গ'ড়ে উঠেছে। কাজ সৃষ্টির মালিক বীরেশ, নিয়ন্ত্রণও করবে সে, কিন্তু পরিচালনা করবে অপরে। সম্প্রতি একটা হাসপাতাল আর কুটিরশিল্প-শিক্ষালয়ের কাজ পুরোদমে চলছে।

কুঠিবাড়ীর প্রাঙ্গণের পাশে একটা লাইব্রেরীর কাজ আরম্ভ হয়েছে। তারই তদ্বিরের জন্য বীরেশ তার প্রিয় ছড়িটা হাতে নিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুখে তার একটা পাইপ। এটা তার নতুন সখ। পাইপ থেকে ধোঁয়া উড়ছে।

গুপ্ত সাহেব, কি ভাবছ বলো ত?

ললিত তার ফাইল থেকে মুখ তুলে বললে, ঠিক বলেছেন, ফাইলের

দিকে আমার চোখ ছিল না। আপনার কথাই ভাবছিলুম দাদা।

আমার কথা?—পাইপ থেকে মুখ সরিয়ে বীরেশ বললে, যাক, পৃথিবীতে একটা মানুষও পাওয়া গেল, যে আমার কথা ভাবে। কি ভাবছো শুনি?

ভাবছি—ললিত বললে, এত বড় একটা নগর যে লোকটা গ'ড়ে তুললো নিজের ব্রেণের জোরে, তারদিকে চাইবার কেউ নেই। আপনার উদ্দেশ্য সফল হ'তে চলেছে, নবনগর এখন উন্নতির পথে, ত' আপনার শরীর এত কাহিল হচ্ছে কেন, দাদা?

পাইপটা দেখিয়ে বীরেশ বললে, এই ত তার ওষুধ রে। একলা থাকার এত ভালো ওষুধ আর নেই।—এই যে, বিজনকুমার, কি মতলব নিয়ে আবার এলে?

একটি ছোকরা একটা ফাইল নিয়ে এসে তার কাছে দাঁড়ালো। বললে, এই চিঠিটায় একটা সই ক'রে দিন দয়া ক'রে।

বীরেশ তার চিঠিতে সই ক'রে দিয়ে বললে, ব্যালেন্স-শীটের একটা কাপি আমার আফিসে পাঠিয়ে দিয়ো।...হাঁ, ফ্রিইএর অর্ডার আজ পাঠানো চাই।

ললিত বললে, মশা তাড়াবার ব্যবস্থা আমি করছি, দেখুন না। বিলেত থেকে আমাদের যন্ত্রপাতিগুলো আসতে আর দেরি নেই।

বীরেশ বললে, তোমাদের কোয়ার্টারে কারো জ্বর হয়নি ত?

বিজন হেসে বললে, যে-ব্যবস্থা আপনি করেছেন, কারো মাথাটিও ধরে না।

জল কেমন খাচ্ছ?

খুব ভালো। নমস্কার।—ব'লে বিজন খুশি মুখে চলে গেল।

বীরেশ বললে, এদের মাইনে বাড়াবার কি ব্যবস্থা করছো হে?

ললিত বললে, দাঁড়ান দাদা, এই হাফ-ইয়ারলির ক্লোজিংটা আগে হোক্। আমার মনে হচ্ছে, মজুরদের এ্যাডভান্স ওয়েজেস্ কিছু বাড়াতে পারবো। নিচের বনেদটা শক্ত হোক্, তারপর এরা ত আছেই।

বাঃ তুমি দেখি একজন পাকা ম্যানেজার হয়ে উঠলে। আমি যদি কিছু কাল বাণপ্রস্থ নিই, চালাতে পারবে ত?

ললিত হেসে বললে, জানি একটা পরীক্ষায় আপনি আমাকে ফেলতে চান। কিন্তু বিলেতী আবহাওয়ায় অতদিন থেকে এসেছি, জেনে এসেছি ডিসিপ্লিন্, ফিরে এসে থেকেছি অতদিন বেকার,—তারপর সত্যকার শিক্ষায় হাতেখড়ি হোলো আপনার কাছে। আশা করে আছি, আপনার ছায়াতেই বরাবর থাকবো। যন্ত্রটা যত ভালোই হোক, বিদ্যুৎশক্তি না থাকলে সে অনড়,—আপনি হলেন সেই লাইফ্‌ফোর্স।...পাগল হয়েছেন? কোথাও আপনার যাওয়া হবে না।

বীরেশ বললে, নাঃ তুমি একেবারে নিরামিষ। বিলেত যাওয়াটাই তোমার ব্যর্থ। লোকে সেখান থেকে সাহেব হয়ে আসে, কিন্তু তুমি এলে মাছ মাংস ছেড়ে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী প'রে। বিলেতের ওপর শ্রদ্ধা ক'মে গেল।

মুহূর্তের জন্য ললিতের মুখে একটি মলিন আভাস খেলে গেল। অন্তরালে সে একপ্রকার সুকুমার হাসি হাসলো। বললে, বিলেতের ওপর আপনার শ্রদ্ধা না কমে এই আমি চাই। কারণ আমি সেখান থেকে সাহেব হয়েই ফিরে এসেছি, এখানে এসে 'নেটিভদেরও' ঘৃণা করেছি অনেকদিন। কিন্তু—

কিন্তু কি হে?

ঢোঁক গিলে মুখখানা কোনমতে লুকিয়ে ললিত বললে, কিন্তু হঠাৎ

একদিন একজনের প্রভাবে আমার সব বদলে গেল। নিজের চেহারাটা দেখলে এখন হাসি পায়।

মাথার টুপিটা ভালো ক'রে বসিয়ে বুট-শুদ্ধ একটা পা চেয়ারের উপর তুলে পাইপটা মুখে দিয়ে বীরেশ বললে, সে আবার কি হে? এমন পরশপাথর পেলে কোথায়? নাঃ, বছর খানেক থেকেই মনে হচ্ছে তোমার ওপর একটা ভূত চেপে বসেছে। ব্যাপারটা কি বলো ত? You are getting mysteriously romantic!—ওই যে ব্যানার্জি আসছে এদিকে। আমি ততক্ষণ পাওয়ার হাউস থেকে ঘুরে আসি। তুমি মিস্ত্রিদের কাজের দিকে চোখ রেখো।

বীরেশের পথের দিকে ললিত চেয়ে রইলো।

তিন বছর সে ঠিক এমনি ক'রেই বীরেশকে দেখে আসছে। ওর রোগ নেই, নিরুৎসাহ নেই, মনোবিকার নেই,—কেমন যেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। ভালোবাসা বোঝেনা, স্নেহে বশীভূত হয় না—কেমন যেন একটা বন্য জানোয়ারের মতো ওর অদ্ভুত শ্রমশক্তি। নিজের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রাখে, আর সেই আগুন থেকে সকলকে আলোক বিতরণ করে। প্রকাণ্ড এই প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলছে সে নিশ্চিত সাফল্যের দিকে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে নির্দয়ভাবে সে উদাসীন। জীবনের অপরাহ্ণকাল তার ঘনিয়ে এলো কিন্তু কোনোদিন আনন্দের অন্বেষণে সে কোথাও ভ্রূক্ষেপ করেনি। কি তার পরিচয়, কোন্ বংশের সন্তান, সংসারে তার কে আছে আর কে নেই,—এ সকল প্রশ্ন তাকে করাও একেবারে মিথ্যা। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সে মালিক, সহস্র সহস্র টাকা সে প্রতিদিন নিয়ন্ত্রণ করে, প্রবল তার ক্ষমতা, প্রবলতর তার প্রতিপত্তি,—কিন্তু নিজের জন্য খরচ তার নেই! সামান্য তার জীবন যাত্রা, নগণ্য তার গৃহসজ্জা,—দাপজাবী মানুষ সে নয়। দেখতো নির্লিপ্ত-

ভাবে থেকে সে নির্মাণ করছে এই নগর, সকলের অলক্ষ্যে থেকে সকলকে সে শাসন করছে। বাধা যেখানে পেয়েছে—কেবলমাত্র সেইখানে গিয়ে প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় সে বাধা চূর্ণ করেছে। তিন বছরেই এটা সম্ভব হোলো। প্রথম এসে দেখা গিয়েছিল একটা দুর্গম বনময় উপত্যকা,—নিকটে সাপ ও জানোয়ারে পরিপূর্ণ পার্বত্য অঞ্চল,—সেখানে ভয় ও নিরাশার বাসা ছাড়া আর কিছু ছিল না। একদিন সহসা বন্য জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এক প্রাচীন পরিত্যক্ত মন্দিরে আশ্রয় পাওয়া গেল। শেষ বর্ষাকালের ভয়াবহ দুর্যোগে তখন এখানে থাকা কেবল এক উন্মাদ প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব তারপর বহু কষ্টে, বহু সাধ্য-সাধনার পর সরকারী অনুমতি পাওয়া গেল বটে কিন্তু নবনগরের সীমানা নিয়ে লড়াই বাধলো স্থানীয় এক জংলী জমিদারের সঙ্গে। তখন লোকবল নেই, ধনবল সামান্য,—যে কয়জন বিশ্বস্ত লোক পাওয়া গিয়েছিল, তাদের মধ্যে সেই জমিদার অসন্তোষের বীজ ছড়িয়ে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুললো। কিন্তু বীরেশ জন্মেছিল শাসন করতে, মানুষের কল্যাণ করতে। আর সেই কল্যাণ করতে গিয়ে কেমন ক'রে নিষ্ঠুর হ'তে হয় সে জানে।...সুচিত্রার তীরে তখন এসে তাঁবু পেতেছিল একদল বেদে, তাদের কাছে অস্ত্র সংগ্রহ করা হোলো। সে নিজে যেতে পারলো না, কিন্তু দেবীপুর থেকে গোপনে আনা আটজন চাষীকে নিয়ে বীরেশ চললো এক অন্ধকার রাত্রে। কোথায় কি কাজে গেল, তার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও জানা যায়নি, তবে সেই রাত্রেরই শেষ দিকে সেই আটজন চাষীকে আবার নৌকায় তুলে গ্রাম পার ক'রে দিয়ে আসা হয়েছিল।...এই ঘটনার পরের দিন জমিদার এবং তার অনুচরদের লাস অবশ্য আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদিকে রেল-স্টেশন নেই, থানা নেই, কোনো জনবহুল গ্রাম নেই, যানবাহন স্বপ্নেরও অগোচর, সুতরাং স্থানীয় চৌকিদার আটদিন ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে জেলা পুলিশে খবর দেয়।

তদন্ত একটা অবশ্যই হয়েছিল, বীরেশের নামও যেন কা'রা করেছিল—কিন্তু সাক্ষ্য সাবুদের ব্যাপারটা ছিল নিখুঁত কৌশলে নিশ্চিহ্ন। তা ছাড়া বীরেশের সঙ্গে তখন সরকারী যোগাযোগ এত বেশি যে, তাকে সন্দেহ ক'রে তখন টানাটানি করা অসম্ভব। এটা যে হত্যাকাণ্ড, ললিত জানে, এটা যে বীভৎস নিষ্ঠুরতা একথা সবাই স্বীকার করবে। কিন্তু তবু এই নির্দয় পুরুষকে শ্রদ্ধা না ক'রে উপায় নেই। মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, বহুজীবনের সার্থকতার জন্য নির্দয়ভাবে রক্তপাত করতে সে কুণ্ঠিত নয়। এই প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলার প্রথম দিকে আলস্য ও জড়তাকে সে হৃদয়হীনের মতো আঘাত করেছে, অযোগ্যতাকে সে কঠিনভাবে বিতাড়িত করেছে, স্বার্থপরতাকে রুদ্রের মতো সংহার করেছে। বিবেচনা করেনি কোথাও, কোথাও দুর্বল দাক্ষিণ্যকে প্রশ্রয় দেয়নি। নিজের ক্ষমতার সুস্পষ্ট বিকাশের জন্য সে যেন সর্বব্যাপী আয়োজন ক'রে চলেছে। তার ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, বিশ্রাম নেই।

মাঝখানে ললিতের একবার কেবল সংশয় জেগেছিল। সেটা তারও জীবনে একটা নতুন অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই। তারা তখন পুরনো পাথরচাকী থেকে তেরো মাইল দূরে একটা সরকারী ডাক-বাংলায় গিয়ে উঠেছে। কুলীকামিনরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাকা পথ কাটতে কাটতে চলেছে। কনট্রাক্টররা আনাগোনা করছে। কখনো নৌকায়, কখনো বা গোরুর গাড়ীতে খোয়া-সুরকি ইট আনা হচ্ছে। দিবারাত্র কাজের চাপে কারো বিশ্রাম নেবার সময় নেই। বীরেশ আর সে পরিদর্শনে খুব ব্যস্ত।

ক'দিন থেকেই কর্মীমজুর আর গ্রাম্য কনট্রাক্টরদের মধ্যে একটা অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। তারা আহার পায়, মজুরি পায়, বিশ্রাম পায়,…তবু যেন কেমন-কেমন ভাব। শেষকালে বীরেশ নিজেই একদিন সমস্যার মীমাংসা ক'রে দিল।

মেয়েরা এসেছিল জঙ্গল পেরিয়ে কোন্ দূরের পাহাড়ী গ্রাম থেকে। দুমাস একমাস থাকে,—মোটামুটি মজুরি নিয়ে একদিন তারা দেশে ফিরে যায়। আবার নতুন দল আসে। এদিকে জমাদার, ঠিকাদার, মজুর, মিস্ত্রী, কনট্রাক্টর—তারা আসে অন্য পর্যায় থেকে। মেয়েরা থাকে প্রধানত বীরেশ আর ললিতের তদারকে। পুরুষের ধাওড়া অন্যত্র। বীরেশ একদা সহসা তার এই বিধি নিষেধ তুলে নিল।

ললিত ভীত বিবর্ণ মুখে বললে, করলেন কি আপনি ?

বীরেশ বললে, কেন, কঠিন ত নয়, কেবল মুখের কথামাত্র।

উত্তপ্ত কণ্ঠে ললিত বললে, ওই জানোয়ারদের প্রবৃত্তির রাশ খুলে দিলেন ?

হাসিমুখে বীরেশ শান্তকণ্ঠে বললে, পাশব বৃত্তি উভয়ের মধ্যেই আছে, ললিত।

কিন্তু মেয়েদের সম্ভ্রম আর কর্মশক্তিকে ওরা যে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবে, দাদা ?

প্রথমটা দেবে, কিন্তু সে ঝড় থামলে উভয়েই শান্ত হবে,—ওদের পরিশ্রমে উৎসাহ আসবে। উপবাস করতে করতে স্ত্রী-পুরুষ উন্মত্ত হয়, জানো ত ?

ললিত বললে, স্ত্রীলোককে আপনি ক্ষুধার খাদ্য মনে করেন ?

বীরেশ বললে, পুরুষও ত মেয়েদের ক্ষুধার খাদ্য, ললিত ?

আপনি কি তবে চরিত্র, নৈতিক শুচিতা, মেয়েদের সতীত্ব—এসব কিছুই মানেন না ?

বীরেশ হেসে বললে, সেটা সমাজ ধর্মে, কর্মজীবনে নয়। জীবন হোলো একটা প্রকাণ্ড রণক্ষেত্র,—এ কেবল ভাঙাগড়ার খেলা। বড় বড় দেশের গভর্নমেণ্ট যুদ্ধের সময় কি করে, মনে ক'রে দেখো। কাজের প্রয়োজনে,

বৃত্তি উৎসাহ আর সৎবৃত্তিকে নির্মূল বাধার কাজে তারা একে কিছুকাল আল্‌গা ক'রে দেয়। স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম হানি করার জন্ত যে-গভর্ণমেন্ট অপরাধীকে কঠিন সাজা দেয়, সেই গভর্ণমেণ্ট আবার দরকার হ'লে, 'ফিল্ড-ব্রথেল্‌' সৃষ্টি করে, সৈন্য-শিবিরে নার্সদের নিয়ে যাবার সুবিধা দেয়। ভয় পেয়ো না, সংস্কারমুক্ত হয়ে জীবনের দিকে চেয়ে দেখো।···ক্ষুধার খাদ্য দিয়ে চলো, তোমার কর্মীদল সুস্থ হোক, উৎসাহিত হোক।

কিন্তু এর ফলাফল ?

বেশ ত. সে-ব্যবস্থাও তুমি করবে, সেই হবে তোমার পক্ষে মানুষের কাজ, সেই হবে নতুন কাঠামোয় নতুন সমাজ সৃষ্টি। তার দায়িত্ব তোমার।

কিন্তু এদের পারিবারিক জীবন যদি নষ্ট হয়ে যায় ?

বীরেশ বললে, তাহ'লে ওরা নতুন পরিবার সৃষ্টি করবে, তুমিই হবে তার অভিভাবক। তোমার হাতে রাষ্ট্রশক্তি, তোমার পরিচালনা, তোমারই নিয়ন্ত্রণে তারা বাঁচবে। আগে জীবন, পরে সমাজ ; আগে সংগ্রাম, পরে শান্তি।

ললিত তার মুখের দৃঢ় কাঠিন্যের দিকে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো। পরে বললে, আপনার কাছে কি স্ত্রীলোকের কোনো দাম নেই ? তারা কি কেবলমাত্র ইট-পাটকেল ?...স্নেহ, মায়া, ভালোবাসা, দয়া— এসব কি আপনি কিছুই গ্রাহ্য করেন না ?

বীরেশ হেসে উঠলো। তারপর বললে, সত্যি বলবো ?

বলুন নির্ভুলভাবে সহজ বিশ্বাসে বলুন, আমি হাঁপিয়ে উঠেছি আপনার সঠিক পরিচয় পাবার জন্তে।

তার পিঠের উপর হাত রেখে বীরেশ বললে প্রত্যেকটিরই দাম আছে। কিন্তু ওরা পিছন থেকে টানে, এগিয়ে যেতে দেয় না। ওদের দলিত

ক'রে না গেলে মানুষের বড় কাজে হাত দেবে কি ক'রে? শৃঙ্খল যদি পায়ে থাকে, মুক্তির দুরন্ত ঝড়ে পাখা মেলবে কি ক'রে? স্নেহে যদি অন্ধ হও, ভালোবাসার আঁচল ধ'রে যদি কাঁদতে ব'সে যাও, তবে এই দুর্ভাগা জাতের উপায় কি হবে? ...স্নেহ, মায়া, দয়া...বিশ্রামের দিনে ওগুলো ভালোও লাগে, একটু একটু নেশাও ধরে—কিন্তু এক একটা মানুষের কাছে ওদের দাম ফুরিয়ে যায়, এক একজন দুর্গমের যাত্রীর কাছে ওরা প্রশ্রয় পায় না—বুঝলে হে?

ললিত বললে, আপনার এসব কথার দাম যেন একদিন বুঝতে পারি, বীরেশদা। আপনার কথাতেও আমার নেশা লাগছে, কিন্তু সংশয় আমার কাটলো না—এই ব'লে সে সেদিন ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ হয়ে অন্যত্র চ'লে গিয়েছিল।

কথাটা মিথ্যে নয়, ললিতের বিলাত যাওয়াটাই ব্যর্থ। এই অভিশপ্ত অশ্রদ্ধা আর মানবাত্মার উৎপীড়নের যুগে সে এখনো মনুষ্যত্বের দাম কষতে বসে, অন্যায় দেখলে শিউরে ওঠে; মানুষের দুঃখ দেখলে ব্যথিত হয়! সে এখনো বুঝতে পারেনি, পৃথিবীকে প্রতিপালন আর পাপমুক্ত করার দায়িত্ব যাদের হাতে—তারাই আনছে দিকে দিকে ধ্বংস, দিকে দিকে ইতর স্বার্থপরতার সংঘর্ষ। বাস্তবিক সংস্কার মধ্যে ললিত মানুষ। আধুনিক আকাশে সে নিয়ে এসেছে নিশ্বাস,—অথচ এমন সাত্ত্বিক বিকার তার হোলো কেমন ক'রে—কৌতূহলের বিষয় বৈ কি! তার নিজের স্বীকারোক্তি,— কা'র যেন প্রভাবে তার পরিবর্তন ঘটেছে। বিলেত ফেরতা যুবককে দলছাড়া করে,—কেমন মানুষ সে? গৃহী লোক হঠাৎ গেরুয়া চড়িয়ে নিরামিষ-ভোজী হয়—কোন্ সন্ন্যাসীর মন্ত্রে?

সেদিন ল্যাবরেটরিতে ঢুকে বীরেশ একটু বিস্মিত হোলো। এই কক্ষের অধিনায়ক হোলো ললিত। সেদিন সকাল সকাল ছুটি হওয়ায়

অ্যাসিস্ট্যান্ট্‌রা চ'লে গেছে। ঘরের ভিতরে সবত্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কলকব্জা আর অসংখ্য কাঁচের শিশি আর টিউবের ভিড়। এই পরীক্ষাগার নির্মাণ করতে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু সেই ল্যাবরেটরির অসমাপ্ত কাজ ফেলে এক কোণে ছোট টেবলটির কাছে ব'সে ললিত লেখাপড়ায় একেবারে তন্ময়। এটা পাঠাগার নয় সবাই জানে—অতএব তার এই একান্তে আত্মগোপন ক'রে থাকাটাও কিছু বিসদৃশ বৈ কি!

এমনি তন্ময় যে, বীরেশ এগিয়ে এসে কাছাকাছি দাঁড়ালো, ললিত বুঝতে পারেনি। মনটা তার এখনো কৌমার্য প্রভাবে কোমল, সেজন্য তার একাগ্রতাটাও সুকুমার।

কি হে, সবাইকে লুকিয়ে পাড়া ছেড়ে, কাজকর্ম ছেড়ে এমন কী রাজকার্যে ব্যস্ত বলো ত?

চমকে উঠে ললিত সলজ্জভাবে বললে, না···এমনি···একখানা চিঠি লিখছি।

চিঠি ত আমরাও লিখি হে, কিন্তু তার জন্যে ত রামগিরি পর্বতের নির্জন আর নিভৃত চূড়া দরকার হয় না?

ললিত হেসে উঠলো। বললে, মেঘদূত হোলো কবিতা, এটা কিন্তু গদ্য, স্যার।

বীরেশ বললে, গদ্য-কবিতাও ত হ'তে পারে, ভাই। বেশ ত, কি রকম সাহিত্য-রচনা করলে একটু শোনাও, একটুখানি মৌতাত হোক।

রক্তাক্ত মুখে ললিত বললে, আমাকে কি আপনি আত্মহত্যা করতে বলেন?

কেন? হঠাৎ?

একখানা চিঠি। যে লিখছে, আর যাকে লেখা হচ্ছে, তাদের একান্ত ব্যক্তিগত।

বীরেশ বললে, প্রেমপত্র নাকি ?

ছি ছি,—ললিত বললে, কী যে আপনি বলেন ! একটু মন দিয়ে চিঠিখানা লিখছি, এই যা ।

হাসিমুখে বীরেশ বললে, আচ্ছা আচ্ছা,—লেখো, আমি যাচ্ছি আমাদের কোয়ার্টারে। কাল রবিবার, একটু বিশ্রাম পাওয়া যাবে—এই ব'লে সে বেরিয়ে গেল। তার বয়স হয়েছে, জুলফির গোছা চুলেও পাক ধরেছে—এমন একটা অনাবশ্যক কৌতূহলের জন্য সে একটু লজ্জিত হোলো বৈ কি !

কোয়ার্টারে এসে পায়ের জুতোটা ছেড়ে সে সটান তার বিছানায় গা এলিয়ে দিল। কেমন একটা নিষ্ফল অভিমান ভিতর থেকে তার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো। অনেক বছর চ'লে গেছে, আজকে সে আর ঠিক বুঝতে পারে না, তাকে সবাই ত্যাগ করেছে, অথবা সে নিজেই সব ছেড়ে দিয়েছে। ললিতকে যা নিয়ে সে আজ পরিহাস করছে, একদিন সেও ত এই হাস্যকর মনোবৃত্তিতে জড়িত ছিল। সেদিন নিজেকে সে বুঝতে পারেনি, বয়সে ছিল তরুণ, কিন্তু আজ ললিতের ভিতর দিয়ে নিজের অতীতকে সে অনুভব করতে পারছে। হয়ত সে অর্বাচীন ছিল, কিন্তু নারী সম্পর্কে বিদ্রূপ কটাক্ষ করবার অধিকার আর যারই থাকুক, তার নেই। নারীর কাছ থেকে সে পেয়েছে অনেক, সে-পাওয়ার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, তার প্রাপ্তিটা বরাবরই অপ্রত্যাশিত, অনাহুত। মানুষ হয়েছে সে মাসী-দিদির স্নেহচ্ছায়ায়, তার শৈশবের সঙ্গী ছিল মেয়েরা। তাদের সঙ্গে হেসেছে, কেঁদেছে, বিবাদ করেছে। তার তরুণ জীবন থেকে আরম্ভ হোলো নলিনীর সঙ্গে সাহচর্য। সে-ইতিহাস যদি অতঃপর অপ্রকাশিত থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু তার জীবন যে আনন্দে পরিপ্লাবিত হয়েছে সে-কথা

অস্বীকার করবে কে? কে অস্বীকার করবে—তার চরম দুর্দশার দিনে অন্ন দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, অপত্য স্নেহ দিয়েছে ওই মুসলমানী তাঁতীবৌ? তারপর,—তার জীবনের এই যে বিরাট কীর্তি,—এর সৃজনমন্ত্র কার কাছে পাওয়া? সেও ওই নদীর ওপারে তার রহস্যময় কুহেলিকায় বীরেশকে আবৃত ক'রে রেখেছে। কী যে সম্পর্ক তার অনুশীলার সঙ্গে, সম্ভবত উভয়েই জানে না। হয়ত নির্দিষ্ট তার নিরীখ কিছু নেই, কোনো ব্যাখ্যা নেই, শ্রেণীবিভাগ নেই…তাই হয়ত এত কৌতুক, এত সংশয় আর কৌতূহল…এত হৃদয়াবেগ আর চৌম্বক শক্তির খেলা। অনুশীলা নৈলে তার স্থান ছিল কোথায়?…সে ত কেবল টাকা দেয়নি, কেবল একাগ্র পরিশ্রম আর উৎসাহেই তাকে সকল কাজে উদ্বুদ্ধ করেনি,—সে তার অদ্ভুত হ্লাদিনী শক্তিতে তাকে সকল দুর্গমে, সমস্ত বিপদে, সর্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। বারে বারে পরাজয়ে তার পৌরুষে ধরেছিল ভাঙন। বার বার মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে সে ক্লান্তিতে—কিন্তু অনুশীলা তার প্রতিভাকে খুঁচিয়ে যেন সুপ্ত সিংহকে জাগিয়ে তুলেছে। নারীর কাছে কৃতজ্ঞতা তার অপরিসীম, তাদের নিয়ে পরিহাস করবার অধিকার ত তার নেই!

ছুটির দিনটায় বীরেশ প্রায় সময়ই একা থাকে। সেদিন হিসাবপত্র কিম্বা লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারে সে বিশেষ মন দিতে চায় না। কিন্তু একা থাকলেও এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির সম্পর্কে কিছু একটা পরিকল্পনা নিয়ে সে ছুটির দিনটা কাটিয়ে দেয়। ললিতের নিজের একখানা মোটর-বাইক আছে, সেখানা হাঁকিয়ে সে জেলার বড় শহর পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ে। এখানকার লাইব্রেরীটাকে বেশ একটা পাঠচক্র ক'রে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টায় সে থাকে। শীঘ্রই জেলা

ম্যাজিস্ট্রেট এসে এই লাইব্রেরীর উদ্বোধন করবেন। সম্প্রতি নবনগরের প্রধান কর্মীদের নিয়ে একটি পৌরসভা গঠনের আয়োজন চলছে।

কিন্তু গল্পগুজব আর কথাবার্তায় সেদিন শীতের অপরাহ্ন গড়িয়ে গেল। আজকে আর কোথাও যাওয়া সম্ভব হোলো না। দুজনে বেড়াতে বেড়াতে সুচিত্রার তীর অবধি এসে পৌঁছলো। তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলেছে। ওপারে বহুদূরে দেখা যায়, সেদিকের গ্রাম ও প্রান্তর শীতের অস্পষ্ট হিমাচ্ছন্ন কুয়াশায় অন্ধকার হয়ে আসতে আর বিলম্ব নেই। ওপারের দিকে তাকালে বীরেশ যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

অনেকদিন হোলো বটে—বীরেশ বললে, অনেকদিন ওখানে যাওয়া হয়নি। কি বলো?

ললিত বললে, উদ্বেগের আর কি কারণ আছে, স্যার? আপনি ত অয়ুর টাকা সুদসুদ্ধ ফেরৎ দিয়েছেন।

বীরেশ হাসিমুখে বললে, তা বটে। তবে কি জানো, মাঝে মাঝে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এলে মেয়েদের মন একটু খুশি থাকে হে। কই, তোমার ভগ্নীর চিঠিপত্রও ত অনেকদিন আসে না। ব্যাপার কি বলো ত?

ও চিরকালই একটু মাথা পাগলা। যাকে বলে 'মুডি'। এখন চিঠি বন্ধ, কিন্তু চিঠি চললে রোজ একখানা।

তা দেখেছি বটে।

মা বাবা আদর দিয়েই ওর মাথাটি খেয়ে গেছেন। দেখেন নি, বুড়ো বয়সে আজো কেমন ক'রে ঝগড়া করে আমার সঙ্গে? আমাকে একটুও মানে না। ওকে বিলেত নিয়ে যাওয়া হয়নি, তাই ওর রাগ।

বীরেশ বললে, তোমাদের সংসারে এখন কে কে আছেন?

ললিত বললে, আছেন সবাই, কেবল বিশেষ প্রয়োজনীয় দুজন নেই,···মা আর বাবা।

তোমরা ত পাঁচ ভাই শুনেছি, বিয়ে করেছেন ক'জন?

সকলেই, কেবল আমি বাদে।

হেসে বীরেশ বললে, তুমি হঠাৎ বাদ পড়লে কেন? তুমি ত জানো, বাঙলা দেশে বিয়ে কেউ করে না, বিয়ে হয়! তোমার বিয়ে হয়নি কেন?

ললিত একবার তার মুখের দিকে তাকালো। একটা প্রশ্ন চট্ ক'রে তার মুখে এসে পড়েছিল, কিন্তু বীরেশের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে তার বয়সোচিত কুণ্ঠা ছিল—সুতরাং সে আত্মদমন ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিল।

শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা। বনময় নদীর তীরে শীত বেশি, সুতরাং এরই মধ্যে নবনগরের ঘাটগুলি নির্জন হয়ে গেছে। সামনের ঘাটে তাদের নিজেদের নৌকাটি বাঁধা। বড়বাবু এবং ছোটবাবু অনেকদিন পরে নদীর তীরে এসেছেন, অতএব আশপাশে দুএকজন ছায়াচারী তাঁবেদার যে নেই তা নয়। তারা হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছে, ডাক শুনলেই এগিয়ে আসবে।

কিন্তু বাবুদের দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বরং বীরেশ ও ললিত নিজেরাই সিঁড়ি দিয়ে নেমে নৌকায় গিয়ে উঠলো। তখন একটি লোক, লোকটি নৌকার রক্ষী, ছুটে এসে নৌকার শিকল খুলে দিল, এবং তার পিছনে পিছনে দ্বিতীয় ব্যক্তি দুখানা দাঁড় এনে নৌকায় তুলে দিল। বীরেশ বললে, তোরা যা, আমরা নিজেরাই চালিয়ে নিয়ে যাবো।

মাথার উপরে হিমগদগদ জ্যোৎস্না, শীতের বাতাস কন্‌কনে। অদূরে চন্দন পাহাড়ের ছায়া নেমে এসেছে সুচিত্রার বুকের উপর। নদীতে কোনো তরঙ্গ অথবা আন্দোলন নেই, একান্তভাবে কান পেতে থাকলে ভিতরের একটা অস্পষ্ট প্রাণ-কল্লোল শোনা যায়। ললিত বিলাতে ক্যাম-এ নৌকা চালনা করতো, সে নিজে তার সুদক্ষ দুই হাতে দুইখানা দাঁড় ধ'রে উত্তর দিকে ধীরে ধীরে নৌকা বেয়ে চললো। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। রাতটি যে আজকে মধুর, সন্দেহ নেই। নদী প্রশস্ত নয়, দুইপারে ছোট ছোট শালের জঙ্গল, ধান কাটা মাঠ, মাঝে মাঝে কৃষ্ণচূড়ার ঝোপ, উঁচুনিচু ডাঙা,—প্রায় সবই দেখা যায়। কিছুদূর গেলে একটা খাঁড়ি নদী থেকে বেরিয়ে গর্দানবক্সীর জঙ্গলের দিকে চ'লে গেছে। আগে সারকিট্ হাউস থেকে সরকারী কর্মচারীরা ওদিকে শিকারে যেতো। খাঁড়ির মুখে এখনো অনেক সময় জানোয়ার পাওয়া যায়।

তুমি যে সেই সন্ন্যাসীর পাল্লায় প'ড়ে বোষ্টোম হ'লে, সে ব্যাপারটা কেমনতরো', হে?

সন্ন্যাসী?—ললিত সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালো।—সন্ন্যাসী আবার কি?

বীরেশ বললে, হ্যাঁ গো, সেই যে তোমাকে মাছ, মাংস ছাড়ালো, খদ্দর ধরালো', দীক্ষা দিল—লোকটা কি তান্ত্রিক নাকি, ললিত?

দাঁড় বাইতে বাইতে ললিত বললে, তান্ত্রিক হয়ত হ'তে পারে, কিন্তু সন্ন্যাসী ত নয়, দাদা!

বেশ ত, না হয় গৃহীই কোনো। আজকাল বর্ণচোরা সন্ন্যাসীর অভাব কি? কেউ মাথা কামায়, কেউ বা চুল রাখে। কেউ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, কেউ বা কামিনীদের সম্পর্কে উৎসাহী। কারো তপস্যা

শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনে, কেউ বা প্রচুর ভোগবাচ্ছল্যের মধ্যে সাধনায় বসে। তুমি কোন্ দলে ?

কোনো দলেই নয়।

তাহলে ত আরো বিপদ। তুমিই একটা দল এবং বলা বাহুল্য তোমার দল গজালে আধ্যাত্মিক দলাদলির পরিমাণই বাড়বে। ঈশ্বর কোথায় রইলেন তার ঠিক নেই, কিন্তু সন্ন্যাসীরা রইলো তার পথ আগ্‌লে।

ললিত হেসে উঠলো। বললে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, চৌধুরী সাহেব। আমার দল দলাদলি কিছুই নেই। ঈশ্বরের ছায়াও মাড়াইনে, মন্ত্র আর দীক্ষাও আমাকে কেউ দেয়নি, কোনো সন্ন্যাসীকেও আমি জানিনে। আমি বর্তমান জীবনে জানি দুজনকে। একজন আপনি, এবং আর একজন—।

আর একজনটি কোন্ দুর্ভাগা শুনি ?

আপনি ত শোনবার জন্ম উৎসুক নন্ ?

তা নই অবশ্য।—বীরেন বললে, তবে কি জানো, তুমি আমার সত্যি সত্যিই প্রিয়। সত্যি বলতে কি, রজনী যাবার পর থেকে আমার হাত ভেঙে গিয়েছিল। তুমি এসে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছ। অপর ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি কৌতূহল বড়ই অশোভন, কিন্তু ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে আনন্দ-বেদনার সঙ্গী হ'তে ভালোই লাগে।

ললিত বললে, আপনার সম্বন্ধে ত এতদিন আপনি কিছুই বলেন নি ?

বলবার ত কিছুই নেই ভাই। আমি গৃহত্যাগী মানুষ, মা নেই, বাবা আছেন। তারপরে আমি এতকাল জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত। বাকিটা ত তুমিই দেখতে পাচ্ছ।

আপনি ত বলেন নি, আপনি বিবাহিত কিনা।

বীরেশ হেসে উঠলো—ওঃ ভুলেই গিয়েছিলুম বটে। বলতে আপত্তি নেই—বলবার উৎসাহও অবশ্য নেই—তবে হ্যাঁ, মালাবদল একটা এক-কালে আমার হয়েছিল বটে।

ললিত সবিস্ময়ে বললে, আপনার এ কথার মানে? স্ত্রী কোথায় আপনার?

জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা না গেলেও একটা ঈষৎ অপরাধের ছায়া বীরেশের মুখে ভেসে উঠলো। কিন্তু সহজ কণ্ঠে সে বললে, সে-জবাব তোমাকে সঠিক দেওয়া কঠিন, ললিত।

ললিত বললে, আপনার সঙ্গে কি তার কোনো সম্পর্ক নেই?

না। তাঁকে মনেও নেই। খবরও আমি রাখিনে।

ললিত চুপ ক'রে গেল। অনেকদূর তারা এসে পড়লেও আরো এগিয়ে চললো। উপরে তারকাখচিত আকাশ, কোথায় কোন্ গাছে যেন পেচকের কণ্ঠস্বর জেগে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। পকেট থেকে পাইপ বা'র ক'রে জ্বালিয়ে বীরেশ একসময় বললে, যাকৃগে। তোমার আধ্যাত্মিক রূপান্তরের কাহিনীটা এবার শুনি, বলো ত?

ললিত দাঁড়টানা থামিয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, সেটা সামান্যই, মিস্টার চৌধুরী।

বীরেশ বললে, গাছের বীজটাও সামান্য, কিন্তু তার থেকেই বনস্পতির সৃষ্টি।

ললিত বললে, আপনাকে বলবার দোষে যদি কোনো অন্যায় ক'রে ফেলি?

অন্যায় কিসের?

মনস্তত্ত্বে বলে, আমাদের গুপ্ত কামনা মিথ্যার উপরে রং ফলিয়ে

তাকে সত্য ক'রে তুলতে চায়। আমার ভুল যদি আমি বুঝতে না পেরে থাকি, দাদা ?

বীরেশ বললে, তুমি কি নিজেকে বিচার করোনি ?

ললিত বললে, করেছি, কিন্তু মনের নাগাল কি আপনিই পেয়েছেন ? এমন যদি হয়, যাকে বড় ক'রে তুলতে যাবো, বলবার দোষে তিনি যদি ছোট হয়ে যান্ ? প্রতিমাকে আমরা সবাই পুজো করি, কিন্তু কুসংস্কারের বেড়াজালে ঘিরে তাঁকে হেয় ক'রে তুলি—সেকথা আমরা নিজেরা বুঝতেই পারিনে, এই দুঃখ !

পাইপটা একবার টেনে ধোঁয়া ছেড়ে বীরেশ বললে, তোমার মেজাজটা রোমান্টিক, সেই কারণে হয় ফাঁপিয়ে রঙীন করে পুজো করতে চাও, আর নয়ত নামিয়ে দিতে চাও রসাতলে। দুটোই মিথ্যে। নির্ভুল দৃষ্টিতে সবাইকে নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করতে পারাই হোলো পূজা ও শ্রদ্ধার প্রথম বনেদ। মনের অতল তল অবধি পরিশুদ্ধ না থাকলে তুমি সংস্কারমুক্ত র‍্যাশন্যাল্ মন পাবে কোথায় ? মানুষের সত্যকারের দাম কষতে পারার অভাবেই ত আজ দিকে দিকে এত অশান্তি, আর হানাহানি। অর্থাৎ বলতে চাই, সত্য বিচারের গুণেই মানুষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে অন্যের চোখে, নিন্দায় অথবা সুখ্যাতিতে নয়।

সত্য বিচারের ত কোনো নির্দেশ নেই, দাদা ?

বীরেশ হেসে বললে, সেই কারণেই ত প্রতিভার ওপর আমাদের এত শ্রদ্ধা। তারা আনে নির্ভুল দৃষ্টি, তাদের সেই তৃতীয় নয়নে ধরা পড়ে তোমার সত্য পরিচয়, তোমার প্রকৃত স্বভাব। আমি জানি তুমি কি বলবে, ললিত। কা'র কথা বলতে চাও, হয়ত তাও খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। তাই তোমাকে এসব ব'লে রাখলুম।

জানেন আপনি ?

হয়ত জানিনে, আমার আন্দাজ মাত্র। কিন্তু তোমার কাছে জীবন এখনো রহস্যময়, এখনো জটিল,—তাই তুমি জানতে চাও, জানাতে চাও। তোমার মনের স্বাস্থ্য আর শুচিতা এখনো সুকুমার অবস্থায় রয়েছে।

সলজ্জ কণ্ঠে ললিত বললে, আপনার আন্দাজটা কি আগে বলুন?

বীরেশ হো হো ক'রে হেসে উঠলো। বললে, শেষ পর্যন্ত আমার গোয়েন্দাগিরি তুমি ধ'রে ফেলতে চাও? কিন্তু তুমিই ত খাল কেটে কুমীর নিয়ে গিয়েছিলে!

হাসিমুখে ললিত বললে, কি রকম?

বীরেশ বললে, সেদিন তোমার ঘরে চা খেতে গেলুম, তখনো আমার মন নিষ্পাপ। তুমি কি যেন কাজে একবারটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে। তখন পড়ন্ত রোদের আলো। চেয়ে চেয়ে দেখলুম তোমার রুমালে, তোয়ালে আর বালিশের ওয়াড়ে লাল সুতোয় লেখা একটি নামেরই ছড়াছড়ি। নামটি হোলো আনন্দময়ী!

শুদ্ধ বিস্ময়ে একটি মুহূর্ত কাটিয়ে ললিত আবার দাঁড় টানতে লাগলো। তাকে বহুক্ষণ অবধি নিরুত্তর দেখে বীরেশ এক সময়ে বললে, কি হে, আন্দাজটা কি মাঠে মারা গেল নাকি?

গেলে ভালোই হোতো, দাদা।

কেন?

এতক্ষণ পরে ললিত নৌকার মুখ ফিরিয়ে দিল। অল্প স্রোতের টানে নৌকা ধীরে ধীরে চললো। এতক্ষণ দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ শব্দ ছিল; এখন সম্পূর্ণ নিঝুম হয়ে গেল। সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকিত আঁকাবাঁকা নদীপথ অপরূপ এক মায়াজাল, কেমন একটি স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছে। সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ললিত বললে, আপনার শোনবার আগ্রহ

দেখে আমি ভীত হচ্ছি, তাঁর বিষয় বলাটা আমার পক্ষে একটা সমস্যা বিশেষ। কারণ একে যদি কেউ পরিহাস ক'রে প্রণয় কাহিনী বলে, তাহ'লে আমি খুবই আহত হই।

বীরেশ বললে, মেয়েটি কেমন ?

ললিত বললে, মেয়েটি না বলাই ভালো, কারণ তিনি প্রায় আমার সমবয়সী। আজো তিনি বিবাহ করেন নি। তাঁর চেহারা কেমন এ আলোচনা করা আমার পক্ষে অশোভন। তবে তাঁর সুশ্রী চেহারা দেখলে অনেকেরই মনে হবে, বাঙালা দেশে জন্মানো তাঁর পক্ষে আকস্মিক। তাঁর দেহের বাঁধন আর মনের কাঠিন্য বাঙালা দেশের নরম মাটিতে খাপ খায় না।

কঠিন কেন বলছ ?

কঠিন এই কারণে যে, কোনো চিত্তবৃত্তির উচ্ছ্বাস তিনি বরদাস্ত করেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি বি-এ পাশ করেছেন কিন্তু শিক্ষিত হলেও, স্ত্রীলোক হলেও তাঁর প্রকৃতিতে কেমন যেন একটা রুক্ষতা—যেন মরুভূমির একটা অংশ। অনেকবার মনে করেছি এটা তাঁর আত্মনিগ্রহের ফল, স্ত্রীলোক যথাসময়ে সংসারী না হ'লে তার স্বভাবের বিকৃতি ঘটে; কিন্তু সে-ভুল বার বার আমার ভেঙে গেছে।

বিয়ে তিনি এতদিন করেন নি কেন ?

ললিত বললে, সময় পান নি, অন্তত তাঁর এই অভিমত। সংসার-ধর্ম পালন করতে গেলে সময়ের একটা বাজে খরচ আছে, সে সময় তাঁর হাতে নেই। অনেক সময় মনে করেছি, এটা প্যাথলজি, মরবিডিটি, অসুস্থ চিত্তের বিকৃতি। মনে করেছি, চিকিৎসা বিজ্ঞানে হয়ত একেই বলে ফ্রিজিড, অথবা যৌনরহিত অবস্থা। কিন্তু প্রত্যেক দিনের সংস্পর্শে এসে দেখেছি, আমারই সব ভুল।

তোমার সঙ্গে কিরূপ সম্পর্ক ?

যেমন সম্পর্ক দুই ব্যবসাদারের। কত জিনিস আমাকে দিয়েছেন উপহার, কত গল্প করেছেন আমার সঙ্গে রাতের পর রাত জেগে, কত দেশ বেড়িয়েছেন আমার সঙ্গে কত আনন্দে,—কিন্তু সেখানেই শেষ, তার জের টানা নেই কোথাও। অথচ দেখেছি অন্যের দুঃখে তাঁর হৃদয়ের কী গুণ, স্নেহ দয়া ভালোবাসার কী আশ্চর্য প্রকাশ—আর কিছু না হোক, এমন ধার্মিক মেয়ে আর আমি দেখি নি।

বীরেশ বললে, এই ত তোমার অতিশয়োক্তি আরম্ভ হোলো, ললিত।

ললিত বললে, হয়ত হোলো। অহঙ্কার ক'রে বলতে পারি, এ অবস্থায় পড়লে সকলেরই হোতো। পথ থেকে যিনি আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সোনার খনির সন্ধান দিয়েছেন তাঁর প্রতি অতিশয়োক্তি যুক্তিহীন নয়।

তা হ'লে আমি যা ভাবছি তাই সত্যি বলো ?

ললিত বললে, হয়ত আমিও যা ভাবছি তাও মিথ্যে।

তুমি নিশ্চয় প্রেমে পড়েছ, ললিত।

ঠাট্টা করবেন না, দাদা। ভগবান সব সময় ভালোবাসার পথ ধ'রে চলে না। আমার ভালোবাসার সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য কখনো দেখিনি।

বীরেশ বললে, তাহ'লে এমন হ'তে পারে তুমিই উন্মাদ কিন্তু তাঁর মন রয়েছে অন্যত্র। তুমি তাঁকে বুঝতে পারোনি।

ললিত বললে, মিস্টার চৌধুরী, আপনার একথা সত্য হ'লে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম। তাঁর মন অন্যত্র বটে, তবে পুরুষের দিকে নয়, মানুষের পথে। সংসারে তাঁর ভালোবাসার কোনো নির্দিষ্ট মানুষ থাকলে একটা সান্ত্বনা থাকতো এই যে, আনন্দময়ীর জীবন ব্যর্থ যায়নি—কোথাও তিনি একটা যথার্থ বস্তু খুঁজে পেয়েছেন।

তার কণ্ঠে আবেগ লক্ষ্য করে বীরেশ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে গেল। ললিতের বয়স এখনো কম, আবেগ প্রবণতা তার পক্ষে স্বাভাবিক। অস্বীকার করছে সে আসল বস্তুকে, কিন্তু রঙে রসে উচ্ছ্বসিত তার কণ্ঠস্বরে নির্ভুল মনোভাবই ব্যক্ত হচ্ছে। হৃদয় তার আজও কোমল, আজও তার উৎস শুকিয়ে ওঠেনি। বীরেশ আনন্দই বোধ করতে লাগলো।

তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হোলো কেমন ক'রে?

ললিত বললে, আমার এক ব্যারিস্টার বন্ধুর আগ্রহে; বিলেত থেকে ফিরে নোঙর ছেঁড়া নৌকার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম—এমন দিনে দর্শন পেলুম তাঁর। দেশের কাজ কাকে বলে আমি জানতুম না। মানুষের ভালো করার দাম যে কিছু আছে এও আমি বুঝতুম না। কিন্তু সেদিন এসবের মানে খুঁজে পেলুম।

তিনি কি স্বদেশী নেত্রী?

নেত্রীর চেয়ে বোধ হয় কর্মী বলা যেতে পারে। মস্ত বড় সম্পত্তির তিনি মালিক। মা নেই তাঁর, বাবা আছেন, তিনি সদাশিব। আনন্দময়ী নিজেই বিষয়-কর্মের তদারক করেন। কয়েকটা মেয়েদের প্রতিষ্ঠান তিনি গ'ড়ে তুলেছেন নিজের খরচে। আমার হাতে ছেড়ে দিলেন তাদের পরিচালনার ভার। আজো সেগুলো ভালোই চলেছে।

বীরেশ বললে, তুমি সে সব ছেড়ে তবে এখানে এলে কেন?

ললিত বললে, সেগুলো মেয়েদের কাজ, আমার নয়। আনন্দময়ী যেদিন বুঝলেন, আমার বিদ্যা ও শিক্ষার ক্ষেত্র অন্যত্র, সেদিন তিনিই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

হাসিমুখে বীরেশ বললে, তোমার কাছে কাজ আদায় ক'রে তোমাকে পথে ভাসিয়ে দিলেন?

ভাসিয়ে ত দেন নি। ভাসিয়ে তিনি দিতে পারেন না।

তবে?

ললিত চুপ ক'রে গেল। বীরেশ কৌতুক ক'রে বললে, তবে তোমাকে সরিয়ে রাখার অর্থ?

ললিত বললে, আপনাকে তাহ'লে খুলেই বলি, দাদা। কোনো কোনো মেয়ের আচরণে তিনি বড়ই বিরক্ত বোধ করেছেন। তাঁর ধারণা,—ললিত হেসে উঠলো,—তাঁর বিশ্বাস, কোনো কোনো মেয়ে আমাকে নষ্ট করতে পারে। এটা অবশ্যই তাঁর ভুল।

বীরেশ এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। তারপর বললে, যাক্, বাঁচলুম। এতক্ষণে একটা সূত্র পাওয়া গেল। তাই বলো, আমি এতক্ষণ প্রায় অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলুম। তিনি তবে আত্মগুবী কিছু একটা নন্। নারীধর্ম যথেষ্ট প্রবল!

ললিতও হাসলো। হেসে বললে, আপনার টিপ্পনী বড় গায়ে বাজে।

বেশ ত, তোমাকে তিনি যদি এত আগলেই রাখতে চান তবে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থাই তিনি ক'রে ফেলুন না! এতে আর দোষ কি? পাত্র হিসেবে তোমার যোগ্যতা ত' আর কম নয়।

ললিত বললে, একথা ভাবলে কিন্তু আমার পাপ হবে। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎকে যিনি নতুন আদর্শে গড়ে তুলেছেন, তাঁকে আমি শ্রদ্ধাই করি। এদিক থেকে তাঁকে আমি ভাবিনি।

এটা তোমার কমপ্লেক্স, ললিত।

কেমন ক'রে হবে? আমি ত সে-চোখে তাঁকে দেখি নি!

বীরেশ বললে, সেটা তোমার চোখের দোষ। তোমার সঙ্গে বয়সে বাধে না, সমাজনীতিতে আটকায় না, যোগ্যতায় তুমি খাটো নয়, সম্পর্কের দিক থেকে স্বাধীনতা রয়েছে, ভালোবাসা রয়েছে একান্ত—এমন মিলন

দুর্লভ। হয় তোমাদের মধ্যে ভয় আছে, নয়ত অসুখ আছে, নয়ত বা আসলে কিছু ফাঁকি আছে।

ললিত বললে, বেশ ত, তিনি হয়ত নবনগরের দিকে শীঘ্রই আসতে পারেন, তাঁর বাবার কাছে প্রস্তাবটা আপনি করুন!

এলে নিশ্চয়ই করবো তোমাকে কথা দিলুম। কিন্তু তিনি আসছেন কেন?

ললিত বললে, আসবার কথা তিনিই জানিয়েছেন। এদিকে আমরা যে সব প্রাইমারী শিক্ষার কেন্দ্রগুলো খুলছি তিনি যদি এসে সেগুলোর ভার নেন, আপত্তি কি?

বীরেশ বললে, আপত্তি একটুও না।

গতকালও তাঁর চিঠি পেয়েছি।—ললিত হেসে বললে, অবশ্য চিঠিপত্র আপনাকে দেখাতে আমি রাজি নই—

না হে না, খোঁজখবর নিলুম ব'লে চিঠিও কি পড়বো? তা পড়তে যাবো কেন?

ললিত বললে, এদিকের জল হাওয়াও ভালো, তাঁর পক্ষে অসুবিধে হবে না। এ অঞ্চলে মেয়েদের তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের নিয়ে কাজ করতে চান। একটা মাত্র কাজ নিয়ে তিনি থাকতে চান না—নতুন নতুন প্ল্যান্ ছাড়া তাঁর সময়ই কাটে না। যদি আপনি কখনো তাঁকে দেখেন, দেখবেন তিনি আপনারই একটা নারী-সংস্করণ। তফাৎ এই, আপনি যেমন বিরাট প্রতিভা, তিনি তেমন বিপুল কর্মশক্তি।

নৌকা তাদের ঘাটের কাছে প্রায় এসে গেছে। বীরেশ বললে, তুমি আমাকে এমন ভাবে সুখ্যাতির ঘুষ খাইয়ে রাখলে যে, তাঁকে প্রশংসা না করার আর পথ রইলো না।

উত্তেজিত হয়ে ললিত বললে, না: আপনি আমাকে একটুও বিশ্বাস করেন না দেখছি।

করি হে করি—বীরেশ বললে, হয়ত তুমি বুঝতে পারবে না ভাই, তোমাকেই আজ একান্তভাবে বিশ্বাস করি। কিন্তু কি জানো? নিরাশাবাদ আমি প্রচার করব না, আমি ক্ষমতা আর প্রতিভার ভক্ত—তবে এই বিশ্বাস আমার এতদিনে ভেঙেছে যে, ক্ষমতার সঙ্গে শান্তির দরকার আমি বুঝতে পারছি, যত বড় ভালোবাসাই হোক, তার ক্ষয় আছে, বিচ্ছেদ আছে, তার বিস্মৃতি আছে। আজ তোমার কাহিনী শুনে নষ্ট বিশ্বাস যদি ফিরে পাই, খুশি হবো। কায়মনোবাক্যে যদি তুমি এবং আনন্দময়ী সুখী হও, হয়ত আমি শান্তি পেতে পারি। কারণ এই জানবো, অনুকূল অবস্থাতে অন্তত দুটো জীবন সার্থক হতে পেরেছে। শক্তিই বলো আর প্রতিভাই বলো—এরা যতই স্ফীত হয়ে উঠুক না কেন, শান্তিকে আয়ত্ত করবার সাধ্য এদের নেই। শান্তি হোলো মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম প্রকাশ—শক্তি আর প্রতিভা তার পদানত। প্রায় দশ বছর হ'তে চললো, একদিন মনে করেছিলুম, বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানুষকে শাসন করবো, প্রকাণ্ড সম্পদ সৃষ্টি ক'রে একটা দানবীয় সাম্রাজ্য চালনা করবো, আমার হাতে নতুন সমাজ-শৃঙ্খলার পত্তন হবে, দেশের কাছে চূড়ান্ত সম্মান আদায় ক'রে নেবো। কিন্তু সেদিন অন্য দিকটা ভাবিনি। ভাবিনি যে নিজেই পুড়ে-পুড়ে ছারখার হ'তে পারি!

নৌকা ঘাটে রইলো। ওরা দুজন ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠে পথ ধ'রে চললো; রাত তখন প্রায় দশটা বাজে। আকাশে আর কুয়াশা নেই। পশ্চিমে পাহাড়ের পিছন দিকে চাঁদ নেমে গেছে। মৃদু জ্যোৎস্নার আলোয় কাঁকর পাথরের পথে মস্ মস্ শব্দ করে দুজনে বাসার দিকে চললো।

সে-রাত্রে অনেকদিন পরে আবার যেন একটা অহেতুক অবসাদ চারিদিক থেকে বীরেশকে ঘিরে দাঁড়ালো। এটা নতুন নয়। বহুদিন অন্তর হঠাৎ এক একবার যেন তার প্রাণের দিগন্ত থেকে একখণ্ড অন্ধ মেঘ মাথা তুলে সমগ্র আকাশকে ভারাক্রান্ত করতে চায়। সংশয়-নিরাশায় যেন সে অবসন্ন হয়ে আসে। বাইরে যেমন সে প্রবল শক্তির খেলা খেলছে, ভিতরে তেমনি সংগ্রাম চালিয়েছে এই অশরীরি প্রেতাত্মার বিরুদ্ধে। আজ রাত্রে বহুদিন পরে বদ্ধ ঘরের ভিতরে ম্লান আলোর নিচে সেই প্রেতছায়া তার দিকে যেন আবার হাত বাড়ালো। হয়ত সে ক্ষুধার খাদ্য চায়, হয়ত সে চায় হিসাব নিকাশ, হয়ত বা সে আবার নিয়ে যেতে চায় নিরাশার অন্ধগুহায়। আত্মনিগ্রহ সে করেছে সন্দেহ নেই, নিজেকে অস্বীকার করেছে, ভাগ্যলিপিকে মুছে দিয়ে নতুন ভাগ্য রচনা করেছে। কিন্তু হৃদয় তার এমন ভয়ানক ভাবে নিঃস্ব হয়ে উঠলো কেন?...কেন গেল সব শুকিয়ে?...সে কি ত্যাগ করলো সবাইকে, কিম্বা সবাই গেল তাকে ছেড়ে দূরে? তবে ক্ষমতার অধিকারী সে হ'তে পারলো কোথায়? শুধু সম্পদের মূল্য কি, যদি সে মানুষের শান্তি আনতে না পারে? কেবলমাত্র ক্ষমতার অর্থ কি, যদি মানুষের উপর প্রভুত্ব সে না করতে পারে?......

অথচ এর বেশি কিছু নয়। সে তার বাধাকে চূর্ণ করলো, শত্রুকে খুন করলো, নতুন নগর সৃষ্টি করলো, প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হোলো, জয় ক'রে বেড়ালো সর্বত্র—কিন্তু এদের সার্থকতা কোথায়? কোথায় গেলে তাদের পাওয়া যাবে যাদের জন্য তার সমগ্র সত্তা ভিখারীর মতো অঞ্জলী পেতে রয়েছে?...দেখতে দেখতে তার যৌবনকাল পেরিয়ে গেল। তার বয়সের উপর এলো প্রৌঢ়ত্ব ঘনিয়ে—বন্য জন্তু যেমন চুপি চুপি শিকারকে অনুসরণ ক'রে আসে। যে কঠোর সংযম আর কৃচ্ছ্রসাধনকে

সে অস্ত্র হিসাবে তার কর্মজীবনে ব্যবহার করে এসেছে, তারা যেন বিদ্রোহী সেনাদলের মতো মাঝপথে এসে আর হুকুম মানতে চায় না। নিগ্রহ-জর্জর, বঞ্চিত, তৃষিত,—তারা ফিরে দাঁড়িয়ে পাওনা চুকিয়ে নিতে চায়।

দূরের মন্দিরে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বেজে গেল। শীতকাতর অসাড় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মন্দিরের সেই মন্থর ঘণ্টার ডিং-ডং আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে এলো। ওই মন্দিরটি সে নির্মাণ করেছে নবনগরের হৃদপিণ্ডের উপর। পূজারী আছেন, সেবাইৎ আছেন। সেখানে বারোয়ারীতলা, নাটমন্দির, যাত্রাতলা—কিছুরই অভাব নেই। একটি বিশাল পদ্মের উপর সমগ্র মন্দিরটি দণ্ডায়মান। জগতে দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে না এই মন্দিরের ইতিহাস। বোধহয় রঞ্জনী জানতো, কারণ একমাত্র সে দেখেছিল নলিনীর কাছে তার লেখা চিঠি। এ মন্দিরের নাম পদ্মাসনা, মনে মনে নলিনীর নামেই উৎসর্গ করা।—আজ সে কোথায় আছে কোনো সংবাদ নেই। নিজের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় সে মঞ্চ থেকে আত্মলোপ করেছে, সে আজ কতদিন হোলো। আত্মসম্মান আর পারম্পরিক কল্যাণবোধকে সে ভালোবাসার উপরে ঠাঁই দিয়েছে। মর্মে মর্মে দগ্ধ হয়ে তার মৃত্যু ঘটবে, বরং সেও ভালো—কিন্তু নিজের অস্তিত্ব ঘোষণার জন্য সে চীৎকার ক'রে এগিয়ে আসবে না। আত্মগোপন করবে সে করুণ বেদনায় কিন্তু আত্মপ্রকাশ ক'রে সে দুঃখ দিতে চাইবে না। তাই মন্দিরের নাম পদ্মাসনা বটে—ভিতরে কোনো দেবীমূর্তি নেই। অপর কোনো মূর্তিই সেখানে মানাবে না।

আলোটা নিবিয়ে শোবার আয়োজন করতে গিয়ে সহসা একখানা চিঠি তার চোখে পড়লো। চিঠিখানা হাতে নিয়েই সে বুঝতে পারলো

এ চিঠি কা'র। উপরে ডাকের ছাপ নেই, খামখানা রঙীন, সুগন্ধী। মেয়েলী হাতের ছোট ছোট সরু ইংরাজী হরফ। চিঠিখানা খুলে বীরেশ পড়তে লাগলো।

"প্রিয়,

চিঠিখানা গোপন। পাছে আর কারো হাতে পড়ে তাই লোক মারফৎ পাঠাচ্ছি। আজ কয়েকদিন আমি শয্যাগত, নৈলে নিজেই গিয়ে তোমাকে ধরে আনতুম। ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। মিঃ সেনের বদলী হওয়াটা স্থগিত ছিল কিন্তু সরকারী প্রস্তাব আবার এসেছে। হয়ত শীঘ্রই আমাদের দেবীপুর ছেড়ে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে একটা অতিশয় বিবাদ আছে, দেখা হলে বোলবো। তোমার লেখাপড়ার ব্যাপারটা আমি সেরে দিতে চাই, আর দেরী কেন? দেবীপুর সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আছে, তুমি এলে সে আলোচনা করা যাবে।

এমন ভাগ্য আমার নয় যে, না ডাকলে তোমার দেখা পাবো। অনাহুত চিঠি তোমার আসবে সে কল্পনাও আমি করিনে—সুতরাং তোমার ওপর রাগ ক'রে তোমারই পায়ের কাছে হাত বাড়ালুম। ইতি

বিড়ম্বিতা

অরুণীমা"

চিঠিখানা বন্ধ ক'রে চোখ বুজে বীরেশ বিছানায় পড়ে রইলো। তার অবসাদ আর চিত্তবিকারকে একটা প্রবল নাড়ায় আন্দোলিত ক'রে এই চিঠিখানা যেন তাকে আবার সজাগ ক'রে তুললো। রাত্রে আজ আর ঘুম হবে না।

নয়

দেবীপুরের ঘাটে এসে নামতে প্রায় দশটা বাজলো। ছুটি তার পাওনাই ছিল, এখন সে নিজের ছুটি নিজেই মঞ্জুর ক'রে এলো। গত তিন চার বছরে বেশিদিনের জন্য নবনগর ত্যাগ ক'রে বাইরে থাকা সম্ভব ছিল না। এখন আর সে অবস্থা নেই; কিছুকাল গায়ে হাওয়া লাগালে কোথাও বিশেষ অসুবিধা ঘটবে না। সেক্রেটারী, ম্যানেজার এবং আর কয়েকজন কর্মচারীকে নিয়ে ললিত কাজ চালাতে পারবে। যন্ত্রটা এখন তার অন্তর্নিহিত তেজেই প্রাণশক্তি উদ্‌ভাবন করবে, কেবল সেটাকে সক্রিয় রাখার জন্য তেল যোগালেই চলবে। আর কোনো ভয় নেই।

নিজের খবরটা ক'রেই বীরেশ ঘাটে এসে নামলো। কোনো কারণ নেই, তবু তার মনে যেন কয়েকটা তরঙ্গের আলোড়ন জাগতে লাগলো। এখানে তার আপন গৌরবের—গ্লানির নয়—তার কীর্তিকলাপের যশ কেবলমাত্র বিরোধী দলের চক্রান্তে চাপা পড়লেও সামান্য ফুৎকারেই জানা যায়, সে-যশ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো। তবু শঙ্কায়, সন্দেহে, আর একটা অজানা দুর্ভাবনায় সমগ্র দেবীপুরটাই যেন তার কাছে একটা সমস্যার মতোই হয়ে রয়েছে। বেদনার কাহিনী এখানে যত বড়ই হোক, আনন্দের স্মৃতিও কম নয়। যার সহায়তায় তার কর্মজীবন গ'ড়ে উঠেছে সেই নারীর কাছে তার কৃতজ্ঞতা হিমালয়ের মতোই বিরাট, একদিন তারই ইচ্ছা অনিচ্ছায় তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল—এসবই সত্য, কিন্তু সেই ঋণ শোধ করবার দিন তার ঘনিয়ে এসেছে। দিনে দিনে সেই নারীর সঙ্গে তার এমন একটা সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে, যেটা সমস্ত

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার বাইরে। সেটাকে নির্ভুল ভাবে বিচার ক'রে দেখার মতো সাহস ও শক্তি তার হয়নি, সেই কারণে বারে বারে এটাকে এড়িয়ে গিয়েই স্বস্তি লাভ ক'রেছে, ওটাকে নিয়ে মনে মনে তোলাপাড়া করতেও সে কুণ্ঠিত হয়েছে। আজ দেবীপুরে পদার্পণ ক'রে সেই চিন্তাটাই তাকে আচ্ছন্ন করলো!

আবার কোনো নূতন সমস্যার সূচনা অথবা কোনো অনির্দিষ্ট পরিণামের সঙ্কেত,—এই দুয়ের দ্বন্দ্বে তার পা দুখানাও যেন ভারাক্রান্ত হ'য়ে এলো।

ঘাট থেকে একজন লোক তার স্যুটকেস ও বিছানা ব'য়ে নিয়ে এলো। কাঁচা রাস্তাটাকে পাকা করার জন্য সেই সে-বছরে একটা চেষ্টা হয়েছিল। রাস্তাটা কাটাই আছে, কিন্তু পাকা হয়নি। সেই উঁচু নিচু ভাঙা চোরা পথ ধ'রে বীরেশ সটান এসে অনিল সেনের বাংলোর কাছে দাঁড়ালো। কুকুরটা তাকে দেখে দৌড়তে দৌড়তে এসে ল্যাজ নেড়ে গায়ে গা ঘ'ষে অভ্যর্থনা জানালো। বীরেশ হেঁট হয়ে তা'র পিঠ চাপড়ে বললে, গায়ের গন্ধে ঠিক বুঝতে পেরেছিস দেখছি।

কুকুরটা আবার তীরবেগে বাংলোর দিকে ফিরে ছুটলো। ভিতর থেকে হাকিমের বেয়ারা আর বরকন্দাজ হাসিমুখে বেরিয়ে এসে দীর্ঘ সেলাম জানালো। তারপর নৌকার লোকের কাছ থেকে ব্যাগ আর বিছানা নিয়ে ভিতরে চললো। বীরেশ ভিতরে যাবার আগে বললে, ওরে কাল তুই একবার খবর নিয়ে যাস—হয়ত আমি ফিরে যেতে পারি।

লোকটা করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে আবার ঘাটের পথ ধরে চলে গেল। বীরেশের দাঁড়াবার সময় নেই। চিঠিখানা পেয়ে তার উদ্বেগ ছিল যথেষ্ট, সে তাড়াতাড়ি গিয়ে সুশীলার ঘরে ঢুকলো।

দুর্বল শরীরটাকে একটু ছড়িয়ে অনুশীলা একখানা ইজিচেয়ারে বসেছিল। হাতে তার একখানা পশমের কাজ, কিন্তু রুগ্নদেহের ক্লান্তিতে সেলাইটা হাতের মধ্যেই রেখে সে চোখ বুজেছিল, সহসা জুতোর মস্ মস্ শব্দে সে চোখ মেলে তাকালো।

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বীরেশ কাছে এলো। বললে, এসব কি লিখেছ? কি হয়েছে তোমার, অনু?

অনুশীলা একটু চঞ্চল হয়ে উঠতে গেল। বীরেশ বললে, থাক্, থাক্, এই যে— এই চেয়ারে বসছি। কি অসুখ করেছিল তোমার, শুনি?

একটু হেসে অনুশীলা বললে, শোনবার মতন অসুখ যদি না হয়ে থাকে?

না, না—ওসব কথা শুনবো না। পনেরো দিন ধ'রে ভুগছো অথচ আমাকে জানাওনি। কি অসুখ? কেবল জরই ত, না আর কিছু?

অনুশীলা বললে, জরা!

থামো। আমরা সব বুড়ো হ'তে চললুম, মাথার চুল পাকলো,—আর তোমার হবে জরা?

পুরুষেরা ত বুড়ো হয় না, তারা বড় হয়।

বুড়ো হয় বুঝি মেয়েরা? বেশ বলছ যা হোক। কই, হাকিম বুঝি আদালতে? বাঃ স্ত্রীর অসুখের জন্যে বুঝি মাসখানেক ছুটিও নিতে নেই!—বীরেশ উদ্দীপ্ত হয়ে অনুশীলাকে উৎসাহিত করতে লাগলো।

অনুশীলা তার কোট-প্যাণ্ট-টুপি-নেকটাইয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে এক সময় মুখ টিপে বললে, এবার কি ব'লে ডাকবো? চৌধুরী সাহেব?

হাসিমুখে বীরেশ বললে, সে ত সবাই বলে।

আমিও ত তাদের মধ্যে একজন। পায়ে ধ'রে না ডাকলে যে

খোঁজ খবর নেয় না, তাকে ত খাতির ক'রেই চলা উচিৎ, মিস্টার চৌধুরী।

বীরেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, তুমি ত জানো আমি কত ঋণী তোমাদের কাছে। অনেক সময় নিজের আগ্রহে খোঁজ-খবর নিতে ইচ্ছে হ'লেও আমাকে চুপ ক'রে থাকতে হয়।···আচ্ছা থাক, তোমার চিকিৎসার কথা একটু বলো। কী কাহিল তুমি হয়ে গেছ, বুঝতে পারো?

অনুশীলা হেসে বললে, কাহিল হতেই চাইছিলুম। প্রাণ-পদার্থ একটু কমলে হয়ত এযাত্রা বাঁচতে পারি।

কেন?

বুঝতে দেরী লাগে কেন? তপস্যা করলে তবেই শরীরটা একটু হাল্‌কা হয়!

বীরেশ একবার তার মুখের দিকে তাকালো। তারপর উচ্চকণ্ঠে হো হো ক'রে হেসে উঠলো। তারপর বললে, যাক্ বাঁচলুম। অসুখটা তাহ'লে মনে? তাহ'লে সারতে দেরি লাগবে না।

অনুশীলাও হাসলো, কিন্তু আগেকার মতো সে হাসিতে জ্যোতির্ময় উচ্ছলতা নেই,—কেমন যেন ক্লান্তির। বললে, কি জানি, হয়ত মনেরই অসুখ। মনের অসুখ যদি হয়, মনের মতন ঔষধ না হ'লে ত' আর সারবে না। তুমি ত আর তার সন্ধান দিতে পারো না!

বীরেশ বললে, অমন অসুখ হওয়াটাও ত বিচিত্র! তুমি দুঃখের মধ্যে নেই, অভাবগ্রস্ত নও, তুমি কোথাও ব্যর্থ হওনি, আশাভঙ্গের মনস্তাপ নেই—হাসিমুখে সে বললে, তোমার ত' কোনো অসুখই হবার কথা নয়, অনু।

অনুশীলা তার দুই চোখ নত ক'রে ধীরে ধীরে পশমের সেলাইটা দুই

হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। কথাটা শুনে সে সুখী হয়নি, বেশ বোঝা গেল। প্রচ্ছন্ন একটা অভিমান তার মুখের উপর কেমন যেন মেঘের ছায়া বিস্তার ক'রে রইলো। বীরেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল।

তোমার চিকিৎসার ভার কা'র ওপর দিয়েছ?

অনুশীলা মৃদু নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, সিভিল সার্জন এসেছিলেন, তাঁর ওষুধ কল্‌কাতা থেকে আনা হোলো, তাই চলছে।

কি বলেন তিনি?

স্নায়ুতন্ত্রের বিশৃঙ্খলা। অবশ্য বলেছেন, ভয়ের কারণ নেই।

বীরেশ বললে, দুর্ভাবনার কোনো কারণ আছে?

অনুশীলা এবার হাসলো। বললে, সে-কথা তিনি কিছু বলেন নি বটে, তবে আমি জানি—আছে।

অর্থাৎ?

তুমি ত সে-কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত নও?

বীরেশ একটু থতিয়ে বললে, আক্রমণ করছ কেন, অনু?

অনুশীলা বললে এইটেই আমার রোগ।—ব'লে সে থেমে গেল।

বীরেশ পুনরায় বললে, আমার মনে হয়, অনেকদিন এই পল্লীগ্রামে থাকার ফলে তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। তোমার জায়গা বদল করা দরকার।

হঠাৎ অনুশীলার কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে উঠলো। বললে, এবার আমি দেশছাড়া হই, এই বোধহয় তুমি চাও?

বীরেশ স্তব্ধ চক্ষে তার দিকে তাকালো।

অনুশীলা বললে, কোনো কাজ তোমার বাকি নেই, সুযোগ-সুবিধে সব তুমি পেয়ে গেছ। ওপরে উঠতে পেরেছ বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে। এখন অনিল সেন আর তার স্ত্রীকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে খুবই

সুবিধে। সাক্ষী-সাবুদ আর কোথাও রইল না। মই বেয়ে ওপরে উঠে সিঁড়িটাতে পা দিয়ে সবাই ফেলে দিতে চায়।

আমার সম্বন্ধে এই কি তোমার ধারণা, অনু?

এর চেয়েও খারাপ ধারণা, মিস্টার চৌধুরী!

কিন্তু তোমাদের প্রতি আমি ত স্বপ্নেও কোনো অবিচার করিনি?

অবিচার করলে খুশি হতুম, কারণ তা নিয়ে বিবাদ করা চলতো। তুমি উপেক্ষা করেছ।

কোনো চাঞ্চল্য বীরেশ প্রকাশ করলো না। কেবল বললে, উপেক্ষা তোমাদের করার সাধ্য আমার নেই। ইষ্টমন্ত্র থাকে মনে মনে, সেটা চীৎকার ক'রে সবাইকে জানানোটা অশাস্ত্রীয়।

তোমার আচরণে তা প্রকাশ পায় না, বীরেশ।

যদি আমার আচরণে সে কথা এতদিন প্রকাশ না পেয়ে থাকে তবে আমার মাথার মুকুট তুমি খুলে নাও!……

অনুশীলা চুপ ক'রে রইলো। কিছুক্ষণ পরে বললে, হয়ত এবারের এই দেখাশোনাই শেষ। এমন হ'তে পারে, তোমাদের শান্তিভঙ্গ করতে আর কোনোদিন আসবো না। আমাদের এখান থেকে বদলী করার জন্য বা'র বা'র তাগিদ আসছে। আমি সেইজন্যেই বলেছিলুম,—কিন্তু তুমি একবারও এসে দাঁড়ালে না।

বীরেশ বললে, বদলী যদি করে, তোমাদের ত' যেতেই হবে! সরকারী চাকরীর এই ত' ব্যবস্থা।

না, আমি যেতুম না, যাবার ইচ্ছে ছিল না—অনুশীলা বললে, দেবীপুর ছেড়ে যাবো এমন কল্পনা কোনদিন করিনি। সরকারী চাকরীতে বদলী হয়ে বেড়াতে হয় জানি, কিন্তু মনে করেছিলুম দেবীপুরে

একটা স্থায়ী বাসা বেঁধে রাখবো। এ গ্রামের জন্য আমরা অনেক পরিশ্রম করেছি।

বীরেশ বললে, এ গ্রামে যদি জায়গা না থাকে ?

অনুশীলা তার অনুযোগের আসল কাহিনী বিস্তার ক'রে বললে, এটা পুরুষের কথা নয়, নিরাশার কথা। নবনগর সৃষ্টি ক'রে তুমি খুশি, দেবীপুর তোমার কাছে অবহেলার বস্তু। এতেই বোঝা যায় তুমি এর আত্মীয় নও, প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্য হিসেবে তুমি একে ব্যবহার করতে চেয়েছিলে,—কিন্তু আমল পাওনি। আজ প্রায় সাত বছর হ'তে চললো, তুমি নবনগরে গিয়েছ, কিন্তু আমি ব'সে আছি এই গ্রামকে নিয়ে—যেমন মা বসে থাকে রুগ্নসন্তানকে কোলে ক'রে। সেদিন তুমি আমার কথা বুঝতে পারোনি, মিস্টার চৌধুরী। আমি মনে করেছিলুম, নবনগর হবে তোমার হাতের অস্ত্র, সেই অস্ত্রের শক্তিতে তুমি এসে এই গ্রামকে অধিকার করবে, আমার পরাজয়ের জ্বালা জুড়োবে। কিন্তু তুমি আসোনি, এক উন্নতি থেকে আরেক উন্নতিতে তুমি লাফিয়ে উঠেছ ; আর আমি নিচের তলায় হা প্রত্যাশায় ব'সে আছি। তোমার মুকুট খুলে নেবার দরকার আমার নেই—কিন্তু যাবার সময় আমি জানিয়ে যাচ্ছি, তুমি সার্থক হওনি, তোমার সেই পরাজয়ের প্রতিকার আজও হয়নি।—এই ব'লে সে পশমের সেলাইটা রেখে উঠে দাঁড়ালো, তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে আলমারী থেকে একখানা দলিল বার করে নিয়ে এলো।

বীরেশ বললে, কী ওটা ?

এটা রেজেস্টারী করা তোমার নামে। নবনগরের জমি আমার নামে ইজারা নেওয়া ছিল, এখন তোমার নামে উনি করে দিয়েছেন।······

স্তব্ধ হয়ে বীরেশ তার দিকে তাকালো। তারপর বললে, তুমি কি কোন সম্পর্কই রাখতে চাও না ?

অল্প পরিশ্রমে আর উত্তেজনায় অনুশীলা হাঁপিয়ে উঠেছিল। উত্তর দিতে গিয়ে তার গলার আওয়াজ কেঁপে উঠলো।...বললে, ছোড়দাকে এনেছিলুম তোমার কাছে।...একটা অনুরোধ রইলো...সে যেন জলে না পড়ে।...তোমার হাতে তার ভবিষ্যতের ভার রইলো।

ইজিচেয়ারে বসে অনুশীলা আবার গা এলিয়ে দিল। এমন চেহারায় এর আগে তাকে দেখা যায়নি। আগে তার প্রাণের উত্তাপ ফুটতো চোখে মুখে, উত্তেজনায় দুই গালের উপর রক্তাভাস জাগতো। চোখে ছিল চঞ্চলতা, ভঙ্গীতে পুরুষের বুকের রক্ত আলোড়িত হ'তে পারতো। কিন্তু আজকে আর সেই বসন্ত সমারোহ যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অশোক আর পলাশের রঙ নিংড়ে গেরুয়া উঠেছে অনুশীলার অঙ্গে, মন্দারের মালা নেই গলায়—তার বদলে রুদ্রাক্ষের লহরী। একদিন তার আনন্দের বন্যায় দুকূল আকুল হ'তে পারতো, কিন্তু আজ যেন এই বৈরাগিণী বৈশাখের শুষ্ক নদীর চড়ায় ব'সে ভৈরবের মন্ত্র জপছে। একদিন দীপমালা জ্বালিয়ে উৎসব করতে বসেছিল, আজ যেন আগুন জ্বালিয়ে চারিদিক সে দগ্ধ করতে বসেছে। অনুশীলাকে আজ বড় বিচিত্র মনে হোলো।

বীরেশ বললে, তুমি কি এই জন্যেই আমাকে চিঠি লিখে ডেকেছিলে?

অনুশীলা বললে, এইজন্যে না ডাকলে তুমি ত আসতে না!

বীরেশের কণ্ঠস্বর এবার কাঁপলো। বললে, তুমি যদি চলে যাও তবে দেবীপুরে আর ত কোনো আকর্ষণ থাকতে পারে না, অনুশীলা?

রোগা মুখের রক্তাভাস তখনো অনুশীলার মুখ থেকে একেবারে মিলোয়নি। ম্লান হাসি হেসে সে কেবল বললে, যদি বন্দী করে, যেতে

হবেই। দেবীপুরের কিছু ক'রে যেতে পারলুম না এই দুঃখ রইলো। আমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

কিন্তু তার সময় ত এখনো যায় নি!

আমরা থাকতে হ'তে পাবলো না।

বীরেশ বললে, বেশ ত, তোমার স্থায়ী বাসা এখানে বেঁধে দিচ্ছি—তুমি থাকো। যতদিন তোমার প্রতিজ্ঞা সার্থক না হয় ততদিন—

বাধা দিয়ে অনুশীলা বললে, ছেলেমানুষী প্রস্তাব! স্বামী যাবেন অন্যত্র, আর আমি থাকবো এই পাড়াগাঁয়ের এক কোণে ঘর বেঁধে!—হেসে সে বললে, কি ভাগ্যি আর কিছু বলোনি!

বেশ, তা হলে চলো সবাই যাই নবনগরে। একদিন আবার ফিরে এসে এই দেবীপুর অধিকার করবো। এখানে কতকগুলো জটিল ব্যাপার আছে, সেগুলোরও ত একটা প্রতিকার হওয়া দরকার!

অনুশীলা বললে, মিস্টার সেন বাধা হবেন কেন? স্ত্রীকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু কাছছাড়া তিনি না ও করতে পারেন?

বীরেশ কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। স্ত্রী স্বামীর কাছছাড়া হয়ে থাকবে এ প্রস্তাব সে করেনি।—সে বললে, একদিন তোমারই সাহায্যে পাহাড় আর জঙ্গল কাটতে গিয়েছিলুম। তোমার জন্যেই নবনগরের সৃষ্টি, তোমারই টাকায় তার পত্তন। আমি কমতার ভক্ত সন্দেহ নেই—এও সত্যি যে, আমার কাছে দেবীপুর আর নবনগর একই কথা। দেশকে ভালোবাসার মানে যদি হয় দেবীপুরের মাটী কামড়ে প'ড়ে থাকা, তবে আমি অবশ্যই দেশদ্রোহী। প্রত্যেকের উন্নতি হলেই দেশের উন্নতি—এই আমি মনে করি। দেবীপুরে আমার জায়গা হয়নি, দেবীপুরের উন্নতি আমি করতে পারিনি, তার জন্যে আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ নেই—আমি নিজের কল্পনাকে অনেকটা প্রকাশ করতে পেরেছি

নবনগরে; সেই আমার দেশ। কিন্তু আজ যদি তুমি মনে করো আমি ব্যর্থ হয়েছি, তাহ'লে আমি নবনগর ত্যাগ ক'রে নিঃসম্বল হয়ে এই গ্রামে দাঁড়াতে প্রস্তুত। আবার আমি চেষ্টা করতে পারি, যুদ্ধ করতে পারি—আবার আমি নতুন ক'রে কাজের কথা ভাবতে পারি। তোমার হাতে আমার ভাগ্য তৈরী হোলো, অথচ তুমি ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে…এই অভিসম্পাৎ কিছুতেই সইতে পারবো না। তুমি সব ফিরিয়ে নাও।

বক্তৃতা সে দিয়ে চলেছে কিন্তু শ্রোত্রীর অন্যমনস্কতা সে লক্ষ্য করেনি। অনুশীলার উৎসুক দুই চোখ ছিল তার দিকে। আজ অনেককাল পরে পাওয়া বীরেশের এই সান্নিধ্য। শরীর অসুস্থ, কিন্তু অনুশীলার উদগ্র তৃষিত মন যেন আজকের এই সান্নিধ্যটুকুকে একান্ত বাসনায় অন্তরে অন্তরে লেহন করছে। বিবাদ বিতর্কের অন্তরালে নারীর মন পরিপ্লাবিত হয়ে উঠেছে শ্রদ্ধায় আর স্নেহের রসে। এক সময়ে মোহসঞ্চারিত চক্ষু সে বীরেশের মুখের উপর থেকে নামিয়ে নিল।

পাচক এসে একবার খবর দিয়ে গেল, আহার প্রস্তুত, কিন্তু অতিথিকে সমাদর করবার উদ্বেগ অনুশীলার দেখা গেল না। সর্বপ্রকার অভিমান আর চিত্তবিক্ষোভের অন্তরাল থেকে অনুশীলা যেন চুপি চুপি দেখতে লাগলো শীতের অবসন্ন জড়তার উপর দিয়ে মৃদুপদক্ষেপে ঋতুরাজ আজ আবির্ভূত হোলো তার উত্তরীয় উড়িয়ে। চিঠিতে সে যাকে 'প্রিয়' ব'লে সম্বোধন করেছে, সে কোনও প্রকারে সেই সম্বোধনের অযোগ্য নয়। চোখে, মুখে, ভঙ্গীতে, ব্যবহারে কোথাও কৃত্রিমতার বিন্দুমাত্রও সঙ্কেত নেই। নবনগর ত্যাগ ক'রে আজ আবার নিঃসম্বল হ'য়ে সে এই গ্রামে এসে দাঁড়াতে পারে—এই কথায় তার কোথাও

মিথ্যা আস্ফালন অথবা ক্ষণ-উত্তেজনার মনোবিকার নেই, সত্যের তেজ আর অন্তরের ওজঃশক্তিতে তার প্রত্যেকটি উক্তি মর্মমূলকে বিদ্ধ করে। প্রশস্ত কপাল তার আজো জরেখাহীন, দুই চোখে প্রতিভার সেই প্রগাঢ় গভীর ছায়া, মুখে কোথাও অন্তিম যৌবনের একটিও রেখাপাত নেই—তারুণ্যের গর্ব আজো সে করতে পারে। অনুশীলার মনে পড়লো নিজের কথা। সে যে এই শূন্য দেবীপুরের মাঠের মাঝখানে নিঃশব্দ তপস্যায় ব'সে ব'সে আজ অন্যরূপ হয়ে উঠেছে—একথা কিছুতেই যেন গোপন রাখা চলছে না। শরীর তার সুস্থ নয়, মনের উপরে আলস্য ও ক্লান্তির ছায়া,—কিন্তু তবু, এতদিন পরে যাকে একান্তে কাছে পাওয়া গেল, তারই যোগ্য সমাদর করতে তার মন ক্ষণে ক্ষণে যে লালায়িত হয়ে উঠেছে, এও ত সেই চিরকালীন রহস্য! ভয় নেই তার মনে, লজ্জা নেই নিজের আচরণে,—একথা সে জানে, একটা অহেতুক দুর্নীতির চোরাবালির উপর তাদের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে নেই। স্বামী তার বর্তমান, স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক আজো অটুট, আজো স্বামীর তুচ্ছতম ভালোমন্দ আর সুখ দুঃখ তার প্রাণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়ানো,—তবু বীরেশের সঙ্গে তার বন্ধন ঠিক এই। এর বেশী নয়, এর কম নয়,—এর নিচের তলায় আত্মবঞ্চনা লুকিয়ে রেখে উপরতলায় মধুর আবরণ দিয়ে স্বামীকে সে প্রতারিত করতে চায় না।......

একটা চাপা ছোট নিশ্বাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সচেতন হ'য়ে উঠলো। তার অসম্বৃত কল্পনা যে কতদূর এগিয়ে গেছে, নিজেও সে বুঝতে পারে নি। কিন্তু সে এবার একটু হাসলো। বললে, ফিরিয়ে নেবার অধিকার আমার কই? কিছু টাকা অবশ্য গোড়ায় আমি দিয়েছিলুম। তবে আসলে সে টাকা ফেরতও পেয়েছি। এখন ত সবই তোমার।

বীরেশ বললে, আমি তোমাদের প্রতারণা করে এসেছি এই বদনামই বা কেন সইবো, অরুণীলা?

রজনীর কথাটা অরুণীলার মনে পড়লো। কি যেন একটা কথা তার মুখের আগায় এসেছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে সে বললে, প্রতারণা যদি কেউ করে তার প্রতিবিধান করতে ও' যাবো না! আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি, সেইটিই আসল কথা। তুমি যদি আমাকে মনে মনে ঠকাও, সেটা আমার কাছে খুব বড় নয়।

বীরেশ বললে, তোমার এই কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা রহস্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এতক্ষণ অনেক কথা কাটাকাটি করা গেল, কিন্তু মনে হচ্ছে প্রকৃত ব্যাপারটা তুমি এখনো খুলে বলোনি।

অরুণীলা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। বললে, চলো, খাবার দিয়েছে ওরা। আমার এখন খাওয়া নিয়ে, তোমার কাছে বলবো, চলো।

উঠবার লক্ষণ বীরেশের দেখা গেল না। সে যেন ঈষৎ অভিমানের সুরে বললে, খাওয়াটা বড় কথা নয়, অরুণীলা। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমাদের সকলের মনে যদি কোনো মালিন্য স্পর্শ করে তাহ'লে তার চেয়ে শোচনীয় কিছু হতে পারে না। যতক্ষণ না জানতে পারবো তুমি সেই আগেকার মতনই আছো, ততক্ষণ আমার মনে স্বস্তি নেই। অনেক খেয়েছি তোমার এখানে, দুদিন যদি না খাই ক্ষতি নেই। তোমাকে দেখে যেতে পারলুম এই অনেক। পৃথিবীতে নকল বস্তুর আদর অনেক বেশি, মুখোস না পরলে মানুষের সমাজে ঠাঁই নেই, তোমার সাধুতা যদি কোনো কারণে মার খায় তাহ'লে আমায় ক্ষমা ক'রো।

বীরেশ লক্ষ্য করেনি, তার দুটি মাত্র কথায় অরুণীলার আরক্ত দুটি

চোখ ফেটে জল এসে পড়েছে। সেই অশ্রু চাপতে না পেরে অনুশীলা তার দুর্বল দেহ টানতে টানতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বীরেশ ব'সে রইলো তার পথের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে।

কতক্ষণ ব'সে রইলো কি ভাবনায়, তার নিজেরই যেন চেতনা নেই। এক সময় পাচক আবার তাকে ডাকতে এলো। বীরেশ প্রশ্ন করলো, মা কোথায় রে?

পাচক বললে, মা টেব্‌লে ব'সে আছেন।

সাহেব আজ কখন বেরিয়েছেন?

সাহেব? তিনি ত' দুদিন বাড়ী নেই?

কোথায় গেছেন?

তিনি গেছেন সদরে। আজ আসবার কথা।

ওঃ তাই নাকি?—গা ঝাড়া দিয়ে বীরেশ উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু একটা কথা তার মনে প'ড়ে গেল। অনুশীলা তাকে চিঠি পাঠিয়েছিল অনিলের অনুপস্থিতিতে। সমস্ত ব্যাপারটার গতি কোন্‌দিকে একথা মনে করতেই বীরেশের পা দুটো যেন অবশ হয়ে এলো। তার জন্য এই পরিবারের যদি কোনো চিত্ত বিপর্যয় ঘটে তবে সে বড় শোচনীয়। সে কি করবে, কি ভাবে চলবে, কেমন ক'রে সমস্ত ব্যাপারটার সমন্বয় ঘটাবে—এই সমস্যায় সে যেন সহসা দিশাহারার মতো এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো।

খাবার টেব্‌লের কাছে এসে সে অনুশীলার পাশেই ব'সে পড়লো। আশেপাশে ঠাকুর, চাকর, এরা সব রয়েছে। যদি কারো কাছে কোনো সংশয় প্রকাশ পায় তবে লজ্জায় মাথা হেঁট হবে। অথচ আবহাওয়াটা যে একটা হৃদয়ের আলোড়নে আর নিশ্বাস প্রশ্বাসে ভারাক্রান্ত, এও হয়ত

ওদের কাছে আর অজানা নেই। বীরেশ যেন কণ্টকিত হ'য়ে উঠলো। আজ অনুশীলা সত্যই যদি সতর্ক না হয় তাহলে হয়ত এবাড়ীতে তার শেষ আবির্ভাব! সে পুরুষ, নারীর সম্ভ্রম রক্ষার ভার তারই হাতে।...

কই, তুমি ত বলোনি যে, মিস্টার সেন দুদিন বাড়ী নেই?

রাঙা দুই চোখ ফিরিয়ে অনুশীলা বললে, আজ হয়ত আসতে পারেন।

তোমার চোখে জল কেন, অনুশীলা?

অনুশীলা বললে, মেয়েদের চোখের জল ত' তোমার ভালোই লাগে।

বীরেশ এবার হেসে উঠলো...সকালবেলা যে আজ কা'র মুখ দেখে উঠেছি ঠিক নেই। দেবী আজ কিছুতেই প্রসন্ন হচ্ছে না। কই, আমার জন্যে কারো চোখে জল পড়েছে, মনে ত' পড়ে না।

ভেবে দেখো দেখি!

ভেবে দেখতে হবে কেন? চোখের সামনে যা দেখা যাচ্ছে, তা'তে অবশ্য আশান্বিত হবারই কথা। এর বেশি ভাববার ত' কিছু নেই!

মুখ তুলে অনুশীলা বললে, তুমি নির্দয় নয় জানি, কিন্তু তোমার নির্দয়তা কখন্ যে কি ভাবে প্রকাশ পায় তা তুমিও জানো না।

খেতে খেতে বীরেশ হেসে বললে, পৃথিবীর সব মেয়েই ত পুরুষকে চিরকাল নির্দয় বলে এসেছে। নতুন ত নয়!

নতুন নয়, অতি প্রাচীন। তোমরা যে চিরদিনই মেয়েদের ভুলিয়ে অনাচার ক'রে এসেছো, ঠিক তারই মতো প্রাচীন।

বীরেশ বললে, আমাদের ত দাঁড়াবার সময় নেই, আমরা এগিয়ে চলি। পুরুষ মানুষ পিছন দিকে চাইলে আর সে অগ্রসর হ'তে পারে না। পৃথিবী সৃষ্টির ভার তাদের হাতে, দাঁড়িয়ে থাকলে তাদের কেমন ক'রে চলবে? তুমিই ত' একদিন বলেছিলে, স্নেহ মমতাটা হোলো ধোঁয়ার মতন, সেই ধোঁয়া পথ ভোলায়।

অনুশীলা বললে, আর একটা কথা ছিল, সেদিন বলা হয়নি তোমাকে। স্নেহ মমতার প্রশ্ন নয়, সেটা বিচারবুদ্ধির কথা। প্রতিভা যতই বড়ই হোক, সে জন্মায় মেয়ে মানুষের কোলে। সুতরাং একটা ঋণ তার শোধ করতেই হয়, সেইটেই মনুষ্যত্ব। বাঙালীর ছেলেদের অবনতির মূলে অন্ধ মাতৃস্নেহ অনেকখানি কাজ করেছে জানি, কিন্তু পুরুষের কাজ হলো উঁচু আদর্শ আর মডেল্ সৃষ্টি ক'রে তোলা, তুমি তা করোনি বীরেশ, মেয়েমানুষের নিরুপায় অবস্থা দেখে তোমার মমত্ববোধ জাগে নি—তাকে নির্মম ভাবে দূরে সরিয়ে দিয়ে তুমি নিজের পথ পরিষ্কার করেছ।

মুখ তুলে বীরেশ বললে, কি রকম?

অনুশীলা বললে, ভারতবর্ষে একমাত্র বাঙালী মেয়েই সব চেয়ে দুর্বল। অন্য প্রদেশে অশিক্ষা আছে, কিন্তু এখানে অশিক্ষা আর রুগ্নতা দুইই। এত দুর্বল আর এত নিরুপায় ব'লেই এরা পুরুষের কোঁচার খুঁট না ধ'রে এক পা চলতে পারে না। এদের খাওয়া নেই, স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, সাহস নেই,—কিন্তু তুমি সেই দুর্গম দুর্দশা থেকে টেনে না তুলে কাঙালের মতো উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেলে। এটা বীরত্ব অথবা প্রতিভার পথ নয়, এর মধ্যে অপরিমিত আত্মপোষণ ভিন্ন আর কিছু নেই।

এতক্ষণে বীরেশ একটু উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। বললে, এসব অভিযোগ তুমি কোথা থেকে তৈরী করলে, অনুশীলা?

অনুশীলার দুর্বল চেহারাও দপ্‌দপ্‌ করছিল। সে বললে, আগে তুমি খেয়ে নাও, তারপর জানাবো এ-অভিযোগ কেবল আমার সৃষ্টি নয়।

মানে?

তার মুখের দিকে চেয়ে অঞ্জলীলা বললে, তোমার জীবনে কি এই ঘটনা নেই?

আমার জীবনে?—বীরেশ বললে, কই মনেও ত পড়ে না। আশ্চর্য তোমার আবিষ্কার।

অঞ্জলীলা বললে, তবে কেন তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে এসেছিলে?

স্ত্রী!...পলকের জন্য বীরেশ স্তব্ধ হ'য়ে গেল। তারপর মাথা নত ক'রে সে যেমন খাচ্ছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই খেয়ে যেতে লাগলো। ভ্রূক্ষেপ করলো না।

কই, উত্তর দিচ্ছ না যে?

উত্তর দেবার কিছু নেই।

কেন, বিয়ে তুমি করোনি?

বীরেশ বললে, বিয়ে যদি ক'রে থাকি, স্ত্রীকে আমি জানিওনে, চিনিওনে।

কিন্তু বিয়ে ত করেছিলে?

অনেকেই তাই বলে বটে!—এই ব'লে নিশ্চিন্ত মনে সে খেয়ে যেতে লাগলো। তার মুখের চেহারায় লজ্জা ত' দূরের কথা, কেমন একটা কৌতুকের আভাসই দেখা যাচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে।

যে-দাহটা দীর্ঘকাল ধ'রে অঞ্জলীলার মনে ধিকি ধিকি জ্বলছিল, সেটাকে যে হাল্কা হাওয়ায় বীরেশ এমন ক'রে নিবিয়ে দেবে অঞ্জলীলা কল্পনাও করেনি। বহুরাত্রির বিনিদ্র বেদনার খণ্ড ক্ষুদ্র ইতিহাসগুলি তার মনে প'ড়ে গেল। নিজেকে সে এই ব'লে সান্ত্বনা দিয়েছিল, বড় প্রতিভার সঙ্গে হয়ত জড়ানো থাকে ছোট ছোট ক্ষুদ্রতা, ছোটখাটো দৈন্য। সেই প্রতিভা থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় জনসাধারণের চক্ষু এতই ধাঁধিয়ে থাকে

যে, তার চিত্ত-দারিদ্র্যের ছোট ছোট কলঙ্কগুলি আর কারো চোখে পড়ে না। কিন্তু সেটা সান্ত্বনা মাত্র। ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে দাঁড়িয়ে কলঙ্কবিন্দুগুলি পর্যবেক্ষণ করলে বড় প্রতিভাকে মহৎ মানুষ বলতে মুখে বাধে। এই কারণে অনুশীলা সান্ত্বনা পায়নি। বীরেশ যে তাকে এতকাল ধ'রে কেবল প্রতারণা ক'রে এসেছে সেই কারণেই তার বেদনা নয়, কিন্তু প্রতিভা ব'লে যাকে সে জেনে এসেছে, সে যে একজন একান্ত অনুরাগীর কাছে ছোট হ'য়ে গেল, এজন্যেও তার নিভৃতে চোখের জল পড়েছিল।

অনুশীলা বললে, তোমাকে এত বিশ্বাস করি, কিন্তু একথাটা তুমি বলোনি কেন?

বীরেশ হেসে বললে, ভুলে গিয়েছিলুম।

বিয়ের কথা ভুলে গিয়েছিলে? তুমি বুঝি আজকাল ছেলে ভুলিয়ে বেড়াও, বীরেশ?

আহারাদি শেষ ক'রে একটা বর্মা চুরুট ধরিয়ে বীরেশ বললে, তোমার কাছে আমার নিজের কোনো কথা গোপন করেছি এটা শোনাও আমার পক্ষে পাপ। কিন্তু মন দিয়ে শোনো, অনুশীলা,— এ বিয়ে আমার মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে ব'লেই এর কথা আমি ভুলে যাই।...যদি আমি একথা নিয়ে নানা জায়গায় অস্বীকারও ক'রে বেড়াই তাহলেও তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।...আজ আমি তার অস্তিত্বও স্বীকার করব না—মনে, প্রাণে, কল্পনায় কোথাও নয়।...তুমি জেনে রেখো, সেটা বহুদিন আগেকার এক রাত্রির একটা ক্ষণিক দুঃস্বপ্ন,— ঘুম ভাঙার পর সে-দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে গেছে, তার চেহারাও সঠিক স্মরণ নেই।

একটা সুদূর নিরাশার আভাসে বীরেশের কণ্ঠস্বর যেন সহসা শুকিয়ে

উঠলো। সদ্য আহার শেষ করেছে সে, কিন্তু হঠাৎ অনুশীলার মনে হোলো, বহুদিনকার উপবাসে সে যেন শীর্ণ; তার কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে যেন অঙ্গারের দগ্ধাবশেষ ভস্মধূলিরাশি বেরিয়ে এলো। উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, এসো, ঘরে যাই।

ঘরে এসে নিজে সে বসলো বিছানায়, আর বীরেশ বসলো তারই পরিত্যক্ত ইজিচেয়ারটায়। আগে অনুশীলা মনে করতো, বীরেশ এসে পড়েছে যেন একটা উল্কাপিণ্ডের মতো,—তার আসা আর যাওয়ার দুই দিকের পথই অন্ধকার। কিন্তু এ মানুষ যেন একটা বিস্তৃত মহানদ, কত দূর দূরান্তর থেকে এসেছে কত কাহিনী বুনে বুনে, কত পথ বেয়ে একে যেতে হবে কোন্ অকূলের দিকে,...পথের দুইধারে রেখে যাবে কেবল বিবিধ কর্মজীবনের কত কাহিনী!

স্তব্ধ হয়ে দুইজনে কতক্ষণ ব'সে রইলো। এই নৈঃশব্দ্যের দুই পারে যেন দুইটি মনোজগৎ আপন আপন ভাঙা-গড়ার প্রহেলিকা সৃষ্টি ক'রে চলেছিল। চাকর এসে এক সময় তাদের ঘরের পর্দা টেনে দিয়ে চ'লে গেল। শীতের অপরাহ্নের বাতাস বাইরের গাছপালায় সশব্দ শব্দে বেয়ে চলেছে। ক্লান্তরৌদ্রে অজানা অনামা পাখীর কলকণ্ঠ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

মৃদুকণ্ঠে অনুশীলা বললে, প্রকাণ্ড একটা নালিশ তোমার বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু আজ আর নেই। তবু একটা কথা থেকে যায়, স্ত্রীকে তুমি নিলে না কেন? তার কি কোনো অপরাধ ছিল?

বিন্দুমাত্র না—বরং একটি দিন আড়াল থেকে তাঁর স্বভাবের দৃঢ়তাই আমি অনুভব করেছি। চোখে তাঁকে স্পষ্ট ক'রে দেখিনি, কিন্তু মনে পড়লে সম্মানবোধ আসে।

বিস্মিত অঞ্জুশীলা তার চোখের দিকে তাকালো। বললে, তবে? কোথায় তিনি এখন?

চুরুট টেনে ধোঁয়া ছেড়ে বীরেশ বললে, দশ বছর হোলো। খোঁজ পাইনি, খোঁজ করিওনি। আর তা ছাড়া—

উৎসুক আগ্রহে অঞ্জুশীলা প্রশ্ন করলো, তা ছাড়া কি?

হাসি এলো বীরেশের মুখে। বললে, রক্তের মধ্যে সেদিন যে উত্তাপ ছিল, আজ শেষ যৌবনে তার চিহ্নও খুঁজে পাইনে।

বিছানা থেকে ঝুঁকে অঞ্জুশীলা তার কাছে এগিয়ে এলো। বললে, সমস্তটা জটিল মনে হচ্ছে। সব খুলে তুমি বলো, বীরেশ।

বীরেশ বললে, তোমার আগ্রহ দেখে আমার হাসি পায়। স্ত্রী এবং বিবাহ—এ দুটোকেই আমি স্বীকার করিনি। এর কারণ হোলো, বাবার আদেশ পালন ক'রে মাথায় আমি টোপর তুলেছিলুম সত্য, কিন্তু তাঁর সঙ্গে মত ও আদর্শ-বিরোধের জন্য আমি সমস্তই ত্যাগ ক'রে এসেছিলুম।

কিন্তু এত বড় আদর্শবাদী হয়ে তুমি একটি নিরপরাধ মেয়েকে অকূলে ভাসিয়ে দিলে? তুমি এত লোকের জীবন-মরণের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছ স্বেচ্ছায়, আর যেখানে তোমার সত্যিকার মনুষ্যত্বের পরীক্ষা, সেখানেই তুমি সব জলাঞ্জলি দিয়ে এলে?

বীরেশ বললে, তুমি মনে করেছ আমি অপরাধী! এক বিন্দুও নয়, প্রাচীন মতবাদ শাসন করবে নব্য-জীবন যাত্রার ধারাকে, এত বড় দাসত্ব আমি স্বীকার করবো না। পল্লীগ্রামের একটি নিরপরাধ মেয়ের জীবন যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে ওটা প্রাচীন বিধি ব্যবস্থার আর একটা বলি। বাবা আমাকে তৈরী করেছেন আধুনিক কালের প্রতিনিধি, আর আমার জীবন-সঙ্গিনীকে তুলে আনবেন একটা পুরনো আমলের

পরিবার আর সমাজ থেকে—এ অসম্ভব। আমি এখন অনেকদূর এগিয়ে গেছি, এখন আবার আমাকে গ্রাম্য সংস্কারের মধ্যে টানতে যাওয়া একটা অহেতুক বাতুলতা।...এ কথার তুমি জবাব দাও, অরুণীমা?

অরুণীমা বললে, তুমি তখন শিশু ছিলে না, ম্যাট্রিক পাশ ক'রে পালিয়েছিলে।

হাঁ, পিতৃঋণ শোধ করেছি।

কিন্তু পরের কর্তব্য?

দশ বছরে দিনে দিনে সকল প্রকার কর্তব্যের মূল্য ঘুচেছে। তোমাকে যে কোন কথা বলিনি, সে কেবল এই কারণে।—সৌরভ বললে, ক্ষমা তোমার কাছে চাইবো না, অরুণীমা। পুরানো জীবনকে বিসর্জন দিয়ে চ'লে এসেছি নতুন জীবনে। আমার আপন নেই, আত্মীয় নেই, পিছন দিকে চাওয়া নেই,—জীবনের অন্দর মহলের অন্ধকার কাটিয়ে বাইরের ঘরটাই খুলে রেখেছি, এখানে সবার আসন দিয়ে আনছি পথের হাওয়া, বিশ্বের সংবাদ।

অরুণীমা বললে, আর কোনোদিন এ নিয়ে তোমার কাছে আলোচনা করবো না। কিন্তু একটা কথা জানতে চাই। যদি আমি কোনোদিক থেকে চেষ্টা করি, তুমি কি রাজি হবে? আজ দশ বছর পরে তোমার ত' মনের গতি অন্যদিকে ফিরতে পারে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সৌরভ তা'র দিকে তাকালে।

অরুণীমা বললে, আমাদের চলে যাবার সময় হোলো। এতদিন পরে যাবার সময় যদি দেখে যাই, তোমার কাছে দাঁড়াবার কেউ নেই, তাহ'লে চোখের আড়ালে গিয়ে ত নিশ্চিন্ত হ'তে পারবো না।

বলো তোমার কি হুকুম?

আমার হুকুম ত' তুমি মানবে না। আমি যদি একথা বলি, আমি নিজে তোমার বাবার কাছে যাবো,—নিজে যাবো তাঁর কাছে, তোমারই

জন্তে যিনি মাথায় সিঁদুর নিয়েছিলেন, আমি যাবো তোমার সেই অতীত জীবন আবিষ্কার করতে,—যে জীবনে তোমার শ্রী ছিল, ছন্দ ছিল,—তাহ'লে কি তুমি রাজি হবে?

বীরেশ বললে, না।

কেন?

যে বিচ্ছেদ প্রকৃত, তার সমাধান নেই। এ ত' আর ভুল বোঝাবুঝি নয়, মনোমালিন্যও নয়,—এ হোলো সেই বিরোধ, যার জন্তে মানুষ যুগে যুগে ঘর ছেড়েছে; সেই বিপুল বিরোধের একটি নমুনা, যার জন্তে নতুন সভ্যতা আর নব যুগের সৃষ্টি। দুই নদীর মধ্যে সেই বিরোধ যার জন্ত তারা দুই শাখায় দুই পথে বেয়ে যায়।···সে-চেষ্টা করলে তুমি ব্যর্থ হবে, অনুশীলা।

অনুশীলার চোখে জল এসে পড়লো। রুদ্ধ উত্তপ্ত কণ্ঠে সে বললে, কিন্তু না করলে তুমিও যে ব্যর্থ হবে!

কোথায় ব্যর্থ হলুম?—বীরেশ বললে, সবাইকে নিজের কাছে টানতে গেলুম, সে কি ব্যর্থ হবো ব'লে? নিজের পরিবারকে হারিয়েছি, বাইরে এসে পেয়েছি বৃহৎ পরিবার। কোথায় পেতুম তোমাকে, কোথায় থাকতো ললিত আর মিস্টার সেন, কোথায় পেতুম তাঁতীবৌকে? ব্যর্থ কিছু নয়, ব্যর্থ কিছু যায় না।

অনুশীলা বললে, দেবীপুর আর নবনগর তোমার ত' চরম সান্ত্বনা নয়!

না। কারণ, আরো চাই। ক্ষমতা থেকে ক্ষমতায়, নতুন থেকে নতুনে। নিজেকে পুড়িয়ে যদি আলো বিস্তার করতে পারি, মন্দ কি? নিজেকে নষ্ট ক'রে যদি আরো প্রকাণ্ড সৃষ্টির কাজে লাগি, সেই ত' সকলের বড় সান্ত্বনা! বীরেশ বলতে লাগলো, শেষ জীবনে স্নেহ মোহ বন্ধন নয়, বরং চাইছি একটা নির্দয় কর্মজীবন—যা রক্তপাতে, বঞ্চনায়,

বিক্ষোভে, উৎসাহে, অধ্যবসায়ে আমাকে আলোড়িত ক'রে রাখতে পারবে। শান্তি আমি চাইনে, আরাম আমার জন্যে নয়,—দুঃখে আর দুর্গমে, নিরাশায় আর নির্যাতনে আমার নিত্যজীবন যেন তরঙ্গে তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হ'তে থাকে ···তুমি এখান থেকে চ'লে যাবে, জানি প্রথমে সইতে পারবো না, কিন্তু জানি এও একদিন সয়ে যাবে। তোমাকে সব ফিরিয়ে দিতে চাইছিলুম এ আমার মিথ্যে আস্ফালন নয়, কারণ সবপ্রকারে মুক্তি না ঘটলে আর নতুন হাওয়া ঢুকবে না ভিতরে। ভূগোলে দেখা যায়, শূন্যলোকে যেখানে বাতাস নেই, সেখানেই ঝড়ের বেগ বেশী। ভয়ানক গুমোটের পরেই বিপুল বর্ষণ।

অনুশীলা বললে, তুমি কি আবার অন্য কোথাও যাবে স্থির করেছ?

বীরেশ বললে, স্থির করিনি কিন্তু সুবিধে পেলেই যাবো। নিজের শক্তিকে চিনতে দেরি লাগে, কিন্তু চিনতে পারলে আর ভয় নেই। মাথা তোলবার পথ আমি জানতে পেরেছি, ব্যর্থ যদি কোথাও হই দুঃখ করবো না, বারে বারে সাফল্যের চেষ্টাই করবো। আর কিছু না হোক, মাথা হেঁট করে কাঁদতে বসবো না। তার সঙ্গে এও জানি, তোমার দেখা যদি আর কোনোদিন না পাই, নতুন কোনো অনুশীলা এসে দাঁড়াবে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে। তোমাকে যদি সত্যকার আপন জেনে থাকি, তবে পৃথিবীর যে কোন অনুশীলার মধ্যে তোমাকেই খুঁজে পাবো। এই হোলো আমার সব শেষের সান্ত্বনা। এই ব'লে সে উঠে দাঁড়ালো।

বিছানা থেকে নেমে অনুশীলা বললে, কোথা যাও?

আজকের মতো যাই।

রুদ্ধ অশ্রু অনুশীলার দুই চোখ ভেঙে নামলো। বীরেশের হাতখানা কঠিন মুঠিতে ধ'রে সে বললে, তোমাকে কোথাও রেখে আমার স্বস্তি নেই, তা জানো?

ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হ'য়ে বীরেণ দাঁড়ালো। তারপর সস্নেহে অহল্যাকে ধ'রে বিছানায় বসিয়ে বললে, রোগা শরীরে এ তোমার সইবে না, অহু। আমার নামে সব লিখে দিয়ে তুমিই ত' চ'লে যাচ্ছ, তবে আবার কান্না কেন?

দুই হাতে মুখ ঢেকে অহল্যা বললে, না, কোথাও আমার যাবার ইচ্ছে নেই। আমি ছাড়তে পারবো না তোমাকে, আমি ছাড়তে চাইনে অনিলকে। তুমি কেবল আমার চারিদিক ঘিরে থাকো। যেখানেই যাও তুমি ডাক দিয়ো আমাকে, সব ছেড়ে গিয়ে দাঁড়াবো তোমার পাশে।

উত্তেজিত কণ্ঠে বীরেণ বললে, কিন্তু এসব কথা বলতে নেই যে, অহল্যা?

বলতে আছে, নিশ্চয় আছে, আজ সব মুখোস খুলে পড়ুক। যা বলেছি এতক্ষণ সব মিছে, কোনো রাক্ষসীর হাতেই তোমাকে তুলে দিতে পারবো না।...আমি যাবো তোমার সঙ্গে, আমাকে নিয়ে চলো।

কোথায় যাবে?

যেখানে হোক, যে দেশে হোক। তোমার পালাবার সব পথ আমি আগলে থাকবো।—অহল্যার আর্তস্বর যেন আর বাঁধ মানছিল না।

হাসিমুখে বীরেণ বললে, আচ্ছা যেয়ো, এখন একটু বিশ্রাম করো। রোগা শরীরকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছো।...আচ্ছা, এই আমি আবার বসলুম। ছি অমন ক'রে কাঁদতে নেই, অহল্যা।

অহল্যা চোখের জল মুছে স্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো। কিন্তু বীরেণ পুনরায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে ব'সে একবার চুরুটটা

টানতেই বাইরে খট্ খট্ ক'রে কা'র যেন জুতোর শব্দ হোলো। সজাগ ও সতর্ক হ'য়ে অতসীলা একটু স'রে বসলো।

মিস্টার সেন বলেই মনে হোলো। জুতোর গোড়ালির শব্দটা একবার গেল অন্যদিকে, কিন্তু সেদিক থেকে ঘুরে আবার স্পষ্ট হ'য়ে এইদিকেই আসতে লাগলো। বীরেশ সোজা হয়ে সহজ ভাবে ব'সে মানসকে আজ নূতন ক'রে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হোলো।

কিন্তু অভ্যাগত যিনি, তিনি আর যাই হোন, পুরুষ নন। পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই বীরেশ সাহেব দুই চোখ হঠাৎ অবাক হয়ে আবিষ্কার করলো,—নলিনী! তার অবাক দুইটা চোখ অপলক স্তব্ধতায় নিশ্চল হয়ে রইলো।

প্রায় দশ বছর পরে তাকে চিনতে হয়ত নলিনীর একটু দেরিই হ'য়ে থাকবে। কিন্তু আজ এইখানে ব'সে কয়েকটি অভাবনীয় মুহূর্তের বিমূঢ় দিবাস্বপ্নের মধ্যে তলিয়ে বীরেশ ঠিক বুঝতে পারলো না তার শরীরের মধ্যে কী একটা অদ্ভুত আন্দোলন,—আনন্দে, না বিহ্বলতায়, না বেদনায়, না বিস্ময়ে, না ভয়ে,—কোন্ বস্তুতে তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে এসেছে! অবশ দুই আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুরুটটা যে কখন পড়ে গেছে সে বুঝতেই পারলো না।

কি রে অতসীলা, আজ কেমন মনে হচ্ছে তোর শরীরটা?

এমনি, খুব ভালো নয়। এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,—ইনি—

নলিনী হেসে উঠলো। বললে, বেশ আছিস যা হোক!...একি, চিনতে বুঝি পারো নি? একেবারে সাহেব হয়ে গেছো মনে হচ্ছে!—এই ব'লে সে এগিয়ে এসে বীরেশের [illegible] থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে মাথায় দিল।

ক্লিষ্টকণ্ঠে বীরেশ কি যেন বলতে গেল কিন্তু কিছুতেই তার মুখ দিয়ে কথা ফুটলো না।

অভিভূত বিস্ময়ে অনুশীলা বললে, এর মানে?

মানে ছাই।—নলিনী বললে, আমরা যে উভয়ের আত্মীয় তা বুঝি জানিসনে? ওর বাবা আমার সম্পর্কে মেসোমশাই।

এতদিন বলিস নি কেন? এতদিন ধ'রে তোর সঙ্গে এত কথা হোলো!—অপ্রতিভ মুখে অনুশীলা অভিযোগ জানালো।

কলকণ্ঠে নলিনী হেসে উঠলো। বললে, কেমন ক'রে বলবো? বীরেশের সুখ্যাতিতে তুই এমনই উন্মাদ যে, বলবার সময়ও পাইনি। তা ছাড়া, রঙের গোলাম চেপে রাখলে খেলাটা ত' জমে ভালো।

গা এবং গলা ঝাড়া দিয়ে বীরেশ এইবার সাহস ক'রে প্রশ্ন করলে, কতদিন এদিকে এসেছ তুমি, নলিনী?

আমি?—মুখ ফিরিয়ে নলিনী আর একবার তাকে পলকের জন্য দেখে নিল। তারপর বললে, এসেছি খানপুরে মাসীমার বাবার ওখানে। তা প্রায় মাস দুই হ'তে গেল বৈ কি।

আড়ষ্ট বীরেশ অলক্ষ্যে একবার অনুশীলার দিকে তাকিয়ে বললে এতদিন এসেছ, অথচ আমাকে একটা খবর দাওনি?

নলিনী তার সমস্ত প্রকার মনোভাব দমন ক'রে হাসিমুখে বললে, তোমার শত্রু জীবনবাবুর দুর্গে আমি বন্দী, তাই খবর দিতে সাহস করিনি।

কয়েকটি মুহূর্তব্যাপী বিপুল স্তব্ধতার মধ্যে তিন জনে যেন নিঃসাড় হয়ে ব'সে রইলো। গভীর লজ্জা আর অনুশোচনায় অনুশীলার মাথা ধীরে ধীরে নত হয়ে এলো। বীরেশের সম্পর্কে তার নিজের প্রগাঢ় অনুরাগ সে এতদূর অবধি উচ্ছ্বসিত ভাষায় নলিনীর কাছে প্রকাশ ক'রে এসেছে যে, আজ আর ফিরে দাঁড়াবার কোনো উপায় নেই। নলিনী তার সহপাঠিনী বন্ধু, আবাল্যের সঙ্গী, তার স্বভাব ও চরিত্রের অলিগলি নলিনীর স্পষ্ট জানা আছে—সুতরাং নলিনীরও কিছু বুঝতে বাকি নেই। লজ্জা কেবল নয়, আশঙ্কায় যেন সহসা অনুশীলার মন অভিভূত ও আড়ষ্ট হয়ে এলো। সে নিজে অনর্গল স্বীকারোক্তি ক'রে গেছে, অনুরাগের আতিশয্য অনেক স্থলেই সংযত ছিল না,—কিন্তু অপর পক্ষে বীরেশের এই আত্মীয়া নিঃশব্দে মনে মনে ছি ছি করেছে, ধিক্কার দিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে,—কিন্তু প্রতিবাদ একদিনও করেনি। নলিনীর এই আত্ম-গোপন করার পরিহাস বুদ্ধি খুব বড় অপরাধ নয়, বন্ধু মহলে এমন ঘটেই থাকে, কিন্তু অপরাধ তার নিজের। আজ আবার যেন নতুন ক'রে তার মনে হোলো, সে অপরের স্ত্রী, সে তার সীমানা ছাড়িয়ে, বিচার বুদ্ধি আর সামাজিক নীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে একটা অশোভন, অসঙ্গত, অন্যায় ও অপমানজনক অবস্থার মধ্যে নিজেকে ইতরভাবে টেনে এনেছে। তার লালায়িত প্রবৃত্তির দেলিহান লালসার চেহারা নলিনীর আর কোথাও জানতে বাকি নেই। প্রিয়সখি আর নলিনীর কাছে যে অনুরাগ ছিল সৌন্দর্য আর মাধুর্যে ভরা, আজ আত্মীয়তাবন্ধন-আবিষ্কারের মধ্যে এসে

সে-বক্ষ যেন নীরস, বিবর্ণ ও পঙ্কিল হয়ে উঠেছে। একটু আগে নলিনী আসবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অদূরবর্তী ওই পুরুষের হাত ধ'রে সে সাশ্রুনেত্রে উন্মাদিনীর মতো তার প্রণয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে, এমন কথাও বলেছে যা পৃথিবীর কোনো সমাজ, কোনো সভ্যতা, কোনো শিক্ষাধারাই কখনো বরদাস্ত করেনি, সেই কথা মনে ক'রে অনুশীলা অন্তরে অন্তরে মর্মান্তিক ধিক্কারে নিজেকে হিংস্র সর্পিনীর মতো দংশন করতে লাগলো।

এই কষ্টদায়ক নীরবতার মধ্যে বীরেশই আগে কথা আরম্ভ করলো। বললে, জীবনবাবু যে মাসীমার বাবা, এ ত' আমি আগে জানতুম না!

অলক্ষ্যে একবার অনুশীলার দিকে চেয়ে নলিনী হেসে উঠলো। বললে, আগে ত' তুমি অনেক কিছুই জানতে না? জীবনবাবুর মুখে ত' শুনলুম তোমাদের মস্ত বড় যুদ্ধ হয়ে গেছে। কে হারলো আর কে জিতলো বলো দেখি?

বীরেশ বললে, যুদ্ধ স্থগিত আছে, এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

নলিনী বললে, বেশ, খুব বাহাদুর তোমরা। অনেকদিন হোলো, আর যুদ্ধ ক'রে কাজ নেই। এবার শান্তিজল ছিটিয়ে দাও। আমি সব শুনেছি।

বীরেশ হেসে বললে, তুমি বুঝি এলে এবার শান্তির অগ্রদূত হয়ে? জীবনবাবু বুঝি বক্‌শিস্ কবুল করেছেন?

হাসিমুখে নলিনী বললে, বক্‌শিস্? তবেই হয়েছে। জীবনে আসল পাওনাই পেলুম না, তার ওপর আবার উপরি!

পাওনা ত কেউ হাতে তুলে দেয় না নলিনী, আদায় ক'রে নিতে হয়!

মেয়েমানুষ,—তাই বোধ হয় পারিনি, নলিনী বললে, প'ড়ে প'ড়ে মার খেতেই শিখেছি, দাবী প্রতিষ্ঠা করবার জোর পাইনি।···কি রে অনুশীলা, সেই থেকে মাথা হেঁট ক'রে রইলি যে?

মুখ তুলে অনুশীলা বললে, তোর কথাই ভাবছি। এমনভাবে বোকা বানালি যে, প্রায় শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে।

বীরেশ কিছুই বুঝতে পারলো না। কেবল উপস্থিত দুই নারীর মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে যে-কটাক্ষ বিনিময় হয়ে গেল, সেইদিকে একবার তাকিয়ে সে মাথা নিচু ক'রে রইলো। যে-অসংযত প্রণয়োচ্ছ্বাস একটু আগে নির্জন ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে অনুশীলা তার কাছে নিবেদন করে ফেলেছে, তারই একটা বিসদৃশ রেশ তার মনের মধ্যে পাক খেয়ে ফিরছিল। সমস্তটাই যেন কেমন শ্রীহীন অলজ্জায় ভরা, যেন সাময়িক চিত্তবিকারের অশোভন একটা অভিব্যক্তি। আজ নলিনীর উপস্থিতিতে সেটা যেন আরো মলিন হয়ে দেখা দিল।

নলিনী হেসে উঠলো। বললে, লজ্জা কিরে, এমন ত' হয়েই থাকে। কথা দিচ্ছি, তোর কোনো ভয় নেই।

আজ এতকাল পরে নলিনীকে সহসা অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় স্থানে আবিষ্কার ক'রে বীরেশের হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে মুখর ও অনর্গল হয়ে উঠতে চাইছিল, কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়, এখানে ভয়ানক বাধা। যে-অনুশীলা তার সর্বপ্রকার বিপ্লবকর্মের সহকর্মিনী, আজ সে-ই যেন পর্বত-প্রমাণ বাধা হয়ে তার আনন্দের পথ অবরোধ করে দাঁড়ালো। বীরেশ মনে জানে, নলিনীর সম্পর্কে তার কোনো চিত্তদৌর্বল্য অনুশীলা মার্জনা করবে না, কোনো পক্ষপাতিত্বকেই সে উদারভাবে বিচার করতে চাইবে না। আজ নলিনী ব'লে নয়, কিন্তু প্রায় গত দশ বৎসর কাল যে-অবরোধের ভিতরে অনুশীলা তাকে আটক করে রেখেছে, সেখানে কোনো দ্বিতীয় নারীর সমাবেশ নেই, তার ত্রিসীমানায় কারো আসা সম্ভব হয়নি। আজ নলিনীর সঙ্গে

তার পূর্ব অন্তরঙ্গতার কাহিনী যদি অন্তুশীলার কাছে প্রকাশ পায়, তবে তার রোগা শরীরে এ-আঘাত কিছুতেই বরদাস্ত হবে না, একটা অমঙ্গল কিছু ঘটে যেতে পারে। অন্তুশীলার কয়েকটি কথাই সে কেবল মনে মনে আওড়াই হয়ে ভাবতে লাগলো,···কোনো রাক্ষসীর হাতেই তোমাকে তুলে দিতে পারবো না!···

নলিনী বললে, তোমার দেবীপুরের কাহিনী অন্তুর কাছে জানলুম, নবনগরের কাহিনীও শুনেছি। চেহারায় দেখছি তুমি সাহেব, পাঁচ হাজার লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কি এ সমস্তই আমার এই বান্ধবীর কল্যাণে তা মনে আছে ত?

বীরেশ হেসে বললে, আছে বৈ কি, তার জন্মে মাথা বিক্রীও ক'রে রেখেছি। এবার তোমার কাহিনী শুনি।

এবার অন্তুশীলা কথা বললে। সম্ভাষণটা বদ্‌লে দিল চক্ষের পলকে। বললে, আত্মীয়স্বজনের প্রতি আর আপনার একটুও টান নেই। নলিনীর কাহিনী শুনে আপনার লাভ?

বীরেশ তার মুখের দিকে তাকালো। বললে, লাভ? নলিনী লাভ-লোকসানের বাইরে।

আচ্ছা হয়েছে।—নলিনী চোখ পাকিয়ে বললে, সামনে এসেছি তাই এমন উদ্বেগ। খোঁজ খবর ত' রাখোনি এতকাল! এতক্ষণ এসেছি, একবার বাড়ীর কথাটাও জিজ্ঞেস করলে না। কী নিষ্ঠুর!

বীরেশ একটা নিশ্বাস ফেললো। বয়সের রেখা পড়েছে নলিনীর চোখের কোণে আর কপালে। তার গায়ের রঙে যৌবন কালের সেই আশ্চর্য আভার পরিবর্তে এসেছে কেমন একটা মসৃণ বিবর্ণতা। আগেকার সেই সুকুমার রক্তরাগ আর যেন খুঁজে পাওয়া যায় না, যৌবনসীমান্তকালের চেহারায় দেখা যায়, অবসন্ন জাহ্নবী প্রবাহের

স্তিমিত গৈরিকাভা, তা'তে আর চাঞ্চল্য নেই, নব নব তরঙ্গদলের আর উৎক্ষেপ নেই, সমস্তটাই যেন স্তিমিত, মন্থর। বীরেশ আর কথা বলতে পারলো না।

নলিনী বললে, আচ্ছা, আমিই বলছি, শোনো। আমি বিদেশে চাকরি করতে গিয়েছিলুম, তা তুমি জানো। সেখান থেকেই মাসিমার চিঠিতে একদিন জানতে পারি তোমার বাভাদিদি মারা গেছেন। তার পরেই মাসিমা বিধবা হ'লেন।

বীরেশ স্তব্ধ হয়ে রইলো।

তোমাদের বাড়ী জমী ইত্যাদি সমস্তই বিক্রি হ'য়ে গেছে। সেখানে এখন গেলে নাকি আর কিছু চিনতে পারা যায় না। তার ওপর দিয়ে নতুন রাস্তা হয়েছে।

বাবা কোথায়?

নলিনী বললে, মেসোমশাই? ঠিক জানিনে। একবার শুনেছিলাম, তিনি রাজমহলের ওদিকে কোন্ পাহাড়ের ধারে ছোট একটা বাড়ী নিয়ে চ'লে গেছেন, তারপরে অবশ্য শুনেছি তিনি কলকাতায়ই আছেন, তবে কি যেন একটা ঠিকানায়—শহরের দক্ষিণ দিকে। অনেক কাল তাঁকে আমি দেখিনি। সমস্তই যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে।

এর পরেই যে-প্রশ্নটা আসে সেটা খুবই স্বাভাবিক। অরুণীমা তাকালো নলিনীর দিকে, নলিনী একবার চেয়ে দেখলো বীরেশের মুখের প্রতি। কিন্তু সে-মুখে উদ্বেগের আভাস মাত্র নেই। বিগত জীবনের কথাই কেবল তোলাপাড়া ক'রে বীরেশ নিঃশব্দ নতমস্তকে চুপ করে রইলো। পিতার ইতিবৃত্ত নতুন করে জানবার কৌতূহলও আজ তার কাছে যেন অতি বিসদৃশ মনে হ'তে লাগলো।

কিন্তু তিনজনের মধ্যে অনুশীলাই তার ঔৎসুক্য দমন করতে পারলো না। সে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, নলিনী ?

নলিনী মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

তুই ত সব কথাতেই আমাকে ফাঁকি দিয়েছিস। শুনেছি বীরেশবাবু বিয়ে করেছিলেন, সেদিকের কোনো খবর নেই ?

প্রশ্নটার মধ্যে অনুশীলার নিজেরই লজ্জা থাকা উচিৎ ছিল। নলিনী তার দিকে ফিরে তাকালো। কিন্তু তার উত্তর দেবার আগেই বীরেশ ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এটা আমার না শুনলেও চলবে, নলিনী।—এই ব'লে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু, সন্দেহ নেই। নলিনী কেবল বললে, শুনতে ও চায় না, কারণ, ওর শোনবার দরকার নেই। হয়ত আমার সঙ্গে দেখা হওয়াটাও বীরেশ পছন্দ করেনি। ওর সব চেয়ে বড় ব্যথার ইতিহাস আমি জানি ব'লেই ও মনে করে।

উৎসুক হয়ে অনুশীলা বললে, স্ত্রীকে ত্যাগ করার কি আর কোনো কারণ ছিল ?

আমি কিছুই জানিনে, ভাই।

অনুশীলা বললে, অপরাধ হয়ত আমারই নলিনী। তোকে ত' বলতে কিছু বাকি রাখিনি, সবই বলেছি। হয়ত আমি স'রে গেলেই সমস্ত ব্যাপারটা মিটে যায়।

নলিনী চুপ করে রইলো। অনুশীলা বলতে লাগলো, আগে জানতুম না, জানলুম অনেক পরে। উনি তোমার আত্মীয়, কিন্তু এতদিন মনে ক'রে এসেছি, উনি আমারও পরমাত্মীয়। দীর্ঘ দশ বছর সত্যই আমি ওঁকে চোখে চোখে রেখেছি। হয়ত অন্যায় করেছি, হয়ত করিনি, হয়ত তোরা এই দুর্নীতির জন্যে সবাই ছি-ছি করবি। কিন্তু আমি

জানি, ওর মধ্যে শক্তিও কিছু জুগিয়েছি। বীরেশবাবুর সমস্ত কাজের মধ্যে যত দুঃখ আর দুর্দশা ছিল,—আমিও তার কিছু কিছু অংশ নিয়েছি, এই আমার সান্ত্বনা, নলিনী।—বলতে বলতে তার চোখে জল এলো!

নলিনী প্রশ্ন করলো, দাদা কি তোদের সম্পর্ক কিছুই জানেন না?

লজ্জায় যেন অনুশীলার কণ্ঠরোধ হয়ে এলো। সে ধীরে ধীরে বললে, আমি কোনো নোংরা কাজ করতে পারি, এ তিনি বিশ্বাস করেন না। স্বামীকে আমি কোনদিনই বঞ্চনা করিনি, ভাই? প্রত্যক্ষেও নয়, অপ্রকাশ্যেও নয়;

এ তুই কি বলছিস, অনু? মেয়েমানুষের স্বভাবের গঠনে ত একথা বলে না? লক্ষ্যবস্তু দ্বিধা-বিভক্ত হ'লেই মেয়েদের বড় দুর্দিন, তারা পথ হারায়। শক্তির বিভিন্ন রূপ হ'তে পারে; কেউ দুর্গা, কেউ কালী, কেউ অন্নপূর্ণা, কেউ বা জগদ্ধাত্রী,—কিন্তু সকলের লক্ষ্য একই, সেই মহাদেব। প্রকাশ ভিন্ন, কিন্তু স্বভাব বিভিন্ন নয়। এটাকে কেউ নীতি প্রচার বললে ভুল হবে, এটা মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের কথা। একই সময় একই কালে একই ব্যবস্থার মধ্যে দুই প্রণয়ী মেয়েদের থাকতে নেই,—অন্তশ্চেতনায় পক্ষপাতিত্ব কিছু থাকবেই। দেবী দ্রৌপদী যদি এমন কথা বলতেন, পাঁচজন স্বামীর প্রতি তাঁর সমাদর একই প্রকার, তবে তিনি আত্মপ্রতারণার পাপে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেন, কিন্তু তা তিনি হন নি! একক অনুরাগই তাঁর জীবনকে অবশেষে সার্থক করেছিল। সত্য বলতে গিয়ে স্বর্গের লোভও তিনি ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু মিথ্যা ব'লে নারীজাতিকে তিনি অবমানিত করেন নি। তালিকা বাড়াতে পারি, অনু—কিন্তু থাক, সত্যের মূলনীতি জানলেই যথেষ্ট, বিতর্কের কোনো দরকার নেই।···তোর কি আবার জ্বর এলো নাকি রে?

কম্বলখানা গায়ের উপর তুলে নিয়ে অরুণীলা শুয়ে রইলো। শীতের বাতাসে তার চোখের কোণে অশ্রুর বিন্দু ধীরে ধীরে শুকিয়ে এলো। সে বললে, এই সময়েই ত রোজ জ্বর আসে। শীত করছে একটু একটু।

কাশিটা কি একটুও কমে নি?

ঠিক বোঝা যায় না। ইন্‌জেকশন্ চলছে।

নলিনী বললে, তুই এমন কথা কদাচ ভাবিসনে, আমি তোকে নিরুৎসাহ করছি। তোকে সৎপথে ফিরিয়ে আনাও আমার কাজ নয়। সংসারে ভালোবাসা বড় দুর্লভ ভাই, তাকে বাঁচিয়ে রাখা আরও কঠিন। বীরেশের এই উন্নতির মূলে তোরই সাধনা, তোরই উৎসাহ দেখছি। পুরুষরা হচ্ছে একটি বিরাট যন্ত্রশালার আধার, কিন্তু মেয়েরা তার পিছনে বিদ্যুৎশক্তি। আমি জানি তোর মনের কথা, আমি জানি তোর তপস্যার কাহিনী। এতে তোর লজ্জা বিন্দুমাত্রও কোথাও নেই। আমি কেবল বলছিলুম, নিজেকে না জানার গুণে নিজেদেরই অনেক সময়ে আমরা প্রবঞ্চনা করি। স্বামীকে ঠকিয়ে লুকিয়ে যারা ব্যভিচার করে তাদের কথা আমি বলছিনে, কিন্তু আমি বলছি, পুরোটা ভালোবাসা নয়, শ্রদ্ধা-সম্মানকে প্রেমও বলে না।

অরুণীলা হাসিমুখে বললে, তুই কি করে জানলি?

আমি?—নলিনী বললে, বোধহয় পাইনি বলেই জানি। যা পাওয়া যায় না তাই বড় হয়ে থাকে কল্পনায়, যা পাওয়া গেছে তা মুছে যায়।

এ ত' কবিত্ব!

না, মানুষের স্বভাবের কথা। ঈশ্বরকে পাইনে, তাই সে-বস্তু এত বড়; ভালোবাসা পাইনি, তাই ওটা এত সুন্দর; মনের মতন জীবন পাইনি তাই তার জন্যে এত ক্ষুধা! এ কথা আমার নয়, সব মানুষের মনের কথা।

—নলিনীর মুখ দীপ্ত হ'য়ে উঠলো।

সাগ্রহে অমুশীলা বললে, তুই অনেক বদ্‌লেছিস।

হাসিমুখে নলিনী বললে, তোদের দেখার দোষ, এক তিলও বদ্‌লাইনি। অদ্ভুত একটা শিক্ষাধারার মধ্যে তুই, আমি, বীরেশ—আর সবাই মানুষ। সন্দেহ করতে শিখেছি, অশ্রদ্ধা করতে জেনেছি,—কিন্তু বিশ্বাস করতে যেন ভয় পাই। মানুষকে আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, কারণ নিজের ওপরেও আর শ্রদ্ধা নেই, সম্মান নেই। নৈরাশ্যবাদ আমাদের জীবনের মূলে কেন বাসা বাঁধলো, আজো বুঝতে পারিনি। ছাত্রজীবনে গা ঢেলে দিয়েছিলুম একটা অদ্ভুত বিকারের আবহাওয়ায়। মানুষকে করবো বিদ্রূপ, সভ্যতাকে করবো ব্যঙ্গ-মিশ্রিত সন্দেহ, অস্তিত্ববাদকে ঘৃণা করবো, চরিত্রের কোনো নীতি মানবো না। পৃথিবীর সভ্যতায় আর বিজ্ঞানের, দর্শনের, ইতিহাসের—সমাজের সর্ববিষয়ে সকল ক্ষেত্রে সংশয়ের প্রশ্ন জেগেছে,—জড়বাদের পায়ের তলায় মানবতা দলিত হচ্ছে,—এই হোলো মোট কথা। যন্ত্র সভ্যতার চরম পরিণতি হোলো স্বার্থ আর লোভের সংঘাতে, মানুষের বহুযুগের পরিশ্রম ব্যর্থ হোলো অকল্যাণে, ঈশ্বর উৎপীড়িত হচ্ছে মানুষের বুকের মধ্যে, আমাদের বাঁচবার আর কোনো মাল-মসলা নেই। সুতরাং গাল দিয়ে বেড়াচ্ছি এই অভিশপ্ত বিংশ শতাব্দীকে।

অমুশীলা বললে, আরও অনেক নালিশ আছে, নলিনী।

জানি।—নলিনী বললে, কিন্তু মোটামুটি এই। মেয়ে ইস্কুলে চাকরি করতুম, সে-কাজ ছেড়ে দিলুম কেন? নিজের শিক্ষায় সন্দেহ—সেই কারণে। যা শিখেছি তা না শিখলেও চলতো, এই কথাই ভাবতে বসেছি। সমস্ত নালিশ যদি তুলে নিই, কী থাকে? শরীরে বাদ জরের উত্তাপ বাড়ে, নানা উপসর্গ আসে। জ্বর ছাড়লে অপরিসীম স্বস্তি,

কোনো নালিশ নেই। সেই বীজাণু ঢুকেছে আমাদের মনে, তাই এত অসুখ। এ-যুগে মনোবিকারই সর্বনাশের মূল,—এর চিকিৎসার ভার নেবে কে? আজকে বিপুল শক্তিতে নবনগর সৃষ্টি করো, কাল আবার ভেঙে পড়বে। এক সাম্রাজ্য গ'ড়ে তোলো, কাল তার পতন। বস্তুর স্তূপ যত পর্বত-প্রমাণই হোক, তার প্রাণ নেই। সেই অখণ্ড অনন্ত নির্মল প্রাণ-সঞ্চারের দায়িত্ব আজ কে নিতে পারে? মানুষের সমস্ত সৃষ্টি আজ অপসৃষ্টি হয়ে দাঁড়ালো কেন? ক্ষমতার লোভ, অর্থের লোভ, প্রভুত্বের লোভ, সাম্রাজ্যের লোভ—কেন এত লোভের ছড়াছড়ি? এর কারণ, মানুষ নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে জাগিয়ে তুলতে ভুলে গেছে; মুখোসপরা মহত্বের অনুকরণ ক'রে যারা বড় হয়ে চলেছে, তাদেরই নকলে ভরে গেছে দেশদেশান্তর। চেয়ে দেখো চাতুরী পাচ্ছে রাজ্যপাট, ইতরবৃত্তির নাম রাজনীতি, উন্মত্ত ধর্মান্ধতার নাম ধর্ম, উচ্ছৃঙ্খলার নাম স্বাধীনতা, আত্মঘাতী দুষ্কৃতির নাম পৌরুষ—এরা জায়গা জুড়ে রয়েছে, পথ কোথাও নেই।…মেয়েমানুষ হ'য়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি দশ বছর, এর সমাধান খুঁজে পাইনে। জাতের জন্যে ভাবছিনে, ভাবছি নিজের অধঃপতন। স্বাধীনতার বুলি, পাণ্ডিত্যের বুলি, মহত্ত্ব আর উপদেশের বুলি—সবই শুনলুম, কিন্তু মন ভরলো না। তাই খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। হয়ত এমনি ক'রে ঘুরতে ঘুরতেই মূলমন্ত্র পেয়ে যেতে পারি।

নলিনী থামলো। বাইরে অপরাহ্নের রোদ রাঙা হয়ে এসেছে। শীত শেষের বেলাটুকু যাই-যাই করছে। নলিনী যা বলতে চাইলো, তা যেন তার বলা হোলো না, আসল কথার গোড়ায় এসে তাকে থেমে যেতে হোলো। অনিলের সনির্বন্ধ অনুরোধে আজ হঠাৎ সে এসে পড়েছে, কিন্তু তার আসাটা অঞ্জলীলার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়েছে নিশ্চয়ই। অথচ

খানপুরে আজ আর ফিরে যাওয়া চলে না, সন্ধ্যা আসন্ন। গাড়োয়ান তাকে পৌঁছে দিয়ে আগেই চ'লে গেছে।

দাদার আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন রে?

অমুশীলা বললে, অনেক রকম কাজ নিয়ে গেছেন। তাছাড়া হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে একটা রিপোর্ট আনতে হবে।

বদলী হবার নতুন কোনো চিঠি এসেছে?

আসেনি বটে, তবে এবার আর বদলী না ক'রে বোধ হয় ছাড়বে না।

তাহ'লে ত মুস্কিল!—ব'লে নলিনী অল্প একটু হাসলো। পুনরায় বললে, দেবীপুর ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হবে ত'?

অমুশীলা বললে, না হ'লে চলবে কেন রে?

কিন্তু ছাড়বার কথা উঠতেই ত' তোর জ্বর এসেছে।

অমুশীলা হেসে উঠলো; তার হাসির চেহারায় নলিনীর মুখে চোখে কি রেখা যে ফুটলো, তা আর সে লক্ষ্য করলো না।

হাসি থামিয়ে সহসা একসময়ে অমুশীলা বললে, আচ্ছা, নলিনী? সত্যি কথা বলবি একটা?

বলবো।

বীরেশবাবু স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন কেন?

স্ত্রী ওর যোগ্য ব'লে মনে করেনি।

যোগ্য করে তোলেন নি কেন? উনি ত সবই পারেন?

নলিনীকে আবার আত্মদমন করতে হোলো। বললে, সব উনি পারেন না। রুচিও ছিল না।

কেন? মন বুঝি অন্য কোথাও ছিল?

নলিনী হেসে ফেললো। বললে, হ্যাঁ তোর দিকে।

কিন্তু অমুশীলা তার হাসিতে যোগ দিল না। চুপ ক'রে থেকে

এক সময়ে বললে, বোঝা যায় না কিছু, উনি অদ্ভুত। মানুষের দিকে চোখ পড়লো না, মন রইলো কাজের দিকে। বোঝা গেলনা কিছু।

এবার নলিনীর পালা। কপালের রুক্ষ চুলের ঝলক ডান হাতে সরিয়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করলো, এবার আমার কাছে একটা সত্যি কথা বল? গোপন করবিনে কিন্তু!

অনুশীলা মুক্তকণ্ঠে বললে, যা সব চেয়ে গোপন, তাও ত' তোর কাছে গোপন করিনি ভাই।

নলিনী বললে, দাদার দিক থেকে কি তুই কোন অবিচার পেয়েছিস?

অনুশীলা বললে, একটুও না। সুবিধা মতো স্বামীর সুখ্যাতি করা মেয়েদের অভ্যাস। কিন্তু তুই ত' প্রায় দু'মাস হোলো দেখছিস, ওঁর আচরণে কোনো অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছিস?

মোটেই না। দেবতার অবতার বললেও কম বলা হোলো। তবে কেন তোর এই দুরারোগ্য ব্যাধি?—নলিনী হেসে বললে।

ক্লান্তকণ্ঠে অনুশীলা বললে, অনুরাগ ভিন্ন প্রতিভার দাম আর কি দিয়ে শোধ করবো বল্ ত? হয়ত তোদের সঙ্গে আমার মিলবে না, আমার চোখ আলাদা। কিন্তু চন্দ্রের সঙ্গে সাগরের জোয়ারের সম্পর্ক ঘোচাবে কে? তার যোগাযোগ শুধু শূন্যে। সমাজনীতির কথা পাড়ো, সতী-ধর্মের কথা বলো, মাথা হেঁট ক'রে মেনে নেবো,—কিন্তু যে-যন্ত্রণা ফুল ফোটায়, যে-বিক্ষোভ সমুদ্রের ঢেউয়ে,—সে ত' স্বভাবের নিয়ম, নলিনী?

কিন্তু পরিণাম?

মরীচিকা!—অনুশীলা নিশ্বাস ফেলে বললে।

আজ যদি তুই বদলী হয়ে যাস, স্বামী ছাড়া ত' আর কেউ সঙ্গে থাকবে না? শূন্যের যোগাযোগ শূন্যেই ত' মিলিয়ে যাবে!

হাসিমুখে অনুশীলা বললে, এত হিসেব কি আগে করেছিলুম ?

কিন্তু এবার ? হিসেব না ক'রে অন্ধতায় গা ভাসাবি, সে মেয়ে ত' তুই নয় !—নলিনী বললে, আবার বলছি, এ আমার নীতি- উপদেশ নয়, আমি তোর সমস্যাকেই দেখছি নানাদিক থেকে। তোর ঘরেও যদি আনন্দ চ'লে যায়, পথেও যদি স্বস্তি না পাস, —থাকবি কোন্ চুলোয় ? রোমান্সের বয়স তোর নয়, এখন ফুলের চেয়ে ফলের দিকে টান। বসন্ত পেরিয়ে এসেছে বর্ষায়,—গন্ধের চেয়ে স্বাদের দিকে ঝোঁক বেশি। খোসার রঙে এখন আর মন ভুলবে না, শাঁসের রসে রসনা মাতবে।

জ্বরের উত্তাপে অনুশীলার চোখ দুটো রাঙা। কিন্তু তবুও তার কলকণ্ঠের হাসিতে আনন্দের স্রাব ফেনিয়ে উঠলো। বললে, পোড়ারমুখি, বিয়ে করার পর আমার না হয় পতন হয়েছে, কিন্তু বিয়ে না ক'রে যে তুই গোল্লায় গেছিস। কোথায় তোর কে আছে বল দেখি সত্যি ক'রে, এখনই শাঁখ বাজিয়ে মঙ্গল ঘট বসাই। বল্ হতভাগি।

নিজের বুকের উপর একটি আঙুল ডুবিয়ে নলিনী হাসি মুখে বললে, আছে বৈ কি এখানে কেউ একটা। 'আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি সকলি ফাঁকি !'

কৌতুক ঔৎসুক্যে অনুশীলা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বললে, সত্যি ভাই বল, এখন কেউ কোথাও নেই। কথা দিচ্ছি, ব'লবো না কাউকে।

আচ্ছা বলছি।—ব'লে নলিনী গুছিয়ে ব'সলো। তারপর বললে, প্রথমেই ব'লে রাখি, বয়সে সে আমার চেয়ে ছোট।

ওমা, সে কি রে ? সমবয়সীও নয় ?

না। কারণ, সব শাস্ত্রেই দেখা গেছে তার বয়স একটুও বাড়ে না। ভদ্রলোকের তিনটি দোষ আছে। প্রথম, জাতে একটু নীচ ; দ্বিতীয়, একটু নির্বোধ ; তৃতীয়, স্বভাব-চরিত্রের কিছু দোষ।

মানে ?

মানে, ওদিকটা বড় আলগা।

কিন্তু তার জন্মে তোর মাথা খারাপ হোলো কেন ?

নলিনী বললে, অনেকেরই হয়েছে, আমার একার নয়। একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী কত যে চোখের জল ফেললো তার জন্মে, তার সীমা নেই। লোকটির দুই বিবাহিত স্ত্রী,—দুই সংসার। তবুও বাইরের মেয়ের দলে তার ভয়ানক খ্যাতি।

কি করে ভদ্রলোক ?

কিছুই না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

অরুণীলা বললে, তবে এমন কী গুণ পেলি তোরা তার মধ্যে ? রূপবান বুঝি খুব ?

এমন কিছু নয়, গায়ের রং ত ময়লা।

খুব লম্বা-চওড়া, স্বাস্থ্যবান ?

না, মেয়েলি ছাদের চেহারা। কেবল চোখ দুটো ভালো, হাসিটা সুন্দর।—নলিনী হাসতে লাগলো।

মুখের একটা শব্দ ক'রে অরুণীলা বললে, তোরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, তাই রুচিবোধ নেই। যে বর্ণনা দিলি, তা'তে ভদ্র মনে আঘাত লাগে। বুঝেছি তোর অবস্থা। এই বেলা পেন্‌সন্ পাওয়া কোনো বুড়োকে বিয়ে ক'রে ফেল্, তাতেও কাজ দেবে। দুই স্ত্রী থাকতেও হ্যাংলার মতন ছুটেছিস্ তার পেছনে, তোদের মরণ নেই !

নলিনী বললে, কিন্তু তা'কে দেখলে তুইও যে মরতিস ?

না দেখেই ঘেন্নায় মরছি। দূর হ পোড়ারমুখি।—ব'লে অরুণীলা কম্বল টেনে পাশ ফিরে শু'লো। সমস্ত মুখ ভ'রে নিঃশব্দ কৌতুকে নলিনী ব'সে ব'সে হাসতে লাগলো।

পাশ ফিরেই অনুশীলা বলতে লাগলো, তোর মতন বুড়ি কুমারীর মুখে দর্শনশাস্ত্র শুনেই তখন বুঝেছি, তোর আর কোনো আশা নেই। তোদের আত্মনিগ্রহের পরিণামই হোলো তোদের মুখে ঘন ঘন নীতি-উপদেশের বুলি। মনে মনে পাক ঘাঁটচিস, মুখে ছড়াচ্ছিস আতর—তারপর মুখ ফিরিয়ে সে বললে, তোর এমন লখিন্দরটির নাম কি শুনি ?

নাম ?—নলিনী ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে, নামটা অবশ্য সেকেলে। নাম হোলো, সর্বেশ্বর ঘটক।

স্তব্ধ চক্ষে অনুশীলা তার দিকে কিছুক্ষণ তাকালো। তারপর বললে, ঘটকটি থাকে কোথায় ?

বাইরে দ্রুত পায়ের শব্দ আর গলার স্বর শুনে দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। তারপরেই নলিনী চেয়ার ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ওই দাদা আসছেন।—ব'লে সে অনুশীলার কাছে স'রে গিয়ে হেসে বললে, ওরে ভাইনি, থাকে কোথায় জানিসনে ? থাকে এই বৃন্দাবনে !—এই ব'লে নিজেরই বক্ষঃস্থল দেখিয়ে নলিনী হাসতে হাসতে পাশের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল।

কিন্তু বীরেশ আর নলিনীকে নিয়ে অনিল যখন এসে ঢুকলো, তখন কাশতে কাশতে মুখ চোখ রাঙা ক'রে অনুশীলা উঠে বসতে চেষ্টা করছে,—নলিনী তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধ'রে পাশে বসলো। এই দৃশ্যটা বীরেশ আগে দেখেনি,—এমন অসুস্থ কণ্ঠস্বর শুনে সে একটু ভীতও হোলো। বললে, অসুখটা কি, সেন সাহেব ?

কাগজপত্র ও রকমারী ঔষধের বাক্সটা টেব্‌লের ওপর রেখে অনিল বললেন, এখনও সঠিক বলা যায় না হে। ওই দেখ না আমার বোনটির মুখখানি,—বুঝতে পারো, ওর অসুখটা কোথায় ?

অরুণীমাকে শুইয়ে নলিনী হাসিমুখে বললে, আপনি আগে অসুকে সারিয়ে তুলুন দেখি, তারপর আমাদের ভূত ছাড়াবেন।

কেমন একটা অস্বস্তিতে বীরেশ একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। বললে, মিস্টার সেন, বুঝতে পারছিনে কিছু। প্রায় ছ' মাস বাদে এলুম। এমন কি হোলো আপনার স্ত্রীর যার জন্মে এত চিকিৎসার ব্যবস্থা ; এমন কি হোলো আপনার, যার জন্মে আপনার অতগুলো মাথার চুল পাকলো?

মিস্টার সেন ঔষধ ঢেলে স্ত্রীর মুখে দিয়ে ক্লান্ত হাসি হাসলেন। বললেন, চল্লিশ কবে পেরিয়ে গেছে, তুমি বোধ হয় খবর রাখোনি।···কি নলিনী, মুখ লুকোলে যে? সেদিন দুজনে ব'সে যে বয়সের হিসেব করলুম?

বীরেশ বললে, কিন্তু অসুখের কথা আপনি আমাকে একবারও জানান নি, সেন সাহেব। আমি পর সন্দেহ নেই, কিন্তু একেবারেই যে নিষ্পর, সে-কথাও আপনি জানিয়ে দিলেন এবার।

থামো হে, ভাবালু বালক।—ব'লে অনিল সস্নেহে বীরেশের পিঠের উপর হাত ঠুকলেন। বললেন, হৈ চৈ ক'রে সবাইকে ডাকলে কি আর অসুখ সারে? ললিতকেও ডাকতে পারতুম, কিন্তু কি হবে? মনে করেছিলুম, শেষকালটা তোমার নবনগরে গিয়েই বাসা বাঁধবো, তাতে বিধি বাম। খবর নেবো ব'লেই খবর দিইনি।

বীরেন বললে, আপনাকে নাকি শীঘ্রই বদলী হ'তে হবে?

হ্যাঁ, আজ একেবারে অর্ডার নিয়ে এলুম। আগামী বৃহস্পতিবারের বারবেলা এই গ্রামের মায়া কাটাতে হবে। যেতে হবে অনেক দূর, খুলনায়।

স্ত্রীর ব্যবস্থা কি করছেন?

বিপজ্জনক প্রশ্ন বটে।—অনিল হাসিমুখে বলিলেন, উনিও পতির অনুগামিনী হবেন!

সেখানে রীতিমতো চিকিৎসা চলবে ত?

নলিনী কথার জবাব দিল। বললে, ডাক্তার যদি বলে তবে নবনগরের হাসপাতালে রাখলে কেমন হয়, দাদা ?

সচকিত বিবর্ণ মুখে বীরেশ নলিনীর দিকে তাকালো।

অনিল বললেন, কি হে, প্রস্তাবটা কেমন লাগে ?···আরে এত নার্ভাস হচ্ছ কেন, ভাই ? এইটুকু অসুখে এত দুর্ভাবনা ? বীরেশ বোধ হয় এই ক'মাসে সাইকো-প্যাথলজি ডেভেলপ্ করেছে, কি বলো অনুশীলা ?

অনুশীলা শীর্ণ হাসিমুখে বললে, আর ওঁকে ক্ষেপিয়োনা তুমি। কী কুলগ্নেই দেখা হয়েছিল তোমাদের দুজনে।

বাস্তবিক!—অনিল বললেন, নলিনী, তুমি বোধ হয় শোননি, ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয় মারপিঠের মধ্যে। আমি তখন পরিপূর্ণ হাকিম, দিলুম দুই বন্ধুকে পাঠিয়ে হাজতে। গ্রামে আর দেশে সে কী থ্রীল্!

নলিনী হাসিমুখে বললে, শুনেছি সব অনুর কাছে।

বীরেশ বললে, সেই সময় আপনি প্রশ্রয় না দিলেই ভালো করতেন, মিস্টার সেন।—ব'লে সে মুখ ফিরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার যাওয়াটা অবশ্যই নাটকীয়। কিন্তু তার শেষ কথাটায় অনুশীলাও কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল, তেমনি অনিলও হতচকিত হয়ে এক সময় প্রশ্ন করলো, নলিনী, তুমি বীরেশকে জানো চিরকাল, কি হোল ওর বলো ত ?

নলিনী বললে, দাদা, আপনাদের দুজনের জন্যেই ওর যা কিছু, ওর সৌভাগ্যের মূলেই আপনারা। অনুশীলার অসুখ দেখে সকাল থেকেই ওর মেজাজ গেছে খারাপ হয়ে। ওর ধারণা, স্ত্রীর প্রতি আপনি যথেষ্ট যত্ন নেন নি।

তাই নাকি ?—তা হ'লে এক কাজ করো। চট্ ক'রে তুমি একটু চা খাইয়ে দাও। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হ'লে বুঝিয়ে সব বলব। বড় প্রতিভা কিনা, কথায় কথায় মেজাজ বদলায়।

নলিনী হেসে উঠলো।

আর শোনো।—অনিল বললেন, প্রতিভাকে যারা সক্রিয় রেখেছিল ব'লে তুমি জেনেছ, তাদেরও একটু চায়ের প্রসাদ দিয়ো, বোন।

যে আজ্ঞে।—ব'লে নলিনী উঠে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যার আলো জ্বলেছে। দক্ষিণ বারান্দায় নিজের নির্দিষ্ট ঘরের বিছানার ওপর বীরেশ নিঃশব্দে ব'সে ছিল। ট্রাউজার ছেড়ে ধুতি পরেছে, গায়ে জড়ানো একখানা পশমী কাশ্মিরী আলোয়ান। এ ঘরটি অনুশীলা নিজের হাতে ঝাড়ে মোছে, অতিথির জন্ম সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সাজিয়ে রাখে। বীরেশ না থাকলে তালাচাবি পড়ে; দ্বিতীয় মানুষ এ ঘরে ঢোকে না।

কতক্ষণ সে বসেছিল, এক সময়ে পায়ের শব্দে সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে নলিনী এসে ঢুকে বললে, দাদা বললেন, চা খেয়ে একটু মাথাটা ঠাণ্ডা করো তুমি।

বীরেশ বললে, এই বুঝি তোমার প্রথম সম্ভাষণ?—ওকি, চা রেখে পালাচ্ছ যে?

নলিনী দাঁড়ালো। বললে, কথা বলতে ভয় করে যে তোমার সঙ্গে!

ভয়! আমার কাছে?—বীরেশ বললে, দশ বছর পরে এই বুঝি পুরস্কার?

নলিনী চেয়ারে বসলো। তারপর পেয়ালাটাকে বীরেশের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললে, বোধহয় তুমি ভাবতেই পারোনি, এখানে আমার সঙ্গে দেখা হতে পারে?

হ্যাঁ, স্বপ্নেরও অগোচর। সেই তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, বর্ষার দিনে, রজনী ছিল সঙ্গে। মনে পড়ে?

খুব। কী ছেলেমানুষ ছিলুম তখন।

বীরেশ বললে, বোধ হয় ছেলেমানুষ ছিলে না। বরং আজ আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার ভয় করে, এইটিই ছেলেমানুষী।...কিন্তু দুমাস হ'তে চললো তুমি এসেছ, অথচ আমি খবর পেলুম না?

নলিনী বললে, খবর দিলে হোতো কি?

বীরেশ চুপ করে রইলো। বিস্মিত হোলো, অথবা ব্যথিত হোলো, ঠিক বোঝা গেল না। নতমস্তকে সে এক সময় বললে, জানিনে কি মনে ক'রে তুমি খবর দাওনি, হয়ত তোমার দিক থেকে কোনো দরকারও ছিল না।

নলিনী বললে, অনেককাল থেকে দুর্ভাবনা ছিল, এখানে এসে তার থেকে মুক্তি পেলুম।

কিসের দুর্ভাবনা?

আর কিছু নয়। বিদেশ-বিভুঁয়ে একটা মানুষ চলে গেল, তার পরিণামটা কি দাঁড়ালো তাই ভাবতুম। এবার থেকে আর কিছু না হোক, নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারবো।

আর কোনো প্রশ্ন করতে বীরেশের মুখে বাধলো। নলিনী এতকাল কোথায় ছিল, অথবা এরপর যাবেই বা কোথায়, সে-কথা আজকে জানার ঔৎসুক্য অত্যন্ত অশোভন। এতকাল একটা দুস্তর জীবন-যাপন করার পথে হৃদয়কে সে কোথাও মোহগ্রস্ত হ'তে দেয়নি; চিত্তবৃত্তির সমস্ত ধারাগুলোকে কর্মকাণ্ডের দিকে একমুখীন্ করে রেখেছিল। আজকে নলিনী,—যে-নলিনী তার সমগ্র সত্তায় মূলকেন্দ্রে ব'সে তার অধ্যবসায়ের উৎসকে অক্ষুণ্ণ ক'রে রেখেছে,—সে যদি বৈরাগ্য প্রকাশ করে, অভিযোগ করা চলবে না। তার জীবনের সর্বশেষ অধ্যায়টা এখনো বাকি, সেটা অজ্ঞের অধ্যায়। পুরুষ হলেও সে জানে, কোথাও যেন তার একটা প্রকাণ্ড

ঋণ জমে উঠেছে, চোখের জল ছাড়া সে-ঋণ পরিশোধ করার আর দ্বিতীয় উপায় নেই। নলিনী যদি যায় বাধা দেওয়া কিছুতেই চলবে না,—তাকে ধরে রাখার জন্ম এতদিন পরে সহসা আগ্রহের আতিশয্যও হবে নিতান্তই বেমানান। তার চেয়ে বরং নলিনীর নামে উৎসর্গীকৃত পদ্মাসনার মন্দির নিয়েই সে খুশি থাকবে।......

চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ?

এই যে—ব'লে গা ঝাড়া দিয়ে বীরেশ চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিল। তারপর হেসে বললে, জীবনবাবুদের ওখানে আমার নামে খুব দুর্নাম শুনেছ ত ? প্রথম দিকে আমি অবশ্য ওদের খুবই নাড়া দিয়েছিলুম। ঘাড়ে ভূত চেপেছিল, গ্রামের লোকদের দুঃখ দুর্দশা দূর করবো,—ভূতটা এতদিনে ছেড়েছে।

ছাড়েনি।—নলিনীও হেসে বললে, সেই ভূতের দৌরাত্ম্যেই ত পেত্নীরা পালাতে বাধ্য হোলো!

পেত্নী আবার কারা ?—বীরেশ প্রশ্ন করলো।

নলিনী খুব হাসতে লাগলো। হাসি থামিয়ে এক সময় বললে, তোমাকে জানিয়ে রাখি, জীবনবাবুর সঙ্গে কলের মালিকদের একটা বিশ্রি বিবাদ হওয়ায় উনি সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। উনি জানতেন না যে, ওঁর মেয়ের ননদের ছেলে তুমি। উনি খুবই অনুতপ্ত। এমন কথাও আমাকে বলেছেন, বীরেশ যদি আবার দেবীপুরে কাজ করতে নামে, আমি এই বৃদ্ধ বয়সেও তাকে সব রকমে সাহায্য করবো। মালিকদের জব্দ করার সব কলকাঠি নাকি ওঁর হাতে!

বীরেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। উৎসাহিত হয়ে সে বললে, আমি দেখা করব তাঁর সঙ্গে।... ...অঞ্জলীনা জানে এ খবর ?

না।

তাড়াতাড়ি পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বীরেশ বললে, আমি বলে আসি অহল্যাকে,... এ খবরটা পেলে ওর অসুখও কমে যাবে।

তার অতি ব্যস্ততা লক্ষ্য ক'রে নলিনী বললে, এখন থাক্, দরকার হ'লে এ খবর আমিই দিতে পারবো।

বাইরে থেকে অনিল সাড়া দিলেন, আসতে পারি কি ?

নলিনী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে হাসিমুখে অনিলকে ভিতরে নিয়ে এলো। বীরেশ বললে, বসুন, চা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়েছি। এবার শুনি মিসেসের অবস্থা।

অনিল বললেন, আজ ভারি আনন্দের দিন, তোমরা সবাই আমার কাছে।

তাঁর কণ্ঠের করুণ গাম্ভীর্যে ঘরের আবহাওয়াটা যেন একটি মুহূর্তেই সহসা ম্লান হয়ে উঠলো। তিনি সস্নেহে নলিনীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, এদের নিয়ে অনেক বিপদ আপদ গেছে, বুঝলে ভাই নলিনী ? কিন্তু তবু এতকাল এদের আনন্দে-কলরবে আমার গ্রাম্য-নিকেতন মুখর হয়েছিল। এগারো বছর কাটালুম এই মহকুমায়, একই জায়গায় একজন হাকিমের এতদিন থাকা বোধহয় সরকারী কর্মচারীদের ইতিহাসে নেই। আমার শুভার্থীদের সংখ্যা জগতে বড় কম। ভাই, বোন, মা, বাপ কেউ নেই। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে একেবারে বঞ্চিত করেন নি। বীরেশকে পেয়েছিলুম সহোদর, তোমাকে শেষকালে কুড়িয়ে পেলুম সহোদরা। আমার যিনি স্ত্রী, তিনি আমার বারো বছরের ছোট। বিপদে আপদে, প্রবাসে, দুর্গমে তিনি আমার সঙ্গিনী। সন্তান তাঁর হোলো না ;...জানি সন্তানের ক্ষুধায় তাঁর বুভুক্ষু মন বহু কান্না কেঁদেছে ; বহু বিষয়ে লিপ্ত থেকে তিনি সান্ত্বনা পেতে চেয়েছেন। কিন্তু এবার হয়ত—

অনিলকুমারের গলা ধ'রে এলো। নলিনী সাশ্রুনেত্রে বললে, যোগ কি কারো হয় না, দাদা ?

হয় বৈ কি ভাই !···কিন্তু মানুষের সঙ্গ যখন একান্ত দরকার, তখনই যে তোমাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে নলিনী ! এই সপ্তাহেই আমাদের চলে যেতে হবে।

বীরেশ বললে, সহোদর ব'লে যাকে স্বীকার করলেন, সে আপনাদের ছাড়বে কেন ? আমার কি কোনো শক্তি নেই আপনার দুঃসময়ে এসে দাঁড়াবার ?

আছে বৈ কি ভাই।—অনিল বললেন, তুমি আশ্চর্য শক্তির পরিচয় দিয়েছো, এও জানি তুমি অনেক কিছু ত্যাগ করতে পারো আমাদের জন্যে। তবু তাকে নিঃসঙ্গ নিরিবিলি থাকতে হবে, ডাক্তারের এই হোলো উপদেশ।

ললিতকে কি পাঠিয়ে দেবো ?

না ভাই, তারও দরকার হবে না। অসুখটা যে ভালো নয়, মোটামুটি এই পর্যন্তই কেবল বলতে পারি। অবশ্যই এটা আমার দুর্ভাগ্য, আত্মীয় স্বজন কাউকে কাছে রাখা সম্ভব হোলো না।—একটু থেমে অনিল পুনরায় বললেন, খুলনায় যাচ্ছি, কিন্তু সম্ভবত সেখান থেকেও ছুটি নিতে হবে।···হয়ত দূরদেশে কোনো নদীর ধারে গিয়ে আবার বাসা বাঁধবো।

নলিনী উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে চোখের জল মুছে সে অনিলের ঘরে ঢুকে দেখলো, অঞ্জলীলা নিঃসাড়ে পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে সে কপালে হাত রেখে দেখলো, অন্যদিনের মতো আজো তার জ্বর এসেছে। দিনের বেলায় বিশেষ জ্বর থাকে না, কিন্তু সন্ধ্যার দিক থেকে বাড়ে। দেড়মাসের মধ্যে তার চেহারায় বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে।

এ কি, কাঁদছিস অরু ? জেগেছিলি এতক্ষণ ?

অনুশীলা ভগ্নকণ্ঠে বললে, কাঁদলে ত অসুখ সারে না ভাই!

নলিনী কাছে ব'সে বললে, অসুখের জন্ম কাঁদবি, এত ছেলেমানুষ তুই ত নয়, অনু। তবু তোকে ব'লে রাখছি, তোর চোখের জল যাতে না পড়ে তার চেষ্টা আমি করবো।

ম্লান হেসে অনুশীলা বললে, এর মানে জানিস?

জানি।

পারবি?

আত্মসম্বরণ করে নলিনী বললে, কেমন করে পারবো তা জানিনে। তবে তোর চলে যাবার সময় একথা না বললে চলবে কেন, ভাই?

অনুশীলা কিয়ৎক্ষণ থামলো। তারপর মুখখানা ফিরিয়ে ঘরের ভিতর এদিক ওদিক দেখে মৃদুকণ্ঠে বললে, ওকে চা দিয়েছিস?

বীরেশকে? হ্যাঁ।

কিছু বললে?

নলিনী চুপ করে রইলো। উত্তর না পেয়ে এই নিঃসন্দিগ্ধ নারী সরল বিশ্বাসে বললে, ওর মনের চেহারা কেবল আমিই জানি যে। আঘাতে যখন খায় চুপ ক'রে থাকে, ব্যথা যখন পায় একলা ভাবতে বসে। দশ বছর ধ'রে দেখলুম অদ্ভুত সংযম, আশ্চর্য শক্তি। কত খুঁচিয়েছি, কত মাতিয়েছি—কিন্তু দেখেছি শুদ্ধ সমুদ্র। হয়ত ও অত বড় নয়, অত বিরাট নয়,—কিন্তু মন দিয়ে ওর মন্দির গড়েছি আমার মনে।...তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো।

নিশ্চল হয়ে নলিনী বসেছিল।

অনুশীলা বলতে লাগলো, আজ সময় হয়েছে ওর চ'লে যাবার, বিদায় নেবার। ওকে চলে যেতে বল্ ভাই—হোক অন্ধকার রাত, ও যেন

আর না থাকে। সকাল বেলায় দেখলে আবার ভুলে যাবো, আবার হয়ত ভুল করবো।

নলিনী বললে, কেন যেতে বলছিস এত তাড়াতাড়ি ?

একবার নিশ্বাস নিয়ে অনুশীলা বললে, দলিলখানা দেবার জন্য ওকে আনিয়েছিলুম, আমার শেষ প্রণাম ওকে জানানো হয়েছে।

মনে মনে নলিনী চমকে উঠলো। কিন্তু মৃদু আলোয় তার মুখের চেহারা লক্ষ্য না ক'রে এই অন্তর্দৃষ্টিহীনা নারী বলতে লাগলো, কী চোখ, প্রতিভায় ধক্-ধক্ করছে; কী আশ্চর্য রূপ—কাছে এসে দাঁড়ালে গায়ে আলো পড়ে। কিন্তু রাখতে আর পারলুম না নলিনী, আজ স্বামীর অধিকার সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে চাই···আমি জানি উনি আজকাল কি চাইছেন—

দাদা কি কিছু বলেছেন ?

বলেন নি, কিন্তু প্রকাশ করছেন। ব্যথা দিতে চান না, কেবল ভদ্রভাবে স'রে যেতে চান।—হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অনুশীলা বলতে লাগলো, মাঝে মাঝে ভয়ানক বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে বুকের আগুনে সব পুড়িয়ে দিই···কিন্তু এই বা মন্দ কি! ভালো থাকে লাগলো, মাইরা পেলুম তাকে! পথের ধুলোয় কুড়িয়ে পেয়েছিলুম কোহিনুর, মুকুটে সে স্থান পেলো এই ত আনন্দ!

অধীর ঔৎসুক্য দমন করা সত্ত্বেও নলিনীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, তোর এত যে ভালোবাসা, বীরেশ কি তার কোনো প্রতিদান দিতে পারলো না? ঠিক ক'রে বল্ ত আমাকে ?

অন্ধ অশ্রুজলের মধ্যে অনুশীলা একবার উপর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর গভীর মৃদুস্বরে বললে, কি জানি ভাই, একথা ত ভাবিনি। পুজোই করেছি, প্রসাদ চাইনি। হয়ত পাবার লোভ

মনে মনে ছিল, কিন্তু সেবার লোভে অন্ধের মতো হাতড়েছি। মন যদি না পেয়ে থাকি, দুর্ভাগ্য,—কিন্তু সর্বস্বান্ত হ'তে পেরেছি এই ত আনন্দ।...তুই একটি কাজ কর্ ভাই, উনি চাইছেন—বীরেশকে তুই সরিয়ে দে।

নলিনী বললে, তোকে এ অবস্থায় দেখে সে যদি যেতে না চায়?

না না—অনুশীলা উত্তেজিত হয়ে উঠলো, যেমন ক'রে পারিস ভাই, ওকে সরিয়ে দে। উনি চান্ না, আমি বীরেশের মুখ দেখে বিদায় নিই।—এই বলে সে থেমে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে শান্ত নম্র হাসি হেসে পুনরায় বললে, ওর চাহনির মধ্যে হয়ত বিষ আছে, দেখলে আমার মনে বিষক্রিয়া সুরু হয়!...

অনুশীলা চুপ করলো; নিজের মনে সে যেন ডুব দিল। নলিনী আর তাকে কোনো প্রশ্ন করলো না, কেবল এক সময়ে তার আড়ষ্ট অবশ দেহটাকে নাড়া দিয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিষক্রিয়া যে তারও ভিতর সুরু হয়েছে, একথা অনুশীলা জানতে পারলো না। দাদার কাছে ঘৃণাক্ষরেও এই অদ্ভুত কাহিনীর আভাস প্রকাশ করা চলবে না; তাঁর অবশিষ্ট জীবন বিষময় হয়ে উঠবে। বীরেশকে আঘাত দেওয়া চলবে না, কারণ এই বিপথ-গামিনী রোগীর ভালোবাসা অসম্মানিত হ'তে পারে। তার নিজের মানসিক চেহারাও ব্যক্ত করা অসম্ভব; এখানে তার আত্মসম্মান বহু প্রকারে লিপ্ত। আর কিছু না হোক, তার আচরণে অথবা ভঙ্গীতে অনুশীলা বিন্দুমাত্র বেদনা বোধ করতে পারে, এমন কাজ সে করবে না।

কিন্তু রাত্রি অন্ধকার নয়। বাইরে এসে মাঠের মাঝখানে নলিনী এগিয়ে এলো। বোধ করি পূর্ণিমার ঠিক পরেরই কোনো একটা তিথি। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের সীমানার পারে সমগ্র পল্লীপ্রান্তর জ্যোৎস্নার

পুলকিত। শীতের আড়ষ্ট জড়তার উপর দিয়ে শূন্যলোকে আসন্ন বসন্তের একটা মুখচোরা সংবাদ যেন আনাগোনা করছে। বাইরের হাল্কা বাতাসে তার জটিল চিন্তার উপরে যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিল। এক এক পা ক'রে সে এগিয়ে চললো……

সে অশ্রুশীলা নয়। বীরেশকে দেখলে তার মনে বিষক্রিয়া সুরু হয় না, না দেখলে জগত সংসার শূন্যতায় ভরে ওঠে না। কলেজী জীবন যাপন করলেও নিতান্তই সে বাঙালীর ঘরের মেয়ে, অতিশয় প্রাণের উত্তাপ নিয়ে সে ঘর করে না। বিবাহ সে করেনি, কিন্তু ব্যর্থও হয়নি; দাবী হয়ত তার ছিল, কিন্তু কলরব তুলে সে দাবী প্রতিষ্ঠা করতে ছোটেনি। বীরেশ যেদিন বিবাহ করলো, সে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলো, যেদিন দরকার হোলো, নিঃশব্দে দূরে স'রে গেল। অভিমান কিছু সে রাখেনি, বিরোধ বাধায়নি, দূরে চ'লে যাওয়াই ছিল তার প্রয়োজন। তার স্বভাবের মস্ত বড় দিক, তার প্রসাদগুণ, সে শান্তিবাদিনী। সেদিন পারিবারিক ঝাপটার ভিতর থেকে বেরিয়ে বীরেশের হাত ধ'রে চ'লে গেলে নাটকটা জমতো বটে, কিন্তু আত্ম-পরতার অপবাদে তার মাথা হেঁট হোতো। বিদেশ থেকে চিঠিপত্র চালাচালির মারফতে বীরেশের মন নিয়ে টানাটানি সে করেনি, বৃহৎ মুক্তির মধ্যে নিজেকে সে ডুবিয়ে বসেছিল; তার শুভবুদ্ধি কোনো সুযোগ-সুবিধাকেই প্রশ্রয় দেয়নি।…আজ অশ্রুশীলার মধ্যে নিজের সর্বনাশের চেহারা দেখেও সে একবিন্দু টলেনি, অথচ প্রায় গত দুমাস ধ'রে অশ্রুশীলার বাঁকাবক্রোক্তি শুনে শুনে প্রবল বিদ্রোহ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। আতিশয্যের বন্যা-বিক্ষোভ থেকে প্রশান্ত চিত্তবৃত্তিকে বাঁচিয়ে চলার নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষা সে পার হয়ে এলো এই সান্ত্বনায় যে, নিচেকার সমুদ্র উত্তাড়িত তরঙ্গভঙ্গে যতই আন্দোলিত হোক,

উপরের ধ্রুবতারা চিরদিনই অচপল, দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে চিরদিনই সে পথনির্দেশ করে।

দশ বছর পরে আজ বীরেশের সঙ্গে দেখা···নলিনীর দুই কান ভ'রে এই কথাটি গুঞ্জন করতে লাগলো। পুরাতন এক একটি মধুর স্মৃতির দিন সে জপের মালার মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উপভোগ করেছে। নগরের কত রহস্যময় পথে-পল্লীতে আজো দুজনের কত পদচিহ্ন প'ড়ে রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কত সন্ধ্যার অন্ধকার, কত মধ্যাহ্নের দীপ্ত আকাশ আদর্শবাদীর স্বপ্নে থরোথরো হয়েছিল।···নিভৃত সান্নিধ্যের রোমাঞ্চ কল্পনাই ছিল প্রধান, ওর পরে যে আবার দৈহিক মিলনের কথা ওঠে, একথা উভয়েরই জানা ছিল না। ওটা অনভিজাত মনোবৃত্তির কথা, ওটাকে নিয়ে নিচ জাতিরা কারবার করে, ভদ্রসমাজে দেহের স্থান নেই। রস-সাহিত্যে দেহের মিলনের কথা তারা অনেক পড়েছিল, কিন্তু সাহিত্যলোক থেকে বাস্তব জীবনের উদাহরণে তারা কোনোদিন উঠে আসেনি। শেষকালে জৈবশাস্ত্র আলোচনা করতে গিয়ে নলিনী যেদিন আসল কথাটা আবিষ্কার ক'রে বসলো, সেদিন একলা ঘরে ব'সে তার কী অশ্রুপাত! কিন্তু ওই পর্যন্ত, তারপর ঘটনাচক্রে দুর্ভাবনাটা গুলে মিলিয়ে গেল। মেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠকাল নাকি যৌবনযুগ, কিন্তু সেই চেতনায় তা'র আগুন লাগলো না কোনোদিন। জাগ্রত চক্ষেই দীর্ঘপথ সে পার হয়ে এলো। শরীর-বিজ্ঞান নিয়ে তার কখনো অশান্তি ঘটলো না।

কিন্তু এদেশে এলো কি জন্য? এখানে গোরুর গাড়ীর চাকার নিচে প্রাচীন পল্লীপথ সভ্যতার কৃপায় আর্তনাদ করে, এখানে নাগরিক জীবনের কোনো উপকরণ নেই। অনাড়ম্বর কেবল নয়, নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা। নগরের জীবন আলোড়িত, উৎক্ষিপ্ত, বিপর্যস্ত; বিপুল

প্রাণসমুদ্র ফেনায়িত ; দ্রুততায়, ব্যস্ততায়, চলাচলে, কোলাহলে সেখানে নিত্য অবিশ্রান্ত অশান্তি। কোন্ এক মন্ত্র-যাদুকর অলক্ষ্যে ব'সে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর ক্ষুধিত চিত্তবৃত্তির লোলুপ জিহ্বার কাছে অগণ্য আকর্ষণ সৃষ্টি ক'রে চলেছে। যেন কোন্ প্রকাণ্ড জুয়াড়ীর মেলায় চারিদিকে মুহুর্মুহু অসংখ্য ভাগ্যপরীক্ষার মাতামাতি। কিন্তু এখানে অন্য চেহারা। এখানকার প্রশান্ত দিগন্তভরা আকাশে উঠে এসে দাঁড়ায় করুণ সন্ধ্যা-তারকা; সারাদিনমান ঝরা পাতার ঝরো ঝরো মর্মর।...কোন্ একটি একাকী মানুষ কোন্ পথ ধ'রে কত দূর প্রান্তর পার হয়ে যায়...তার ব্যস্ততা কিছু নেই...রাখালিয়া গান ভেসে আসে মধ্যাহ্ন রৌদ্রের পথে,—যেন ওর মধ্যে কত অশ্রুর অশ্রুত ইতিহাস। ঘাটে বাঁধা থাকে নৌকা, মাঠে গোরু চরে, ছোলার চারায় ফুলের কোরক দেখা দেয় ধীরে ধীরে, ফসল-কাটা মাঠের পথ ধ'রে বোঝা মাথায় নিয়ে চলে পসারী,—এরা সব যেন কোন্ আবহমান কালের অব্যক্ত সঙ্গীতের সুরে ভরা, যেন ওরা সবাই দিনমানের পটে কোন্ অজ্ঞাত অর্থের তুলি বুলিয়ে চলেছে...কী যে মধুর বেদনার চিহ্ন জাগে রৌদ্রদীপ্ত আকাশে, কী যে আনন্দের যন্ত্রণা সুখের কান্না কেঁদে ওঠে মলিন জোৎস্নায়, সে নলিনী দেখেছে। একটি অনামা পাখী আকাশ মুখর ক'রে চ'লে যায় দূরে,—কী অর্থে সে কাঁদায় দিগন্ত, তাই কেবল একাগ্রমনে শুয়ে শুয়ে ভাবা, কেবল উড়ো চিন্তার এলোমেলো জাল বোনা, শুধু নিমেষ-নিহত চক্ষের কোণ বেয়ে অকারণ আতপ্ত অশ্রু বেয়ে পড়া।...মিথ্যা নয়,—সে এসেছিল প্রিয়-সান্নিধ্যে অতীত আনন্দের দিনগুলি আর একবার স্মরণ ক'রে যেতে ; হারানো আনন্দ-বেদনার সুর, হারানো স্বপ্ন, হারানো অতীত,—একবার ওদের যবনিকা তুলে ধ'রে দেখে নেওয়া বুক ভ'রে। কিন্তু সার্থক হ'তে পারলো না তার আশা, চিত্তক্ষোভ আর অশান্তির ঝড়ঝঞ্ঝার পাক খেয়ে সে ব্যর্থ হোলো,—তাকে আবার

নিঃশব্দেই ফিরে যেতে হবে।…কোথায় যাবে একথা তার জানা নেই, আবার কোন্ দেশের কোন্ নিভৃত কোণে গিয়ে সে অস্থায়ী বাসা বাঁধবে তাও অস্পষ্ট,—তবু যেতে তাকে হবে।…কাজ একটা কোথাও খুঁজে নেবে বিদেশে গিয়ে; বৈরাগিনীর জপের মালা আবার তুলে নেবে হাতে। বয়সের সীমান্ত সে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে, সূর্যের দৃষ্টি ভীষণ হ'তে তার আর দেরি নেই……

কে, দাদা নাকি, কোথায় চললেন ?

অদূরগামী ছায়ামূর্তি জ্যোৎস্নায় থম্‌কে দাঁড়ালো। বললে, আমি বীরেশ, তুমি এদিকে যে ?

ওঃ তুমি!—নলিনীর নিঃশ্বাসটা নামলো।—বললে, এমনি একটু বেড়াচ্ছিলুম। কোথায় চললে ?

বীরেশ বললে, চাকরটা ব্যাগ নিয়ে গেছে ঘাটে, আমি নবনগর চললুম। নৌকায় যাবো। তুমি এখানে ক'দিন আছো ?

নলিনী বললে, কালকেই যাবো মনে করেছি। প্রায়ই অহুর কাছে আসতুম। কিন্তু দাদারা ত যাবেন, আর আসবার দরকার হবে না।

বীরেশ বললে, নলিনী, জানতে পারলুম এঁদের সঙ্গে আর আমার দেখাসাক্ষাৎ না হওয়াই ভালো। অবশ্য এতে আমার দুঃখ করা উচিৎ নয়। তবে কি জানো, মিসেস্ সেনের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম, তাঁর সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আমি খুবই অশান্তিতে থাকবো। তুমি কি জীবন বাবুর ওখানে এখন থাকবে কিছুদিন ?

নলিনী বললে, পরের বাড়ী, বেশিদিন থাকা অসুবিধে।

এর পরে যাবে কোন্ দিকে ?

একটি মুহূর্ত নলিনী চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, তুমি এত ক'রে জানতে চাইছ কেন ? এতদিন ত জানতে চাওনি !

বীরেশ বললে, নালিশ অবশ্য তুমি করতে পারো, তবে তোমার সম্বন্ধে দুর্ভাবনা কোনোদিন আমার ছিল না। আজো নেই।

হাসিমুখে নলিনী বললে, নেই কেন শুনি?

জানতে কিছু চেয়ো না, নলিনী, কেবল বুঝে নাও। আজ খুবই আঘাত নিয়ে যাচ্ছি, অত্যন্ত অভাবনীয় ঘটনা সব ঘ'টে গেল।—বীরেশ বললে, আমার ইচ্ছে মিস্টার সেনরা চ'লে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে থাকো, রোগা মানুষের অনেকটা সাহায্য হবে।

কিন্তু এঁরা যখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থাকতে চান্, তখন ত' আমাদের উদ্বেগের কারণ নেই।

তোমার থাকারও দরকার কি ওঁরা মনে করবেন না?

নলিনী বললে, সেটা কাল সকালে বুঝতে পারবো।

বীরেশ কয়েক পা এগিয়ে বললে, ঘাট অবধি যাবে তুমি? ফেরবার পথে চাকরের সঙ্গে আসতে পারবে।

নলিনী হেসে বললে, একদিন বর্ষার জলে তুমি বিদায় নিয়েছিলে, আজ আবার নদীর জলে চ'লে যাচ্ছ। এ মন্দ নয়। বাকি রইল চোখের জল।

বীরেশ বললে, মনে পড়ে না আর সেকালের কথা। সহজে সব ভুলে যাই ব'লেই আজো নিজেকে সুস্থ রাখতে পারি।

মনে না পড়ায় কিন্তু বিপদ আছে।

কেন?

নলিনী আবার হাসলো। বললে, মনে না পড়লে তোমার সঙ্গে এভাবে দেখা হবার অধিকার খুঁজে পাইনে। পেছনের শক্তিটাই সামনের দিকে ঠেলে।

বীরেশ বললে, তুমি একদিন অতি দুঃসময়ে এক হাজার টাকা পাঠিয়েছিলে, মনে পড়ে?

পড়ে।

সে-টাকা শোধ করিনি, কারণ তার দাম অনেক। কিন্তু নবনগরে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছি তোমার নামে,...নাম পদ্মাসনা।

বিস্মিত হয়ে নলিনী বললে, আমার নামে!...

হ্যাঁ, তোমার নামে। কারণ, দ্বিতীয় নাম আর কিছু আমার নেই। —চলতে চলতে বীরেশ বললে, কারো কারো সঙ্গে স্নেহ ভালোবাসায় আমি জড়িত, তুমি বুঝতেই পেরেছ, কিন্তু তুমি সেখান থেকে অনেক দূরে। হ্যাঁ, বয়স হয়েছে, এখন হৃদয়াবেগ বড় বেমানান। কিন্তু মরুভূমি মরুভূমিই থেকে গেছে নলিনী, সৌভাগ্যসাগরের তরঙ্গ কোনো ফসলই সেখানে ফলায়নি, এই কথাটা জানিয়েই আজকের মতো তোমার কাছে বিদায় নিতে চাই।......

নলিনী চুপ ক'রে রইলো। বীরেশ বলতে লাগলো, দশ বছর ধ'রে প্রকাণ্ড অভিশাপ নিয়ে বেড়াচ্ছি অকারণে, জীবনের সবচেয়ে বড় দিকটাই যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

নলিনী বললে, কিন্তু অভিশাপ অকারণ ত নয়।

অকারণ বৈ কি! তোমরা যাকে আমার স্ত্রী ব'লে চালাতে চাও, আমি জানি তাকে বিয়েই করিনি। অথচ পারি আমি সব সামাজিক নীতি ভেঙে দিতে; নিজের চরিত্রকে আজো আমি চূর্ণ ক'রে দিতে পারি দুর্নীতি আর বিপ্লবের নেশায়......

ঘাটের কাছাকাছি তারা এসে পৌঁছলো। নলিনী বললে, আচ্ছা, একটি কথা তুমি বলবে আমায় স্পষ্ট ক'রে?

মুখ ফিরিয়ে বীরেশ বললে, অবশ্যই, বলো।

তুমি কি অন্নর ওপর কিছু অবিচার করেছ?

অবিচার! মিসেস্ সেনের ওপর? বিন্দুমাত্র না।

সলজ্জ কুণ্ঠার সঙ্গে আরো দু-একটা অধীর প্রশ্ন নলিনীর মুখের কাছে এসেও মিলিয়ে গেল। বীরেশ বললে, উনি আমার অতিশয় স্নেহের পাত্রী। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলুম না, শেষকালে বোধ হয় অনুশীলা ভুল ক'রেই থাকবে। হয়ত এই পর্যন্তই সীমারেখা, নলিনী। এরপর হয়ত মিস্টার সেনের ওপরেই কিছু অবিচার হ'তে পারতো! কিন্তু তা হ'তে দেবো না, নলিনী। কারণ, তাঁর কাছে আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা···আমি জানি, বোধ হয় এই প্রশ্নই তোমাকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে।···আমি জানি, কী উদ্বেগ নিয়ে তোমার দেবীপুরে আসা।

নলিনীর চোখে জল এলো। বললে' এরপর যেখানেই যাই, পা আমার টলবে না, বীরেশ। পাওনা কিছু নেই, দেনাও কিছু থাকা বে-আইনী। তবু মনের স্বস্তিতে যেন কিছুদিন থেকে ঘুণ ধ'রে গিয়েছিল।

বীরেশ সাগ্রহে বললে, তুমি যাবে নবনগরে আমার সঙ্গে?

না।

কেন? কেন যাবে না তুমি?

সেখানে আমার মন্দিরই থাক, আমার ঠাঁই নেই। যার শক্তিতে তুমি সৃষ্টি ক'রেছ নবনগর, যার জন্যে মাথায় তোমার মুকুট উঠেছে, সেই অভাগীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতাও কম নয়, বীরেশ।—বলতে বলতে ঝর ঝর ক'রে নলিনীর চোখের জলের ধারা নামলো।

আচ্ছা, থাক্ থাক্। এবার আমি যাই।···ব'লে বীরেশ দ্রুতপদে নৌকায় গিয়ে উঠলো। তারপর উচ্চকণ্ঠে হেঁকে বললে, ওরে যাদু, পিসিমাকে সাবধানে বাড়ী নিয়ে যা।

এগারো

নবনগরে বীরেশের বাড়ীটি নতুন পদ্ধতিতে তৈরী। নিচের দিকটা পাকা গাঁথুনী, কিন্তু উপরের অংশটা সম্পূর্ণ কাঠের আয়তন। এ বাড়ীর নক্সাটা বীরেশের নয়, ললিতের। ললিত অনেকদিন ছিল বিলাতে। সে-দেশের পল্লীগ্রামের মধ্যযুগীয় বাংলোর ছাঁচটা সে তুলে এনেছিল। দোতলার মেঝে, দেয়াল, আচ্ছাদন—সমস্তই কাঠের। এদিকটা পার্বত্য অঞ্চল ব'লে শীত কিছু বেশী,—কাঠের বাড়ীতে ঠাণ্ডা আটকানো নাকি অনেক সহজ। তাদের বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড দক্ষিণমুখী প্রাঙ্গণ। পাহাড়ী গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা আর চম্পায় সে-প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ। বাইরে থেকে অভ্যাগতরা এলে এ-বাড়ীর নিজস্ব নির্মাণ-কৌশল তাদের চোখে পড়বেই। থমকে দাঁড়িয়ে বলতে হবে, বাংলা দেশে এমন মৌলিক পদ্ধতির বাসভবন অভিনব। ললিত উপরতলার চৌহদ্দিঘেরা বারান্দায় পুষ্পলতার প্রচুর সমাবেশ ক'রে রেখেছে। বারান্দায় দাঁড়ালে উদার দৃষ্টি চ'লে যায় পার্বত্যপল্লী ছাড়িয়ে দূর শস্যপ্রান্তরে, সেখান থেকে পূর্বদক্ষিণ দিগন্তরেখায়—যেদিকে বালু-কিরণলেখাঙ্কিত শুচিস্রায় আঁকা-বাঁকা গতি রহস্যময় ইসাবার পথে মিলিয়ে গেছে। পশ্চিমে দেখা যায়, নবনগরের বিপুল ঐশ্বর্যের বৃক্ষাবলী; পৌরসভার প্রাসাদ, পূর্ত বিভাগ, সমবায় সমিতি, বিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক,—ইত্যাদি বহু প্রকার জন-প্রতিষ্ঠান। উত্তরে দূরে যন্ত্রশক্তির কারখানা, হাট-বাজার, আদালত, থানা, ওষধি-পরীক্ষাগার, শ্রমিক নরনারীর সারিবদ্ধ আবাস। পূর্বদিকে নদীর ধার অবধি ফুলের বাগানঘেরা

নিরিবিলি স্বপ্নময় ছোট ছোট রাঙামাটির পথ। চারিদিক থেকে সমস্ত পথগুলি নগরের নাভিকেন্দ্রে যেখানে মিলেছে, সেই সংযোগস্থলে বিশাল মন্দির 'পদ্মাসনা'। সেখানে প্রায়ই যাত্রাগান, কথা-কথকতা-কীর্তন ইত্যাদির আসর বসে। সন্ধ্যায় সময় নগরের মঙ্গল-আরতির ঘন্টা বাজে। নদীর ওপারে যখন প্রত্যূষে সূর্যোদয় হয়, তার প্রথম রক্তিম রশ্মি নিদ্রিত নবনগরের উপর দিয়ে এসে পদ্মাসনার শিরশ্চুম্বন করে। সেই দৃশ্য দেখার জন্য প্রতিদিন প্রভাতে বীরেশ গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়—এই নিয়ম সে পালন ক'রে আসছে অনেকদিন থেকে। একটি দিনও ব্যত্যয় হয়নি, উৎসাহ কমেনি।

মনোবিকার তার ঘটেছে অনেকবার, কিন্তু কখনো প্রশ্ন জাগেনি তার মনে। একথা সে ভাবেনি, এ সমস্তর অর্থ কি। আজ মধ্যাহ্নের দীপ্ত ধূসর আকাশ মনে মনে অসংখ্যবার সে পরিক্রমা ক'রে চলেছে, কেবল প্রশ্নের জবাবটি হাতড়ে ফিরেছে। হাতে তার সেই দলিল, এই দলিলটি কয়েকদিন সে পড়বার অবসর পায়নি। অহল্যালার নামে ছিল নবনগরের জমির ইজারা নেওয়া, আজ নিঃস্বার্থভাবে তাকে দান ক'রে হস্তান্তর ক'রে দেওয়া হয়েছে। সে এখন আর একমাত্র প্রতিনিধি নয়, সম্পূর্ণ মালিক। এমন ব্যবস্থাও করা আছে, ভবিষ্যতে এ নিয়ে কোনোদিন আইনের তর্কও উঠবে না। এই দানের মধ্যে ললিতের উল্লেখ কোথাও নেই, অর্থাৎ বীরেশের বেতনভোগী সহকর্মী ভিন্ন সে আর কিছুই নয়। সহোদর ভাইকে অহল্যালা সম্পূর্ণ দয়ার পাত্র হিসেবে বীরেশের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেছে। অথচ এটা শোভন নয়, সঙ্গতও নয়।... দলিলটা পড়তে পড়তে সে অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল স্থটিয়ার দিকে চেয়ে—ওরই জলধারা বেয়ে দক্ষিণ পথে গেলে কোনো একখানে দেবীপুরের ঘাট। সেই

অপরিচিত ঘাটে বীরেশ আর কোনদিন নামবে না।…যার হাতে ভাগ্য-লক্ষ্মীর অকৃপণ প্রসাদ সে পেলো, তার কাছে গিয়ে দেখা দেবার অধিকার সে হারালো,…অপরাধের জন্য নয়, অপরাধী হয়ে ওঠার সম্ভাবনায়। কেউ যদি এই মুহূর্তে এসে তাকে প্রশ্ন করে, অনুশীলার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? সে জবাব দেবে, ভালোবাসার। তার জবাবে অস্পষ্টতা কিছু নেই, অস্পষ্টতা আছে মানুষের সমাজ ব্যবস্থায়। সে জানে ভালোবাসার মূল সংজ্ঞা দ্বিধাবিভক্ত নয়, কেবল পাত্রভেদে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা। অনুশীলাকে সে ভালোবাসে; তার চঞ্চল চোখে, চপল মনে, উদ্দাম আচরণে, প্রবল প্রাণধারায়, প্রচণ্ড প্রবাহে,—সে একদা পেয়েছিল অপরিসীম অনুপ্রেরণা। কী প্রচণ্ড সংগ্রাম করলো আত্মপ্রকাশ করবার, কিন্তু তা'তে ব্যর্থ হোলো ব'লেই রুগ্ন হোলো। শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ বাইরের দিকে হোলো না, তাই ভিতরে ভিতরে সেই পিঞ্জরাবদ্ধ শক্তি নিজেকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লেগেছে। এই হোলো অনুশীলার প্রাণের বিচিত্র নিয়ম। সে যেন একটা সংহত বিদ্যুৎশক্তি, যদি তাকে কাজে লাগানো না যায় তবে নিজেকে দগ্ধ করতে, নষ্ট করতে তার কুণ্ঠা নেই। সে ভালোবেসেছে, কারণ ফুলের স্বভাব গন্ধ বিলোবার,—লোহার কৌটায় বন্ধ করে রাখলেও গন্ধ বিলিয়েই সে শুকিয়ে মরে। তাকে নিন্দা করো, দুর্নীতি বলো, অসামাজিক মনে করো,—কিন্তু ভালোবাসার একমাত্র পরিণাম যে দুর্নীতি নয়, একথা বিশ্বাস করবে না কেউ। অনুশীলা হ'তে পারতো বীর-প্রসবিনী জননী, হ'তে পারতো সুভদ্রার মতো ভগ্নী, হ'তে পারতো রণরঙ্গিণী বীরাঙ্গনা,—কিন্তু ভাগ্যের চক্রান্তে হোলো রুগ্ন, প্রকাণ্ড মৃত্যুর তপস্যায় ব'সে নিজের চারিদিকে বিধিনিষেধের আবরণ তাকে টেনে দিতে হোলো। আজ নলিনী উপস্থিত থাকলে বীরেশ সহজে বলতে পারতো, অনুশীলাকে সে ভালোবাসে।

অনিলের স্ত্রী মনে ক'রে নিঃসঙ্কোচেই সে ভালোবাসে। অনিল জানুক, নির্ভুলভাবে জানুক, তার স্ত্রীর মূল্য কত বড়—স্ত্রীকে সে সম্মান করুক, কারণ সেই নারীর করতলে বাইরের শ্রদ্ধা, বাইরের সম্মান, বাইরের ভালোবাসা এসে পৌঁছয়। অথচ এই মনোভাবের বিশ্লেষণ তার কাছে অস্পষ্ট নয়। অনুশীলাকে সে ভালোবাসে, এর চেয়ে বড় কথা, এর চেয়ে সত্য কথা আর কিছু নেই। ঈর্ষা দিয়ে একে অবমানিত করা সম্ভব নয়, সমাজনীতি দিয়ে একে বন্দী করা সহজ নয়, একে অস্বীকার করলে মানুষের সমগ্র প্রাণধর্মই কলঙ্কিত হবে। সমগ্র নগরে, সমস্ত মানুষের সমাজে ঘোষণা ক'রেও সে বলতে পারে, অনুশীলাকে সে ভালোবাসে। নদী সৃষ্টি করে জনপদ, রুক্ষ প্রান্তরকে করে শস্যশালী, পিপাসার্তের তৃষ্ণা সে নিবারণ করে,—সুতরাং নদীকে কে না ভালোবাসে?…কে না ভালোবাসে জীবনদায়িনী জগদ্ধাত্রী প্রকৃতিকে? কে না ভালোবাসবে অনুশীলাকে।…এই বীর্যবতী রমণী তার তরবারির ফলকের খোঁচায় জাগিয়ে তুলেছে বীরেশের আত্মশক্তি, আবিষ্কার করেছে শুদ্ধ প্রতিভা, মাতিয়ে তুলেছে তার কর্মোৎসাহ। মানুষের বন্যা চলেছে পৃথিবী ভ'রে, জন্মমৃত্যুর নিত্য আবর্তনে সৃষ্টি ও সংহারের খেলা চলেছে,—সেই বন্যার স্রোতের ভিতর থেকে একদা ওই অনুশীলাই তাকে ছিনে বা'র ক'রে কপালে জয়তিলক এঁকে দিয়ে বলেছিল, প্রতিভা। সে যে প্রতিভা, একথা শুনে বীরেশ সেদিন চমকে ওঠে, সে যে অমৃতের পুত্র এ কথায় সে অভিভূত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।…তার সেবা আর সৃষ্টির জন্য বিশ্বসংসার যেন অধীর আগ্রহে চারিদিকে প্রতীক্ষা করছে, ওই নারীর কাছে এই আশ্বাস পেয়ে বুকের ভিতরকার রক্তোচ্ছ্বাস অসহনীয় আবেগে সেদিন আত্মপ্রকাশ করতে চায়। কথাটার মূল্য ছিল আজন্ম তার কাছে, অনুশীলা সেই

ক্ষমতা হাতে এনে দিল। ঘুমন্ত পরাভূত পৌরুষকে রমণীর সহজাত মাদক-আরকে উত্তেজিত উন্মত্ত ক'রে ওই অনুশীলা একদিন মানুষের বৃহৎ কল্যাণের আশায় তাকে দুঃখে আর দুর্গমে ঠেলে দেয়। অনুশীলাকে ভালোবেসে সেদিন থেকে সে সার্থক হতে পেরেছিল।

নিচের বারান্দায় ললিতের গলার আওয়াজ শোনা যেতেই তার চমক ভাঙলো। অলস হ'য়ে সে ব'সে রয়েছে অনেকক্ষণ, আজকে কাজ-কর্মের দিকে তার বিশেষ মনোযোগ নেই। সামনে দলিলখানা খোলা প'ড়েছিল, সেখানা মুড়ে সে চোখের কাছ থেকে সরিয়ে রাখলো। ললিতের চোখে এখানা পড়া খুবই বেদনাদায়ক হ'তে পারে।

বীরেশের মহল আলাদা, এদিকে ললিত ভিন্ন বিশেষ আর কারো আসবার হুকুম নেই। দর্শনার্থীরা নিচে আপিসে এসে অপেক্ষা করে। এ মহল জনহীন, রূপকথার রাজপুরীর মতো। প্রতি ঘরে আসবাব আর সাজসজ্জা ঠাসাঠাসি, কিন্তু মানুষ কোথাও নেই। এই অপরিমেয় ঐশ্বর্যময় প্রেতপুরীর ভিতরে বীরেশ থাকে একা।

নিজের মহল পেরিয়ে এদিকে এসে বারান্দা পার হ'য়ে ললিত বীরেশের সামনের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে ব'সে একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এতক্ষণ পরে একটা চুরুট ধরিয়ে বীরেশ বললে, তিন চারদিন তুমি নেই, তাই ভাবছিলুম। কাল বুঝি আর আসা হ'য়ে উঠলো না?

ললিত বললে, অত গণ্ডগোল, অত লোকজন সামলানো, তারপর রোগীর তদ্বির, চারদিকের দেনা পাওনা মিটোনো,—এই সব সারতে গিয়ে কাল আসাই হোলো না। তারপর ভাবলুম, অনুশীলার এই অবস্থা, দ্বিতীয় আত্মীয় কেউ নেই,—আমার চ'লে আসাটা ভালো দেখায় না। ওদের জিনিসপত্র সবাই বেচে গেছে, ওরা চ'লে গেল আজ

সকালে। কিন্তু রোগী সঙ্গে নিয়ে সেন সাহেব কতদূর কি করবেন, বুঝতে পারলুম না।

তুমি সঙ্গে গেলে না কেন, ভাই?

মাথা হেঁট ক'রে ললিত বললে, না,—সে আর হোলো কৈ?

কেন?

মাথা তুলে সে বললে, কি জানেন দাদা, সে অনেক কথা, অনেক-কালের কাহিনী। তবে এইটুকু বলতে পারি, ভগ্নিপতি কখনোই আপনার হয় না।

বীরেশ বললে, কিন্তু ভগ্নি ত আপনার!

জানি, কিন্তু ভগ্নি আর বিবাহিত ভগ্নি—এ দুটি বস্তু আলাদা। এ নিয়ে অনেক বিবাদ হয়ে গেছে। এই দেখুন না, এত বড় বিপদ, কিন্তু কেউ এসে মাথা দিয়ে দাঁড়ালো না। কেন দাঁড়ালো না বলুন ত? সবই ওদের নিজেদের দোষ!···যাক্‌গে সে আলোচনা।

চুরুটে টান দিয়ে বীরেশ বললে, তাহলে এবার সত্যিই ওঁরা দেবীপুর ছেড়ে গেলেন, কেমন? বাড়ীটা কি খালিই প'ড়ে থাকবে?

আবার নতুন হাকিম কেউ আসবে নিশ্চয়ই।

তোমার ভগ্নির অবস্থা কেমন দেখলে হে?

ভালো না।—ব'লে ললিত একটু থামলো, তারপর বললে, পরশুদিন রাত আটটা নাগাৎ খুব রক্তবমি হোলো!

রক্তবমি!······

হ্যাঁ, অবস্থা ভালো না। মাঝখানে প্লুরিসি হয়েছিল, তার থেকেই জেনেলপ্‌ করে। তবে একটু আশার কথা এই, আপাতত একটা লাঙ্‌স ন্যাফেক্‌টেড্‌।

বীরেশ চুরুটে একটা টান দিল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে ব'সে রইলো। তারপর ললিতই এক সময় বললে, ভালো কথা—নলিনীদেবীর সেদিন যাওয়া হয়নি। আজ সকালে তিনি খানপুর গেলেন। আপনাকে বলতে বললেন, তিনি দু' একদিনের মধ্যেই কলকাতা রওনা হবেন। তারপর যাবেন উড়িষ্যার দিকে কি যেন একটা কাজের সন্ধানে। আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন।

বারান্দা পেরিয়ে একজন চাপরাশি একতাড়া ফাইল নিয়ে এসে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো। একটা ফাইল তুলে নিয়ে কলমটা খুলে ললিত তাড়াতাড়ি কয়েকটা সই ক'রে দিল। সেগুলো আবার গুছিয়ে নিয়ে যাবার সময় চাপরাশি বললে, নিচে ঘোষ সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান্।

আচ্ছা, তুই যা।

বীরেশ ধীরে ধীরে বললে, রক্তবমি হোলো,—কই, আগে ত' এসব অসুখের কথা জানা যায়নি, ললিত?

ললিত বললে, অনুশীলার স্বাস্থ্য চিরকালই ভালো। মা বলতেন, পাথরকুচি। ভয়ানক দুরন্ত আর অবাধ্য ছিল। মার খেলে কিম্বা প'ড়ে গিয়ে মাথা ফাটলেও কাঁদতো না। ছেলে আর মেয়ের দল ওকে ভয় করতো। একবার একটা ছানা বেড়ালকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ছুরি দিয়ে কুচি-কুচি ক'রে কেটেছিল,—চিরকালই ও ভারি নিষ্ঠুর। বাড়ীর কোনো মেয়ের সঙ্গে ওর মিল ছিল না, একেবারে আলাদা প্রকৃতি। এই দেখুন না, আমার কপালে আজো কাটার দাগ,—একটা সাঁড়াশির খোঁচা মেরেছিল।—হাঁ, অসুখ-বিসুখ ওর কোনোকালেই হয়নি, দাদা। এত ভালো স্বাস্থ্য ব'লেই হয়ত এত বড় রোগে পড়েছে।

চুরুটটা মুখে দিয়ে দূরে স্বচ্ছিত্রার সলিল প্রবাহের দিকে চেয়ে বীরেশ কেবল বললে, হুঁ,…কিন্তু রক্তবমি,…আশ্চর্য।

আপনি বসুন, আমি আসছি।—ব'লে এক সময় উঠে ললিত বারান্দা পার হ'য়ে নিচের দিকে চ'লে গেল।

মিনিট দশেক পরে আবার সে যখন ফিরে এলো, বীরেশ তখনও নিশ্চল পাথরের মতো স্তব্ধ হ'য়ে রয়েছে। হয়ত ললিতের পায়ের শব্দও তার কানে ওঠেনি। তাকে ডাকা উচিত কিনা ললিত একবার ভাবলো, কিন্তু কর্তব্যের দিকে তার একটা তাড়া ছিল। একটু ইতস্ততঃ ক'রে সে বললে, মিস্টার ঘোষ আবার এসেছেন, বাবা—

মুখ ফিরিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বীরেশ বললে, মিস্টার ঘোষ,—মানে, কে মিস্টার ঘোষ?

প্রকাশ ঘোষের কথা বলছি। ক'দিন থেকেই উনি হাঁটা-হাঁটি করছেন। বলছেন, অন্যায় করেছি, ক্ষমা চাইছি, আর এমন কাজ হবে না—কোম্পানীর সমস্ত ক্ষতিপূরণ করতে রাজি।

সহসা বীরেশের সমস্ত মুখখানা রুদ্ধ আক্রোশ আর ঘৃণায় দপ্‌দপ্‌ ক'রে উঠলো।

ললিত পুনরায় বললে, ভদ্রলোক খুবই অনুতপ্ত মনে হচ্ছে। বলছেন, আমাকে বরং মাস তিনেক সস্‌পেণ্ড্‌ করা হোক, কিন্তু চাকরীটা না চ'লে যায়। স্ত্রীপুত্র নিয়ে এ বাজারে—

অসম্ভব, ব'লে দাওগে ললিত।—বীরেশের কণ্ঠ বিদীর্ণ হয়ে উঠলো, জোচ্চোরের জায়গা নবনগরে নেই, এর ভিত্তি সাধুতার ওপর। আণ্ডারবেট্‌ দিয়ে বারজিন্‌টা উনি গিলছেন অনেকদিন থেকে। ধরা পড়বার আগে অনুতাপ হয়নি। ব'লে দাওগে, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। অসম্ভব, অসম্ভব। এক বিন্দু অন্যায় ঢুকলে বহু কল্যাণ নষ্ট হয়।…ওঁকে আজই চলে যেতে বলো এই নবনগর ছেড়ে।

কিন্তু—

হ্যাঁ, আজই। এই বেলাটুকুর মধ্যে।…ব'লে উঠে বীরেশ নিজের মহলে বিশ্রাম নিতে চ'লে গেল। কেমন যেন একটা নিষ্ফল অকারণ আক্রোশে আর উচ্চণ্ড অভিমান তার ভিতরে ভিতরে পুঞ্জীভূত হয়ে নিজেকেই আঘাত ক'রে ফিরতে লাগলো। বেদনা বোধ করা দূরে থাক্, ওর বিপরীত প্রকৃতিটাই যেন তরঙ্গের মতো আছাড় খেয়ে তার ভিতরে ফিরছিল।

দুর্বল হ'লে আজকে তার আর কিছুতেই চলবে না। যারা ন্যায়, ধর্ম, সুবিচার ও কল্যাণ সৃষ্টি করার কাজে নিযুক্ত, যারা বহু মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিয়েছে, তাদের পক্ষে নারীসুলভ দাক্ষিণ্য আর সস্তা হৃদয়াবেগ বেমানান। শক্তির অধিকারী সে, সম্পদের শাসনকর্তা, তার হুকুমে চলছে এই ঐশ্বর্যশালী নগর,—তার দয়া, তার কৃপা, তার বৈষ্ণবী মায়া, —এগুলো অশোভন। অনেকদিন নিজেকে সে কঠোরভাবে অনুভব করেনি, অনেকদিন সে জানাতে পারেনি, সে আছে,—নিষ্ঠুরভাবে প্রচণ্ডভাবে সে আছে; মাঝে মাঝে তার প্রবল অস্তিত্বটা দৃঢ় ও নির্মমভাবে না জানালে চারিদিকের লৌহ-শৃঙ্খল যেন আল্‌গা হয়ে যায়।

বিশ্রামের পরিবর্তে বীরেশ কঠিন পদক্ষেপে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো।

উত্তর দিকে নদীর তটের কাছাকাছি কয়েকশত বিঘা জমি আগাছায় জঙ্গলে পরিপূর্ণ হ'য়ে অনেকদিন থেকে পড়েছিল। বীরেশের লোভ ছিল অনেকদিন থেকে, তবে জমিদারের সঙ্গে বিরোধিতার ভয়ে কথাটা আঁচড় করতে না পেরে সে আর উচ্চবাচ্য করেনি। সম্প্রতি লাটের খাজনার দায়ে সেটা নিলামে ওঠায় সরকারী তরফ থেকেই ওর

কাছে সংবাদ আসে। উৎসাহ খুব বেশি না থাকলেও চক্ষুলজ্জার দায়ে সে গিয়ে নিতান্ত সামান্য টাকায় নিলাম ধরে। জমিটা ব্যাঙ্কের নামেই তাকে খরিদ করতে হোলো।

কাজ সেরে ফিরতেই সন্ধ্যা। ব্যাঙ্ক আর সমবায়ের কর্মচারীরা তার সঙ্গে ছিল। সমস্তদিন পরিশ্রম আর নিলামের হাঁকডাক গেছে। একটু নিরিবিলি নদীর ধারে না বেড়িয়ে তার বাসায় ফিরতে ইচ্ছে হোলো না। দারোয়ান আর চাপরাশিদের সঙ্গে সে কর্মচারীদের বিদায় দিয়ে বললে, আপনারা যান, আমি নদীর ধার দিয়ে ফিরবো।

তার মনোবিকলনের সংবাদ নাকি সম্প্রতি অনেকেই জানতো। অলক্ষ্যে কর্মচারীরা একবার চোখ মট্‌কে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু মুচ্‌কি হাসলো। একজন ঠোঁট ওল্‌টালো। পরে তাদেরই মধ্যে একজন বললে, যে আজ্ঞে, স্যার।

নমস্কার জানিয়ে তারা সদিনয়ে বিদায় নিয়ে গেল বটে কিন্তু কিছুদূর গিয়ে একজন আর একজনের কানে কানে বললে, যত বড়ই হও, ডুবে ডুবে জল খেতেই হবে।

একজন বললে, রাত আটটার পরে নৌকা চ'ড়ে যায়, আবার ভোর রাত্রে ফিরে আসে। ভয়ানক বর্ণচোরা। ছোটসাহেবের সামনে একদিন মদ খেয়ে ভীষণ মাৎলামি করছিল, জানেন বিপিনবাবু?

কে বললে?

নৌকার মাঝিটা নাকি বলেছিল প্রকাশ ঘোষকে।

প্রকাশ ঘোষটার চাকরী গেল বটে, কিন্তু সে ছাড়বার ছেলে নয়। এরই মধ্যে নানা খবর রটাচ্ছে। লোকটা বেশ জানে, এদেশে চরিত্রের বদ্‌নাম রটালে, বড় বড় সমাজ হিতৈষীই হও, আর মাথা তোলার সাধ্য

থাকবে না। দুর্নীতির দাগ নিয়ে এদেশে পারা পাওয়া বড় কঠিন, বাবা। তুমি ত বীরেশ চৌধুরী, কালকের ছেলে; অত বড় ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী অমল মিত্তির,—তাকেও দেশের লোক বরদাস্ত করলো না। যাই বলো, আমরা অনেকদিন পর্যন্ত লোকটাকে চরিত্রবান ব'লে মনে করতুম, নয়?

তাদের আলাপ কানে শোনবার উপায় বীরেশের ছিল না। নব-নগরে তার সম্পর্কে কোনো সমালোচনা হয়, অথবা তার কোনো নিন্দা রটে, একথা সে জানতো না। সারাদিন পরে একটু ছাড়া পেয়ে ধীরে ধীরে সে চললো নদীর দিকে। বসন্তকালের সমাগম হয়েছে পুষ্পলোকে। অদূরে কৃষ্ণচূড়ায় কচি কচি ফুলের আভাস দেখা যাচ্ছে। বাতাসে শৈত্য অপেক্ষা মধুরতার আমেজ পাওয়া যায়। দূরে পশ্চিম দিগন্তে দিনান্তের রাঙা দাগ মিলিয়ে আসছে, সন্ধ্যা-তারাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সুচিন্নার জলে অল্প অল্প অন্ধকারের ছায়া পড়েছে।

গত কয়েকদিন তার খুবই মনোবিকার আর মানসিক অবসাদ গেছে। বয়স তার হোলো বৈ কি! দেখতে দেখতে চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশে এসে সে দাঁড়ালো। এখন একটু নিরিবিলি বিশ্রাম, একটু নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্য, একটুখানি আনন্দের আয়োজন,—এ তার ভালো লাগে বৈ কি। কিছুকাল থেকেই নতুন কিছু সৃষ্টির উদ্যম তার কমেছে, সুচিন্নার মতো তারও প্রবাহ যেন শীর্ণ হয়ে এসেছে, কেমন একটি মধুর ক্লান্তির ছায়া নামছে ধীরে ধীরে তার মনে। দীর্ঘকাল পরে মাত্র সেদিন নলিনীর সঙ্গে তার দেখা। নলিনীর ললাটে, চোখের কোলে আর মুখের চেহারায় সে দেখে এসেছে যৌবনপ্রান্ত-রেখা। কিন্তু কী দীপ্তি তার চোখে, কী অপরূপ ব্যঞ্জনা তার প্রশান্ত

আচরণে, কী নিবিড় ভক্তিতায় কী করুণ মমতায় তার দৃষ্টি ভরা। নলিনী আসতে চাইলো না তার সঙ্গে নবনগরে, এখানে তার স্থান নেই। এখানকার ঐশ্বর্য সম্পদ-সৃষ্টি বহ্নিলীলায় অনুগ্রহে, নলিনী তার সহপাঠিনী বান্ধবীর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করতে চায় না। সংজাত কৃতজ্ঞতাবোধের জন্য নলিনী আবার সব ছেড়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল, হয়ত আর দেখাও হবে না কোনোদিন,—কিন্তু তবু আত্মীয়তা আর পুরাতন বন্ধুত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে সে চাইলো না। এ নলিনীর অন্যায়, সে কিছু দৃঢ় হ'লে বীরেশ অনেক আগেই বেঁচে যেতো, বহু বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেতো। বীরেশ জানে, তার জীবনের সকল প্রকার উত্থান পতনের মূলে রয়েছে নলিনীর আত্মগোপনশীল আচরণ। আজ বসন্ত-সন্ধ্যায় দক্ষিণ সমীরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বহুদূর তটপ্রান্ত-বাহিনী স্বচ্ছিত্তার দিকে চেয়ে নলিনীর প্রতি বড় অভিমান তার বুকের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে উঠলো। এতকাল পরে আবার এত নিরাশার মধ্যে তাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে যাওয়া নলিনীর উচিৎ হয়নি। সমাজ-ব্যবস্থার পায়ের তলায় আত্মবলি দিতে হবে আর কতদিন? অসার্থক ভালোবাসা আর কতদিন কেঁদে কেঁদে বেড়াবে পথে পথে? মানবতার সর্বোত্তম প্রসাদগুণ কি এমনি ক'রেই উদ্‌ভ্রান্ত চক্রবাকের মতো অন্তহীন বেদনায় চিরদিন খুঁজে বেড়াবে ঘুরে ঘুরে?

সারাটা দিন কাজকর্মের মধ্যেও আজ তার প্রায় একাই থাকতে হয়েছে। ভাগ্যক্রমে কর্মজীবনে সে কোনো মায়া মমতার স্পর্শ পায়নি; সেই কারণে তার ক্লান্তিহীন অধ্যবসায় কেবল কাজের স্তূপই বিরাটাকার ক'রে গ'ড়ে তুলেছে। আজ সমস্ত দিন তার সঙ্গে ললিতের একপ্রকার দেখাই হয়নি। প্রকাশ ঘোষকে তার চাকরীতে পুনর্বহাল না করার জন্য ললিতের কিছু আঘাত লেগেছে সন্দেহ নেই, কারণ ললিত

প্রকাশের যোগ্যতাকে স্বীকার করতো। কিন্তু আজ সারাদিন ললিতের সঙ্গে দেখা না হওয়ার অন্য কারণ ছিল। আনন্দময়ী নামক যে মহিলার আলোচনায় আর স্তুতিবাদে সে মুখর, আজ সেই মহিলার নাকি নবনগরে পদার্পণ করার কথা। এখান থেকে রেল স্টেশন প্রায় সাত মাইল পথ; কিন্তু সাত মাইলের ভিতর প্রায় দশটি সম্মান-তোরণ নির্মাণ ক'রে আনন্দময়ীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আনার কথা। তিনি একা নন্, সঙ্গে প্রায় পঁচিশ ত্রিশটি মেয়ে তাঁর সহকর্মী, —এ ছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণ লটবহর। নবনগর থেকে পাঁচ ছ'খানি মোটর, গোরুর গাড়ী, একদল কুলী, পাল্কি, অভ্যর্থনা সমিতির একদল স্ত্রী-পুরুষ,—এমন কি মন্দিরের পুরোহিত মহাশয় অবধি ললিতের সঙ্গে গেছেন। আনন্দময়ীর সঙ্গে আসবেন তাঁর সেক্রেটারী, তাঁর চাকর-বাকরের দল, তাঁর দপ্তর, তাঁর অন্যান্য সাজ সাজ। আগামী কোনো একটা তারিখে এই নগরের পৌরসভার পক্ষ থেকে তাঁকে একটি মানপত্র দেওয়া হবে। তিনি নবযুগের সর্বপ্রধানা মহিলানেত্রী —কাগজে-পত্রে বীরেশ তাঁর সম্বন্ধে কয়েকবার স্তুতিবাদ লক্ষ্য করেছে। ললিত সোৎসাহে তাকে জানিয়ে রেখেছে, এখানকার প্রাথমিক শিক্ষা আর মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য যে সমিতি গঠন করা হ'বে তার সুনিয়ন্ত্রিত কার্যপদ্ধতির পরিকল্পনা রচনা ক'রে দেবেন আনন্দময়ী। এর আগে বাঙলার বহু গ্রামে গিয়ে তিনি মেয়েদের নানাপ্রকার অর্থকরী প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছেন। সুতরাং তাঁর কাজের প্রতি প্রথম সম্মান স্বরূপ ললিত তাঁকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেবার জন্য ইতিমধ্যেই বেশ মোটামুটি চাঁদা তুলে রেখেছে। অর্থাৎ চাঁদার মোটা অংশটা নিজের বেতন থেকেই গোপনে দিয়ে রেখেছে। আসবার সময় হাটতলার কাছে বীরেশ নিজের চোখেই দেখে এলো, বড় একটা

আটচালা বাঁধার কাজ চলেছে ; সেখানে একটা প্রদর্শনী বসাচ্ছে ললিত, এবং তার উদ্বোধন করবেন শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী। নবনগরের ময়দানের প্রান্তে এক বক্তৃতামঞ্চ তৈরী হয়েছে, সেখানে ভদ্রমহিলা নাকি বক্তৃতা করবেন। সহজেই বুঝতে পারা যায়, তাঁর নামে এ অঞ্চলে একটা সাড়া জেগেছে। কিন্তু ললিতের এই প্রকার উৎসাহ ও কর্মতৎপরতার মূলে কি বস্তুটি যে লুক্কায়িত সেটি জানতে বীরেশের বাকি নেই। সে গোপন করেনি, এটা আনন্দের কথা। ললিত বিলাত ফেরত, কিন্তু চরিত্রবান। মেয়েদের প্রতি সম্ভ্রমের মূল্য সে জানে। আনন্দময়ীর সহিত সে একটি উচ্চস্তরের প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ, এটা গৌরবের কথা, লজ্জার কথা নয়। একটি নারীর স্নেহ ও চরিত্রমাধুর্য তার সকল কাজ, সকল চিন্তা, সমস্ত উদ্দীপনাকে সুনিয়ন্ত্রিত করে, এটা পুরুষের পক্ষে দুর্লভ। উভয়ের ভালোবাসা এমন কোনো স্তরে আজো নামেনি, যেখানে ব্যক্তিগত ভালো মন্দ ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। ললিত তাঁকে ভয় করে, সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে, তপস্যা করে। চিঠিতে উপদেশ পায়, সেই অনুযায়ী নিজেকে চালায়।···বীরেশ কথা দিয়েছে, উভয়ের বিবাহের ঘটকালী সে করবে। না করবার হেতু নেই ; একজন অপরের অযোগ্য নয়। এই বিবাহ সম্ভব ক'রে তোলা হবে তার পক্ষে মস্ত বড় কীর্তি। বীরেশ তার জীবনে বড় কাজ অনেক করেছে, কিন্তু মধুর কাজ তার তালিকায় একটিও নেই। হয়ত এর জন্যে এখানে ললিতের নিন্দা রটতে পারে, হয়ত সংবাদপত্রগুলোয় মহিলানেত্রী আনন্দময়ীর প্রণয় ও পরিণয় নিয়ে ঠাট্টা তামাসা হ'তে পারে। কিন্তু দুটি একাগ্র প্রাণ যদি বিবাহের দ্বারা সার্থক হয়ে দেশের বৃহৎ প্রয়োজনে নামে, তবে কেবল তারা দুজনেই নয়,—বীরেশের পক্ষেও সে পরম সান্ত্বনা।

চলতে চলতে হঠাৎ একবার দাঁড়িয়ে সে আবার বাসার পথ ধরলো।

উৎসাহিত বোধ করছে অনেকদিন পরে। সে নিজের ভাঙাগড়া আর ভাগ্য বিপর্যয় নিয়েই ব্যস্ত, অন্যের দিকে তাকাবার রুচি তার এতদিন জাগেনি। পৃথিবী অনেক বড়, তাকে বাদ দিয়েও এই বিশ্বভুবন অতি বৃহৎ। দিকে দিকে লোকযাত্রা চলেছে অবিশ্রান্ত; আশা ও নিরাশা, সুখ ও দুঃখের অনন্ত আবর্ত রচনা ক'রে চলেছে এই চলমান সংসার,—ব্যক্তির কথা এখানে কোথাও বড় নয়। নিজের জন্য ভাবলো সে বহুকাল, নিজের দিকে চেয়ে রইলো সে অনেক দিন, নিজের অসমাপ্ত একটা চিত্র রচনা করলো সে এই নবনগরে। কিন্তু এখন অন্যের জন্য ভাববার বয়স তার হয়েছে; অন্যের ভিতর দিয়ে নিজেকে একবার নতুন ক'রে দেখবার তার ইচ্ছা জেগেছে। আজ ললিতকে সে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করবে আনন্দময়ীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। এটা শুধু বিবাহের ঘটকালী নয়, এটাও তার একটা বিপুল রচনা, একটা বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ,—এ বিবাহে তারও সার্থকতা অসামান্য। তার এই অসমাপ্ত কীর্তিস্তম্ভের মধ্যে কোথাও এতদিন ছন্দ ছিল না, এই দুই নরনারীর মিলনে তার সকল কীর্তি সুষমায় ভ'রে উঠবে,—ঐক্যে আর সঙ্গতিতে পূর্ণতা লাভ করবে।

পথ নিরিবিলি জনবিরল। এ পাড়ায় কয়েকজন মহাজন এসে কয়েকটা ধান আর পাটের গদি নির্মাণ করেছে। সন্ধ্যার পরে আর তাদের সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। সহসা ওদেরই একটা আড়তদারের ঘর থেকে একটা তুমুল তর্কের আওয়াজ শুনে বীরেশের যেন চমক ভাঙলো। তার নিজের নামটা যে এই আড়তদারের ঘরে এমন একটা ঝড় তুলতে পারে, এ সংবাদ আগে তার জানা ছিল না। পথের এক পাশে সে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়ালো।

কথাবার্তায় জানা গেল, গ্রামবাসী, ব্যবসায়ী, মাঝি-মাল্লা আর শ্রমিক

সর্দারদের এটা একটা প্রধান আড্ডা। আরো ছুচারজন, যাদের তর্ক-বিতর্কে জানা যায় তারা স্থানীয় কারখানার ফোরম্যান্ অথবা সমবায় সমিতির মাঝারি কর্মী। মাঝে মাঝে বীরেশের নামটা অর্থাৎ বড় সাহেবের কথা নিয়ে তাদের ভিতরে একটা তুমুল বাক্‌যুদ্ধ চলছে। অনেকটা কৌতুকের বিষয় বৈ কি! কিন্তু শুনতে শুনতে সহসা প্রকাশ ঘোষের নাম ও তার গলার আওয়াজ পেয়ে বীরেশ উৎকর্ণ হয়ে উঠলো।

আলাপটা অভিনব। একজন খেয়ালী লোকের হুকুমে এখানকার চারিদিকে নাকি অত্যাচার চলেছে। সেই লোকটির যে এজেন্ট অর্থাৎ ললিত,—সে এই অত্যাচার ও অনাচারের একজন দোসর। এই প্রকাণ্ড শহর আর কলকারখানা, ব্যাঙ্ক আর সমিতি, পৌরসভা আর হাসপাতাল—ইত্যাদি সমস্তই পরের টাকায় আর পরের পরিশ্রমে তৈরী। যারা সত্যকার কর্মী, তারা এখানে বঞ্চিত আর প্রতারিত। স্বয়ং বড়সাহেব একজন মাতাল আর চরিত্রহীন,—দেবীপুরের হাকিমের স্ত্রীর সঙ্গে তার ব্যভিচারের কাহিনী কারো অজানা নেই। সেই অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের টাকায় বড়সাহেব এখানে এসে বড়মানুষী ফলিয়েছেন; এখানকার জংলী জমিদারকে খুন ক'রে দেবীপুরের হাকিমের অনুগ্রহে অব্যাহতি লাভ করেছেন। ছোটসাহেব অর্থাৎ ললিতকে তিনি টাকা খাইয়ে বশীভূত ক'রে রেখেছেন,—স্ত্রীর ব্যভিচারের ব্যাপারে সে যা'তে বিদ্রোহ না করে। এ অঞ্চলের পাহাড়ী গ্রাম থেকে বহু জংলী বাসিন্দাদের ঘর জ্বালিয়ে বড় সাহেব উৎখাত করেছেন। এর কারণ সবাই জানে। গ্রামের মেয়েদের ধ'রে এনে ছোটসাহেব আর বড়সাহেব তাদের সম্ভ্রম হানি করতে চান্, কিন্তু পুরুষরা বাধা দিত ব'লেই তাদের ঘরদো'র জ্বালিয়ে অত্যাচার করা হয়েছে।

সেই তর্ক-বিতর্কের মধ্যে প্রকাশ ঘোষের কণ্ঠস্বর বীরেশের কানে এলো।

তিনি বলছেন, ব্যাঙ্ক আর সমবায়ের টাকার হিসাব বীরেশ চৌধুরী পেশ করে না,—দেশের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে আর কতদিন? জঙ্গল বিক্রির টাকা তিনি নিজের নামে কলকাতার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখেছেন, এর প্রমাণ আছে। মহাজনদের কাছে অতিরিক্ত কর আদায় ক'রে তিনি দেশের কাজ-কারবার নষ্ট করতে চান্। এ ছাড়া মজুরদের রোজ কমানো, কন্ট্রাক্টারদের টাকা ফাঁকি দেওয়া, দেশী শিল্পের গলা টিপে মাড়োয়ারীদের কাছে ঘুষ খেয়ে তাদের বাণিজ্য বজায় ক'রে তোলা—এসব খবর কে না রাখে? নবনগরের জনসাধারণ ভিতরে ভিতরে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে,—একদিন সামান্য সংঘর্ষে আগুন জ'লে উঠতে পারে। সরকারী লোক আর পুলিশ বিভাগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে দেশের লোককে এইভাবে বঞ্চিত আর প্রতারিত করা কতদিন চলবে?……

তোমরা সবাই শুনেছ বে, আজ কে এসেছেন এই শহরে? তাঁর নাম আনন্দময়ী,—মস্ত বড় নাম। আমরা জনাদশেক চুপি চুপি আজ দুপুরবেলায় গিয়েছিলুম তাঁর ওখানে দেখা করতে। ছোটসাহেব ত' কাছেই ঘেঁষতে দেয় না। বলে, ওঁর পরিশ্রম সহ্য হবে না, শরীর ভালো নয়। শেষকালে মহিলাটি আমাদের ডেকে পাঠালেন। কী চমৎকার চেহারা, বয়স তেমন বেশী নয়, কিন্তু সাক্ষাৎ দেবী অন্নপূর্ণা! আমরা প্রণাম ক'রে নবনগরের সকলের নালিশ জানিয়ে বললাম, মা, আপনি যদি এসেছেন এদেশে, তবে এই বড়সাহেবের অনাচার থেকে আমাদের উদ্ধার করুন। এখানে অরাজকতা, এখানে ধর্ম নেই, মনুষ্যত্ব নেই, এখানে ন্যায়বিচার নেই!…বুঝলে ভাইরা, এই সব তাঁকে বুঝিয়ে বললাম।

কি বললেন তিনি?

তিনি হাসলেন। হেসে বললেন, আপনারা এ সব সহ্য করেন কেন? বললাম, কি করব মা, আমরা নিরুপায়। অসন্তোষের কথা বড়সাহেব জানতে পারলে আমাদের গুম্‌ ক'রে দেবে। ভদ্দরলোকের পোষাকে ওরা সেই পুরনো ডাকাতের দল। ওরা না পারে, হেন পাপই নেই। তিনি বললেন, পাপকে আপনারাই ত' বাড়তে দেন, নৈলে তার সাধ্য কি? পুরুষমানুষ অন্যায় স'য়ে নালিশ জানায় না, তারা অন্যায়ের উচ্ছেদ করে। আমরা ব'লে এলুম, মা, কিছুকাল আপনি থাকুন এখানে। আমাদের শক্তি দিন, আমরা প্রতিশোধ নেবো। তিনি বললেন, সবাই মিলে রাখলে থাকবো বৈ কি। আমি ত' আপনাদেরই সেবা করতে এসেছি।—নবনগরে এতদিনে অসুরদলনী দুর্গার আবির্ভাব হোলো, বুঝলে? বলে রাখলাম, সহ্য আমরা করব না, যারা আমাদের সর্বনাশ করেছে তাদের সরাবো।...

সমস্ত ব্যাপারটায় কৌতুক যথেষ্টই ছিল। পরিহাসবোধের অভাব বীরেনের ঘটেনি। কিন্তু বিস্ময় তার কম নয়। কত অদ্ভুত আজগুবী অভিযোগ তার নামে চলছে, এ খবর সে রাখেনি। তার আড়ালে তার কাজের সমালোচনা হয়, তার নিন্দা রটে,—এ তার স্বপ্নেরও অগোচর। সে মদ্যাসক্ত, সে ব্যভিচারী,—এ সংবাদ অভিনব সন্দেহ নেই। মদ্যপান পাপ, ব্যভিচার সকল সময়েই ঘৃণ্য,—এ মত সে পোষণ করে না, কিন্তু তার নিজের আসক্তি নেই, এই যা। কোনো গ্রামে গিয়ে সে মেয়েদের সম্ভ্রম হানি করেনি, তার হুকুমে কারো ঘর জ্বলেনি, অকারণে সে কারো প্রতি অত্যাচার করেনি,—অথচ এই হাস্যকর জনরব রটল তার নামে!

বাসায় ফিরে একাকী অন্ধকার বারান্দায় ব'সে সে ভাবতে লাগলো, শক্তি আর ক্ষমতার সে ভক্ত, এই তার মস্ত বড় অপরাধ। সে ভিক্ষা

করেনি, কাজ করেছে, কাঁদেনি, দাবি জানিয়েছে; দুর্ভাগ্যের পায়ের তলায় দলিত হয়নি, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে,—সুতরাং সে অনাচারী। বাধাকে সে নির্মূল করেছে, মধুর শাঠ্য আর ইতর ভালোমানুষীকে সে নিজ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছে,—সুতরাং সে পাপী। প্রভুত্বের একটা প্রবল ক্ষমতাকে সে আয়ত্ত করেছে সন্দেহ নেই, অর্থ ও সম্পদের বিরাট এক স্তূপ সে সৃষ্টি করেছে, সবাই জানে, বহু মানুষকে শাসন ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সে কর্তৃত্বের বরলাভ করেছে,—নিজেও সে একথা অনুভব করে। কিন্তু তার নিজের জন্য কতটুকু?···পদপালের মতো জনসাধারণের জনতায় সে নিজেকে হারিয়ে তুচ্ছ হ'য়ে ক্ষুদ্র হ'য়ে জীবনযাত্রা পালন করতে পারেনি, সেইটিই ত তার গৌরব! কল্যাণকে সে জানে, মহৎ কর্মসৃষ্টির পদ্ধতিকে সে বহু পরিশ্রমে আবিষ্কার করেছে, মানুষের প্রতি অনুরাগের আদর্শকে সে সার্থক ক'রে তোলার চেষ্টা করেছে। সভ্যতার নব পত্তন, নতুন উপনিবেশ রচনা করতে এসে সে তার প্রাণ-শক্তি প্রকাশ করতে পেরেছে। আজ জনকয়েক অসন্তুষ্ট আর স্বার্থবাদীর নিন্দা রটনায় তাকে আসুরিক শক্তির আধার ব'লে মনে করতে হবে? জনসাধারণের জন্য সুলভ নিষ্ফল কান্না কাঁদলেই কি সে রাতারাতি গণদেবতা হয়ে উঠতে পারতো? অথচ এই নবনগরে কতটুকুই বা তার নিজস্ব!···বাইরের সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্য তার বাসার নিচে দারোয়ান চাকর থাকে, তাদের অফিসের সুসজ্জিত বিপুল আসবাবপত্র তাদের সম্মান আর আভিজাত্যের পরিচয় দেয়; তাদের যান-বাহন, লোক-লস্কর,—সমস্তটাই তাদের অসামান্য প্রতিষ্ঠার পরিচয়। কিন্তু অন্দরমহলে তার নিজস্ব কি কি রয়েছে? বিলাস-বৈভবে তার কোনো আসক্তি নেই; দুই চারিটা চুরুট ভিন্ন তার ঘরে অপব্যয়ের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না; একবেলা সে খায় একমুঠো ভাত; আমিষ খাওয়া সে এক প্রকার ত্যাগ

করেছে। পোষাক-আসাক ললিতের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। একটি টাকাও সে হাতে স্পর্শ করে না, একটি কানাকড়িও তার নামে কোথাও জমা নেই। সঙ্গে তার কোনো পরিবার নেই, বন্ধু স্বজন নেই, মায়াহারা থাবার লোক নেই। অনুশীলার দেওয়া লেপ-কম্বল, আর একটা বালিশ,—এ ছাড়া দীর্ঘ দশ বছরে তার আর কোনো বিছানা জোটেনি। ঘরে তার আল্‌মারি নেই, সিন্দুক নেই, গৃহসজ্জা নেই, দামি পোষাক পরিচ্ছদ নেই। সে কেবল হুকুম করে, নিয়ন্ত্রিত করে, শাসন-শৃঙ্খলায় সে কেবল এই নগরের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে ছন্দোবদ্ধ ক'রে রাখে,—এই তার প্রধান কাজ। সমগ্র নগরের নাভিকেন্দ্রে সে ব'সে থাকে একা। সবাই যখন নিদ্রিত, সে তখন অন্ধকার রাত্রে কালিপ্রহরীর মতো চোখ বুজে নিঃসঙ্গ ব'সে জপের মালা ঘুরিয়ে চলে। তার শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, কোনো ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কামনা নেই, সে কেবল প্রভু,—নির্দয় নির্মম নির্লিপ্ত নিয়ন্তা। ···নিদ্রাহীন নিশীথ রাত্রে সে নিঃসম্বল ব'সে ব'সে বহু মানুষের সৌভাগ্যের স্বপ্নজাল বোনে। সংসারে এই তার একমাত্র কাজ। এই তার আজীবনের তপস্যা। এই নগর থেকে সে তাড়িয়েছে বহুকালের কুনীতি, বহু কুসংস্কার আর অশিক্ষা, বহুযুগের তামসিক জড়তা আর আলস্য।···অপরাধ অবশ্য সে করেছে, কারণ দয়া সে কোথাও করেনি, কৃপা ক'রে কোথাও সে অযোগ্যতাকে প্রশ্রয় দেয়নি, অন্ধ ভালোবাসায় সে মূঢ় পশুপ্রকৃতি জনসাধারণকে গণদেবতা ব'লে লোকসমাজে তুলে ধরেনি। সে এনেছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়ু, তেজস্বিতা, স্বষ্টিশক্তি, আত্মবিশ্বাস। আগে এই অঞ্চলের নাম ছিল পাথরচাকী, চারিদিকে ছিল অরণ্য, ভূতের বাসা,—দুর্গম দুরারোহ গ্রাম—আরণ্যক কমীশার আর তস্করের উৎপাতে চারিদিকে ছিল সন্ত্রাস। ঝোপে-ঝাড়ে, বাঁশবনে, শালের জঙ্গলে,

জানোয়ার আর সাপের উৎপাতে—কেউ কোনোকালে এদিকে আসেনি। তার মস্তবড় অপরাধ, সে এনেছে বিজ্ঞান, এনেছে সভ্যতা, এনেছে কর্মী-মানুষের দল। যে সব চিত্তবিলাসীরা সুলভ অশ্রুপাত ক'রে দরিদ্র-নারায়ণের জন্য হা-হুতাশ করে, যারা কাজ করে না, কেবল কথার ব্যবসা করে, যারা গণতন্ত্রের চল্‌তি বুলিতে মোহগ্রস্ত হয়ে কেবল নিষ্ক্রিয় বক্তৃতায় দরিদ্রের মন ভোলায়, সাম্যবাদের চটকদার ব্যাখ্যায় যারা অশিক্ষিত জনসাধারণকে বিত্তশালীদের বিপক্ষে ঘৃণায়, ঈর্ষায়, লালসায়, আক্রোশে উন্মত্ত ক'রে তোলে, সৃষ্টিশক্তিহীন বিপ্লববাদের দিকে উত্তেজিত করে—এই নবনগর থেকে বীরেশ তাদের বিতাড়িত করেছে—এই তার বিরুদ্ধে মস্ত বড় অভিযোগ! কিন্তু কে না জানে, পৃথিবীর কোনো উন্নতি, কোনো সভ্যতা, কোনো মহান্ সৃষ্টি, কোনো মহৎ আন্দোলন—জনসাধারণের দ্বারা সম্ভব হয়নি,…একক ব্যক্তির প্রতিভা, এককের অধিনায়কত্ব, এককের বিরাট পরিকল্পনাতেই সমস্ত সম্ভব হয়েছে। কে না জানে, জনসাধারণ চিরদিনই মজুর আর মূঢ়, চিরদিনই নির্বোধ আর আত্মস্বাতন্ত্র্যহীন, আবহমান কাল থেকেই তারা এককের দ্বারা প্রতিপালিত হয়; প্রভুশক্তি তাদের ক্রীতদাসের মতো শাসন করে; সকল কালের রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই তারা কেবল জড়বস্তুর মতো কেনা-বেচার সামগ্রী। এই মূঢ়মতি জনসাধারণ একথা ভুলে গেছে যে, তাদের জন্যই একদিন তাকে কঠোর জীবন যাপন করতে হয়েছিল; তাদের জন্য উপবাস, তাদের জন্য উৎপীড়ন সহ্য করা, তাদেরই জন্য আশ্রয়হীন হয়ে বীরেশ পথে পথে ঘুরেছে।…রাজদ্বারে সে লাঞ্ছনা সয়েছিল, পরের আশ্রয়ে অর্থচিন্তা করেছিল, দারিদ্র্যে, দুর্দশায়, বেদনায় তাকে অতি ক্ষুদ্র হয়ে থাকতে হয়েছিল। সেদিনকার সেই নিরাশা আর অবমানিত জীবনের মধ্যে বসে জন-কল্যাণের মহামন্ত্র সে লাভ করেছে ওই ব্যভিচারিণী বহ্নীলার অপূর্ব

মহত্বের ছায়ায়। আজ কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলশীলা আনন্দময়ীর চটকদার স্বদেশীপনার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পশুর দল লালাসিক্ত রসনায় আস্ফালন করছে। সেই দুর্ভাগার পাল জানে না, অসতী অসুশীলার চর্বিত অন্নের অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট খেয়েই ওদের মুখে এই নৈতিক বুলি! জনসাধারণের শ্রদ্ধা আর অশ্রদ্ধার চোরাবালির ওপর সে তার ভাগ্যের প্রাসাদ নির্মাণ করেনি; সে জানে এই পশুর দলকে ভোলাতে ছুচার খণ্ড বাসি হাড়ের টুকরো ছড়িয়ে দিলেই যথেষ্ট।...

পায়চারি করতে করতে বীরেশ ভাবলো, যে-অধ্যবসায়ে সে সৃষ্টি করতে পেরেছিল এই নবনগর, সেই অধ্যবসায়ের বিপরীত শক্তিতে একে ধ্বংস করতে তার কুণ্ঠা নেই। এই নগরের কণ্ঠরোধ ক'রে দিতে পারে সে কাল প্রভাতেই! লোক কল্যাণের ভিত্তিমূলকে যারা ক্ষয় করবার জন্ম উঠে দাঁড়িয়েছে, তাদের দলকে নির্মূল করতে পারে সে তার একটি মাত্র হুকুমে। ক্ষমতার সে অধিকারী, শক্তির সে সংহত কেন্দ্র, প্রভুত্ব আর প্রতিপত্তির সে মূলাধার।... হত্যা আর মৃত্যুতে তার ভয় নেই, নগরব্যাপী শ্মশানচিতা রচনা করতে তার সঙ্কোচ নেই, আপন কঠিন রথচক্রের নিচে নিন্দাভাষীদের দলিত ও মথিত করতে তার বিন্দুমাত্র বেদনাবোধ নেই!...সৃষ্টি করতে সে জানে, সুতরাং ধ্বংস-বিপ্লবে সে নিঃশঙ্ক। কিন্তু তাই যদি হয় তবে এবার জনসাধারণের মৃত্যুর তীর্থক্ষেত্রে গণদেবতার নূতন মন্দির গ'ড়ে উঠুক!

বারো

দূরে মন্দিরের ঘন্টা বাজলো—ডিং ডং, ডিং ডং

বীরেশ চোখ খুলে তাকালো। জানালার বাইরে প্রভাতের আকাশে জ্যোতির্ময়ের সোনার অঙ্কন তার চোখে পড়লো। এত প্রত্যুষে কোনো-দিন মন্দিরের ঘন্টা বাজেনা। দূর থেকে দূরে সেই করুণ গম্ভীর ঘন্টাধ্বনি কেমন যেন বেদনার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি ক'রে চলেছে। খোলা জানলায় মুখ বাড়িয়ে সে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো।

শিশিরবিন্দুভরা স্বল্প কুয়াশাচ্ছন্ন বসন্তের প্রভাত। অদূরে পলাশের ডালে ডালে কয়েকটা শ্যামাপাখীর প্রভাতী কীর্তনের সভা বসেছে। একই পাখীর কণ্ঠে বিভিন্ন কাকলীতে এদিককার সমগ্র পল্লীটাই যেন মুখর। উপরে আকাশের ফিকা নীল রংয়ের সরোবরে হাঁসের দলের মতো ছোট ছোট মেঘ ভেসে চলেছে। বাতাস মৃদু, স্নিগ্ধ।

বহুদূর অবধি বীরেশ চেয়ে রইলো। কী অমৃতে ভরা এই প্রভাত। বাতায়নের ভিতর দিয়ে সমস্ত নবনগরের ছবিটি সে যেন আঁকতে লাগলো তার সমগ্র সত্তা দিয়ে। পদ্মাসনার চূড়া স্পর্শ করেছে সুচিত্রার ওপার থেকে প্রথম গৈরিক অরুণলেখন। তারই পাশ দিয়ে মাথায় বোঝা নিয়ে এরই মধ্যে চলেছে পসারির দল। টাউনহলের মাথার উপরে গোলাকার ঘড়িটা অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম দিকে সারিবদ্ধ বিলাতি টাইল ছাওয়া বাড়া বাংলো,—তাদের সীমানার বাগানে অজস্র মরশুমী ফুল ফুটে উঠেছে। পূর্ত বিভাগের সুদৃশ্য প্রাঙ্গণে কোয়ারা থেকে জলধারা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হাসপাতালের উপরতলাকার বৃহৎ কাচের সার্সির উপরে সূর্যরশ্মি ঝলমল করছিল। ওপারে যতদূর দৃষ্টি যায়, শস্যহীন প্রান্তর,

তারই পাশে পাশে আঁকাবাঁকা গ্রামের পথ চলে গেছে দৃশ্যলোকের সীমানা পেরিয়ে নিরুদ্দেশ রহস্যের দিকে। বীরেশ তার ব্যথিত ক্লিষ্ট প্রাণ সেইদিকে প্রসারিত ক'রে মনে মনে কেবল ভাবতে লাগলো, এই অনবদ্য অভিব্যক্তি, এ সকল তারই সৃষ্টি, তারই প্রাণের বিভিন্ন প্রকাশ। আজ সে নিন্দিত, কলঙ্কিত, অবমানিত,—কিন্তু এই নগরের বিচিত্র শোভা তারই রচনা, কেবলমাত্র তারই কল্পনা। হয়ত এই সংসারে তার ত্রুটি-বিচ্যুতির অন্ত নেই, কিন্তু তবু মানুষের বসতি সে রচনা করেছে একান্ত মমতায়; হয়ত এই দৃশ্যমান মহানগর তার আত্মতৃপ্তি আর আত্মবিলাসেরই একটা বাহ্যিক রূপ, কিন্তু জনসাধারণ তার এই শিল্প সৃষ্টিতে উপকৃত ও আনন্দিত।···অনুশীলা একদিন তাকে বলেছিল, তুমি বড় প্রতিভা, তোমার সেই মহৎ সম্ভাবনার উদ্দেশে এখান থেকেই প্রণাম জানাই! তুমি সাগরের মতো সুন্দর, তোমার বিক্ষুব্ধ বিরাটত্বের প্রতি প্রণাম জানাই।···আজ অনুশীলা বহুদূরে, অজানা কোন্ দেশে নিঃসঙ্গ রোগশয্যায় শুয়ে চেয়ে রয়েছে পথের দিকে,—সে একদিন প্রতিভার বিরাটত্বই কল্পনা করেছিল, কিন্তু বিকাশ দেখে যেতে পারলো না। তার শক্তি ছিল অনড়, উৎস ছিল রুদ্ধ,—কিন্তু সেদিনকার নিষ্ক্রিয়তাকে সচল করেছিল যে আত্মশক্তি, প্রতিভাকে অগ্নিময় ক'রে তুলেছিল যে অগ্নিরঙ্গিনী,—সেই অসামান্যা নারীকে আজ প্রতিভার অপেক্ষাও বড় বলতে তার কুণ্ঠা নেই। সে ছিল দাহ্য, অনুশীলা দাহিকা।

পায়ের শব্দ শুনে বীরেশ ফিরে তাকালো। এক পেয়ালা চা নিয়ে চাকর এসে ঘরে ঢুকলো। সে এসে রোজই বড়সাহেবের ঘুম ভাঙায়, আজ সে দেখলো অভিনব দৃশ্য।

বীরেশ জিজ্ঞাসা করলো, হ্যাঁ রে লোকনাথ, এত ভোরে আজ হঠাৎ রাস্তায় রাস্তায় গানের দল বেরিয়েছে কেন রে। ব্যাপার কি?

লোকনাথ একটু তটস্থ হয়ে বললে, আজ্ঞে ছোটসাহেব এই ব্যবস্থা করেছেন?

গানের ব্যবস্থা? কেন?

আনন্দময়ী মা এসেছেন, তাই ছোটসাহেব তাঁর জন্যে সবাইকে ব'লে আজ সকাল থেকে···

সকাল থেকে বুঝি তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল রাত থেকেই শহরের সব বাড়ীঘর সাজাবার ব্যবস্থা চলেছে। খুব নামজাদা মেয়েছেলে কিনা? আজ রাত থাকতে সব ঝাড়ুদাররা কাজে লেগেছে। গাঁ থেকে সব মেয়ে পুরুষরা আসছে, খুব বড় মেলা বসবে। মন্দিরে আজ হৈ চৈ কাণ্ড!

বীরেশ বললে, মন্দিরে আবার কি?

লোকনাথ বললে, আজ দুপুরবেলায় মন্দিরে আনন্দময়ী মা সকলের কাছে দর্শন দেবেন। মেয়েদের কাছে তিনি ভাগবতের কথা শোনাবেন।

বটে।···ধর্মশাস্ত্র নিয়েও বুঝি তিনি আলোচনা করেন? কেমন চেহারা রে?

একটুখানি হাত কচলে লোকনাথ বললে, তা আর বলবেন না, বাবু! সাক্ষাৎ প্রতিমা।

দেখেছিস তুই?

আজ্ঞে,···স্বপ্ন দেখেছি। একেবারে জাগ্রত দেবী!

বীরেশ তার মুখের দিকে তাকালো। বললে, ধন্য তোরা, এরই মধ্যে বুঝি দেবীর আসনে বসিয়েছিস?

হ্যাঁ বাবু, ছোটসাহেব বলেন···

ছোটসাহেব কি বলেন তা আমি জানি, তুই থাম্।

তার স্মিতমুখ দেখে লোকনাথ একটু আভাষা পেয়ে গেল। বললে,

বাবু,—বলবেন দয়া ক'রে? এত বে-মেয়ের নাম, এত টাকা,—সে-মেয়ে তিনবার জেল খাটলো কেন?

বীরেশ হেসে বললে, ওরে গাধা, স্বদেশী মেয়ে যে। দেশের কথা বলতে গেলেই সরকারের বিরুদ্ধে কথা এসে পড়ে। তাই জন্যেই জেল খাটতে হয়, বুঝলি?

চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে লোকনাথ বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই দ্রুতপদে ললিত এসে তার ঘরে ঢুকলো। লোকনাথের চোখে এতক্ষণ যা পড়েনি, তাই দেখে সহসা ললিত একটু অবাক হয়ে গেল। বললে, দাদা, আপনার ঘরে যে এখনো আলো জ্বলছে?

চায়ের পেয়ালায় সামান্য এক চুমুক দিয়ে বীরেশ সেটা রেখে দিয়ে চুপ ক'রে বিছানায় বসেছিল। বললে, হ্যাঁ,...ওটা আর কাল রাতে নেবানো হয়নি। ব'সো।

আলোটা নিবিয়ে ললিত একখানা চেয়ার টেনে ব'সে বললে, রাত্রের খাবারটাও আপনি খাননি দেখছি। কী মুখ চোখের চেহারা আপনার হয়েছে, দেখেছেন?

বীরেশ একটু হাসলো। বললে, এখানকার লোকদের মনের চেহারার চেয়েও খারাপ?

তার আপরথপ্রাপ্ত মুখের মলিন ক্লিষ্ট হাসি দেখে ললিত বিস্ময় বোধ করলো। বীরেশের কথার স্পষ্ট অর্থ বোঝা গেল না, কিন্তু তার ভিতরকার প্রচ্ছন্ন অভিযোগের করুণ সুরটা তার কানে বাজলো। ললিত একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, দুদিন আপনার কাছে আসবার সময় পাইনি, নিশ্চয় আপনি রাগ করেছেন।

না, ললিত। কিন্তু আমি ভাবছি, কিছুকালের জন্যে তোমরা

আমাকে ছুটি দাও। বিশ্রাম অনেকদিন নেওয়া হয়নি, এবার একটু,—তুমি ত আজকাল বেশ ভালোই কাজকর্ম চালাতে পারো হে।

ললিত বললে, হ্যাঁ তা পারি। কিছুকাল কেন, দীর্ঘকালও পারি। ছুটিও আপনাকে দেবো, তবে চোখের আড়ালে যেতে দেবোঁ না।—তারপরেই কি মনে ক'রে সে বললে, অঞ্জলীলা নিজের দোষে অসুখ বাধিয়েছে, সেই দুর্ভাবনায় আপনি যদি ভেঙে পড়েন, আমাদের চলবে কেন?

কথাটায় বীরেশ কেমন একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। কিন্তু নিজেকে দমন ক'রে সে বললে, তোমাদের চলবে, এই কথাই ত' নবনগরে শুনতে পাই। পথে ঘাটে সবাই ত' বলছে, আমাকে আর দরকার নেই। গুটিপোকার কাছে রেশম পাওয়া গেছে, সুতরাং ওটার আর দাম নেই।

ললিত অবাক হয়ে তা'র দিকে তাকালো। বীরেশের চোখের কোণে কালি, দাড়িগোঁফ কামায়নি দুদিন, চেহারাটা শুষ্ক, রোগা মুখে কেমন যেন বিক্ষোভ আর নিরাসক্তির ছায়া। তার বিছানার পাশে গোটাদশেক আধপোড়া বর্মা চুরুটের একটা পাত্র। এই ভস্মাবশেষ চুরুটগুলিতেই যেন দীর্ঘরাত্রির নিঃশব্দ মনোবিকারের কাহিনী ক'রে রয়েছে। ললিত বললে, একথা কা'রা বলছে দাদা?

বীরেশ একটু হাসলো। বললে, আমার চরিত্রের কলঙ্ক রটাচ্ছে যারা, তারাই।

আপনার চরিত্রের কলঙ্ক? ... কানে শুনেছেন আপনি?

কানেই শুনেছি ভাই। একজনের নয়, বহুজনের।

অসম্ভব।—ব'লে অস্থির হ'য়ে ললিত উঠে দাঁড়ালো। বললে, তাই যদি হয় তবে আপনি অনুমতি দিন, আমার ক্ষমতা আমি প্রয়োগ করি।

বিরুপশক্তির কণ্ঠরোধ করতে আমাকে একটুও বেগ পেতে হবে না। অন্যায় আর নিন্দা যেখানে বাসা বেঁধেছে, আমি সেই বাসা ভেঙে দেবো। আপনার কলঙ্ক!···আপনার নিন্দা!···এখন আমি বুঝতে পারছি কা'রা এর দলপতি। আপনি দেখুন, সাতদিনের মধ্যে চন্দন পাহাড় থেকে আরম্ভ করে সুচিত্রার তীর পর্যন্ত সমস্ত শহরকে আমি শায়েস্তা ক'রে দিচ্ছি।

বীরেশ বললে, বৃথাই তোমার উত্তেজনা, ললিত। নিন্দা আর কলঙ্কের গলা টিপতে পারবে, কিন্তু আমাকে যদি নগরের লোক না চায়, তুমি কি করতে পারো?

আমি?—ললিত উচ্চকণ্ঠে বললে, আমি নগরকে জনহীন ক'রে দেবো,—নতুন ক'রে আবার মানুষের দল আনবো। আপনাকে যারা না চায়, তারা এদেশ থেকে চ'লে যাক্, নবনগরে তাদের জায়গা নেই।

কিন্তু এদেশ ত আমার নয়, তাদেরই।

তাদের নয়, মিস্টার চৌধুরী। এ আমাদেরই দেশ। এর মাটির তলা থেকে সোনা তুলেছি, এর শ্রী আর স্বাস্থ্য ফিরিয়েছি, জঙ্গল কেটে নগর বসিয়েছি, এখানকার মন্দিরে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করেছি,—এ-মাটি আমাদের। এখানে আমাদেরই শাসন, আমাদেরই প্রভুত্ব—আমাদেরই ক্ষমতা এখানে চলবে চিরকাল। যারা অন্য কথা কইবে, যারা কেবল শাখা ফলের ওপর দাবি জানাবে, আর নিন্দা-কলঙ্ক রটিয়ে আমাদের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করতে চাইবে, তারা শত্রু। সেই শত্রুকে নির্মূল করতে আমি চললুম।—এই ব'লে দ্রুতপদে ললিত বেরিয়ে যাচ্ছিল, সহসা বাইরে কাদের দেখে সে আত্মসম্বরণ ক'রে আবার ভিতরে এসে দাঁড়ালো।

দুটি মহিলা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে অসঙ্কোচে ভিতরে এলেন।

তাঁদের পরিচ্ছন্ন মুখে সপ্রতিভ হাসি। নমস্কার জানিয়ে একজন বললেন, আপনার কাছেই এসেছি ললিতবাবু।

দুজনের মধ্যে একজন অবশ্যই আনন্দময়ী, এই মনে ক'রে বীরেশ একটু সচকিত হয়ে উঠলো কিন্তু সহসা ললিত বললে, দাদা, এঁদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। এর নাম সন্ধ্যামণি দেবী, আর ইনি সুচরিতা রায়। আনন্দময়ীর সঙ্গে যাঁরা এসেছেন, এঁরা তাঁদের মধ্যে দুজন কর্মী।

নমস্কার বিনিময় হ'য়ে গেল।

বীরেশ হাসিমুখে বললে, আদরযত্নের কোনো ত্রুটি হচ্ছে না ত' আপনাদের? আমি নিজে বিশেষ কিছু—

না না, একটুও না। কী চমৎকার শহর গড়েছেন আপনি। দুদিন ধ'রে ঘুরে ঘুরে আমরা দেখছি।

কই, আপনাদের নেত্রীকে দেখছিনে কেন?

এই যে, তিনি একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন।—ব'লে খামে বন্ধকরা একখানা পত্র সুচরিতা ললিতের হাতে দিলেন।

আচ্ছা, আমরা এখন যাই। ব'লে আর একবার নমস্কার জানিয়ে মহিলা দুটি সমস্ত ঘরে একটি শুচিস্মিত বাতাস তুলিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেলেন।

উত্তেজনায় তখনও ললিতের মুখে চোখে কিছু চাঞ্চল্য ছিল; ঘরে ঢোকবার আগে সন্ধ্যামণি আর সুচরিতার কানে তার কথাগুলো গেছে কিনা সহসা একথা আর সে ভেবে উঠতে পারলো না। একটা নিষ্ঠুর কর্তব্যের দিকে তার মন ছুটেছে,—এ নগরের অধিনায়ক আর অভিভাবকের অপমান কোনোমতে সে সইবে না। তার শাসন-শৃঙ্খলার মধ্যে

মানবতার অংশটাই ছিল প্রবল, কিন্তু এবার কঠোরতা প্রকাশ করার সময় এসেছে।

খামখানা ছিঁড়ে চিঠি খুলে সে পড়তে লাগলো। আনন্দময়ীর হাতের লেখায় অস্পষ্টতা কোথাও কিছু নেই; পরিচ্ছন্ন বক্তব্যটুকু ভিন্ন নিষ্প্রয়োজনীয় একটি শব্দও খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু চিঠিখানা পড়তে পড়তে তার মুখের চেহারা এমনি বিবর্ণ, এমনি নিরুৎসাহ হয়ে এলো যে, কিছুতেই সে আর আত্মগোপন করতে পারলো না। লেখানা হাতে নিয়ে সে পুনরায় চেয়ারের উপর ব'সে চাপা নিঃশ্বাস ফেললো। আহত মুখখানা তার কালো হয়ে এলো।

বীরেশ বললে, বললে যে? দুঃসংবাদ না কি?

ঢোক গিলে ললিত বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ সকালে আপনার এই ঘরে তাঁকে নেমন্তন্ন করেছিলুম, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। তিনি যে এভাবে জবাব দেবেন, আশা করিনি।

বীরেশ তা'র দুরবস্থা দেখে একটু যেন কৌতুকবোধ করলো। বললে, তাঁর বক্তব্যটা কি?

চিঠিটাই প'ড়ে আপনাকে শোনাই।—ব'লে ললিত আরম্ভ করলো—

'ললিতবাবু,

সকালে আমার যাওয়া হলো না। যাওয়া হবে কি না বলতে পারিনে। নবনগর সম্পর্কে যে সব নির্ভরযোগ্য তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি, সেগুলো নিয়ে আপনার বড়সাহেবের কাছে আলোচনা উঠবেই জানি, কিন্তু আমার মুখ থেকে অবজ্ঞাভাবী মন্তব্যগুলো তাঁর পক্ষে রুচিকর হবে না, এই আশঙ্কায় আলাপ করাটা স্থগিত রাখলুম। ইতি—

আনন্দময়ী'

বীরেশ বললে, বুঝতে কিছুই বাকী নেই বোধ হয় ? কি বলো, হে ?—এই ব'লে সে একটু হাসলো। কিন্তু সে-হাসি পলকের জন্য, তারপর গম্ভীর মুখে নিজেই সে মাথা নত করলো।

ললিত বললে, কিন্তু অবাক হচ্ছি দাদা, এমন কী কারণ ঘটতে পারে এই অল্প সময়টুকুতে ··· কই, কিছুই ত তিনি আমাকে বলেন নি। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিনে।

বীরেশ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলো। তারপর মুখ তুলে বললে, তুমি কি আমার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেছিলে ওঁর কাছে ?

বিন্দুমাত্র না। চিঠিপত্রেও কোনোদিন কোনো কারণে আপনার নামটি অবধি উল্লেখ করিনি। আমি এখানে চাকরি করি, এখানকার 'কলোনিতে' আমি বহু কাজের ভার নিয়েছি, এই তিনি শুধু জানতেন। নবনগরের সর্বপ্রধান কর্তা হলেন আমার বড়সাহেব, এই সংবাদ কাল সকালে মাত্র তাঁকে জানিয়েছি। তিনি আপনার নামও জানতেন না, আপনার কোনো খবরও রাখতেন না। জানি, শত্রুপক্ষ গিয়ে তাঁর কান ভারী করেছে,—কিন্তু আশ্চর্য, মানুষের নিন্দা রটনায় তিনি ত' কোনো-দিন কারো ওপর অবিচার করেন নি। এ তিনি কী করলেন ?—ললিতের কণ্ঠস্বরে করুণ অভিযোগ ফুটে উঠলো।

একটা ফাইল হাতে নিয়ে চাপরাশি এসে ঢুকে সেলাম জানালো। ফাইলটা হাতে নিয়ে ললিত উল্টে দেখলো, কন্ট্রাক্ট্ লেখবার খান-কয়েক আদালতের স্ট্যাম্পযুক্ত ডেমি কাগজ। ফাইলটা রেখে দিয়ে সে বললে, যাও।

চাপরাশি চ'লে গেল।

হাসিমুখে বীরেশ বললে, তোমার বান্ধবীটির সম্বন্ধে শ্রদ্ধা আমার কমলো না ললিত, বরং বেড়েই গেল। এমন নির্ভীক আত্মমর্যাদা সম্মানের

যোগ্য। কিন্তু মনে রেখো ললিত, তিনি এখানকার সম্মানীয় অতিথি, তাঁর প্রতি যেন তোমার আচরণের ত্রুটি একটুও না প্রকাশ পায়। বাস্তবিক মেয়েটি অসাধারণ বটে।

কিন্তু শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার রহস্যময় রীতিতে শ্রোতার মুখে যে স্বস্তির ছায়া একটি মুহূর্তে জেগে উঠেই আবার পলকের মধ্যে মিলিয়ে গেল, সেই অনির্বচনীয় দৃশ্যটুকু বীরেশের চোখে পড়লো না।

বীরেশ বললে, খ্যাতি আর অখ্যাতিতে মিলিয়ে আমার ব্যক্তিত্বের একটা মোহ যে আছে, এ আমি নিজেই জানি, ললিত। কিন্তু সেই মোহকে সহজে যিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, তাঁর প্রশংসাই আমি করি। এমন দৃঢ়তা আর স্বকীয়তা বাঙলা দেশের যে কোনো মেয়ের পক্ষেই দুর্লভ। তোমার বান্ধবীর নামের চটকে আমি ভুলিনি, তিনি নেত্রীই হোন্ আর দেশসেবিকাই হোন্,—আমার পক্ষে ঔৎসুক্য কম। তবে একথা বলতে পারি, তোমার মতো স্বভাবনম্র যুবকের সঙ্গে তাঁর মতো দৃঢ়চেতা মেয়ের মিলন ঘটলে তোমাদের জীবন খুবই সুন্দর হবে।

দীর্ঘকাল দুজনে নিঃশব্দে ব'সে রইলো। নগরের পথের মাঝে জনতার কলরোল এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে আনন্দময়ীর নামযুক্ত জয়ধ্বনি দুজনেরই কানে এসে বাজতে লাগলো। কিন্তু উভয়ের দিক থেকে কোনো ঔৎসুক্য, কোনো চাঞ্চল্যই দেখা গেল না। মাঝখানে চাকর এসে ঘরটা ঝেড়ে মুছে সমস্ত জানালাগুলো খুলে দিয়ে টেবলের উপর ফুলদানিতে ফুলের গোছা রেখে চ'লে গেল। এ সময়ে এমন নিষ্ক্রিয় ব'সে থাকার কথা নয়, অগণ্য কর্ত্তব্য ললিতকে চারিদিক থেকে আহ্বান করছে। নিচের তলায় লোক-জনের কোলাহল শোনা যাচ্ছে; আপিস বসেছে। বেলা দশটা বাজে।

চাপরাশির পিছনে পিছনে একটি ছোকরা উপরে উঠে এলো। ছোকরা ললিতের য়্যাসিস্ট্যান্ট্, নাম সমীর। তাকে দেখে ললিত ব'লে

উঠলো, ব'লে ত দিয়েছি তোমাদের, আজ হাফ্-হলিডে। আসছে কাল সম্পূর্ণই ছুটি।

সমীর বললে, সে-জন্যে নয়, স্যর—একটা খবর আপনাকে দিতে এলাম—আজকের পাবলিক মিটিংয়ের ব্যাপারে—

ভেতরে এসো।

চাপরাশি চ'লে গেল। ঘরের ভিতরে সমীর এসে দাঁড়ালো। বড়-সাহেবের ঘরে ঢোকার মতো বুকের পাটা অনেকেরই নেই; এটা দুর্লভ সুযোগ ব'লে অনেকে মনে করে। ছোকরাটি প্রথমে একটু থতিয়ে গেল।

মিটিংয়ের কি ব্যাপার শুনি?

সমীর একবার বড়সাহেবের দিকে তাকালো। বীরেশের চোখ দুটো দীর্ঘায়ত, নিষ্কম্প,—কপিশবর্ণের ঔজ্জ্বল্যকে সেই দৃষ্টি যেন অনেকটা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই কপিশচক্ষুর ভিতর দিয়ে প্রাণের যে লৌহকঠিন দৃঢ়তা প্রকাশ পায়, তার দিকে মুখ তুলে কথা বলায় যথেষ্ট দুঃসাহসের দরকার। সমীর চোখ ফিরিয়ে ললিতকেই বলতে লাগলো, আপনার আদেশ মতন আমরা ক'জন ভোর থেকেই টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু নবনগরের সর্বত্রই একটা অশান্তি দেখা যাচ্ছে। তারা বলছে, এ সভা কর্তৃপক্ষের নয়, জনসাধারণের। আনন্দময়ী এখানে এসেছেন বড়সাহেব কিম্বা ছোটসাহেবের অতিথি হ'য়ে নয়,—তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি। ·· ওরা সবাই গিয়ে আনন্দময়ীর বাসা ঘিরে রয়েছে।

ওরা কে?

প্রকাশ ঘোষের দল, তারিণী হালদারের দল, তারপর—

তারপর কি?—ললিত উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

সমীর থতমত খেয়ে বললে, মিউনিসিপ্যালিটির আপিস, হাসপাতাল, আর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্ররা, ইনস্যুরেন্সের কেরানীরা,—এরা সবাই আজ দুদিন থেকে চন্দন পাহাড়ের গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রায় দশহাজার লোক যোগাড় করেছে। তারা মিটিং ভাঙতে পারে।

তারা কি বলে?

তারা বলছে—ব'লে সমীর একবার অলক্ষ্যে বড়সাহেবের দিকে তাকিয়ে কিছু সাহস সঞ্চয় করলো। তারপর বললে, তারা বলছে বড়সাহেবের দল নিজেদের প্রচারকার্য করিয়ে নিতে চান। তারা তা হ'তে দেবে না। শুধু, আমাদের ভলান্টিয়ারের দলকে তারা ভয় দেখিয়ে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়েছে।

মিছে কথা।—ব'লে ললিত চীৎকার ক'রে অগ্নিশিখার মতো উঠে দাঁড়ালো।

বীরেশ এইবার কথা বললে, আচ্ছা, সব ত শুনলুম। কিন্তু আনন্দময়ীর মনোভাবটা কি, তোমরা খোঁজ নিয়েছ?

সমীর বললে, আজ্ঞে হাঁ, আমরা জানতে পেরেছি। তিনি বলেন, তিনি বিশেষ কোনো দলের মুখপাত্রী নন্, তিনি জনসাধারণের, তিনি গণতন্ত্রের আন্দোলনের পক্ষপাতী।...এবার আমি যাই, স্যর।—ব'লে নমস্কার ক'রে সমীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিশ্বাস ফেলে হাসিমুখে বীরেশ বললে, সমস্যা আমার নয় ললিত, সমস্যা তোমার। তুমি বোধ হয় আগে বুঝতে পারোনি, প্রবল ব্যক্তির মোহে তোমার আনন্দময়ীরও মাথা খারাপ হ'তে পারে। এ ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর অথবা তাঁর ওই জনসাধারণের সঙ্গে বিরোধ বাধলো, বেশ বুঝতে পারছি। তবে আমি তা'তে ভয় পাইনে, দুঃখবোধও করিনে। কিন্তু তুমি একটা বিশ্রী দ্বন্দ্বের মধ্যে প'ড়ে গেলে। একদিকে তোমার

হাতে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষার ভার, আর একদিকে তোমার আনন্দময়ীর সম্মান রক্ষার দায়িত্ব—

ধুপ্ ক'রে নিরুপায়ের মতো ললিত ব'লে উঠলো, কি করলে সব রক্ষা হবে, আপনি ব'লে দিন, দাদা।

বাইরে কি একটা গোলমাল শুনে বীরেশ এবার নিজেই উঠে একবার বারান্দায় পায়চারি ক'রে এলো। দক্ষিণ পথের প্রান্তর বেয়ে চারণের দল তখনও সাম্যবাদীর গান গেয়ে গেয়ে চলেছে। গানের সুরটির মধ্যে মাধুর্য সঞ্চয় ক'রে যথেষ্ট শ্রুতিমধুর করবার চাতুরী আছে, শুনলে মন মোহ-গ্রস্থ হয়—কিন্তু তার বিষয়বস্তু হোলো, কিষাণ মজদুর জাগো, শ্রমিক জাগো, ধনিকদের উচ্ছেদ করো—ইত্যাদি। বীরেশের মনে পড়ে গেল, বহুকাল আগে চিনির কলের মালিকদের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে সেও একদিন গণতন্ত্রের জয়ঘোষণা করতো। সেদিন ধনপতিদের বিরুদ্ধে কী রাগ তার! অমুশীলা আর অনিলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কী আগুন-ছোটানো বক্তৃতাই সে দিয়েছিল। কিন্তু আজ এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে তা'র বলতে ইচ্ছা হোলো, ওরে মূর্খ জনসাধারণ, পৃথিবীর বড় বড় গণতন্ত্রের যারা নিয়ন্তা, তারা রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে আর অকর্মণ্য বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় না, তারা কাজ করে। কেবল তাই নয়, তারা ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করে, তাদের প্রকাণ্ড সৃষ্টি রচনা, তারা বিপুল অর্থ আর ঐশ্বর্য্যের জামিনদার। তোদের জয়ঘোষণা যারা করে, তারা আত্মকল্পিত রচনাকে সফল করার জন্ম তোদের বাহনের মতো ব্যবহার ক'রে নেয়, এই মাত্র। তোদের মুখে তারা বুলি দেয়, তোদের নাচায়-কাঁদায়, দরকার হ'লে তোদের মার খাওয়ায়, অসুবিধায় পড়লে তোদেরই বলি দেয়। বিপুল কোলাহল জাগিয়ে তুললেও তোরা মূঢ়, মূক, প্রাণহীন, অকর্মণ্য।

বারান্দা থেকে বীরেশ ফিরে এলো। বললে, তোমাকে কী উপদেশ

দিলে সব দিক রক্ষা হবে, জানিনে ললিত। তবে এবার আমার নির্দেশ তোমাকে দেবো। নবনগরের সর্বত্র ঘোষণা ক'রে দাও, আজ থেকে আমার এই এলাকায় সভা সমিতি, শোভাযাত্রা সমস্তই বন্ধ।

ললিত ভীত কণ্ঠে ঢোক গিললো। বললে, কী বলছেন আপনি? ওরা যে বিপ্লব বাধাবে? ···

দেখতে চাই সেই বিপ্লবের চেহারা! ··· তুমি যাও, সব আয়োজন বন্ধ করো, পদ্মাসনার মন্দিরের দরজায় চাবিতালা লাগিয়ে আমাকে চাবি এনে দাও।

কিন্তু দাদা, একবার ভেবে দেখুন—

বীরেশ বললে, ভেবেই দেখেছি ভাই। টেলিফোন ক'রে আমি হেড্ কোয়ার্টার্স থেকে এখুনি পুলিশ ফৌজ আনাচ্ছি, ভয় নেই। হ্যাঁ, আজ বিকেলবেলার মধ্যে দেখতে চাই, প্রকাশ ঘোষ আর তারিণী তলাপাত্রকে এই নগর থেকে পাইকদের সাহায্যে অন্তত ত্রিশ মাইল দূরে নির্বাসিত করা হয়েছে। ওদের পরিবারকে নৌকোয় চাপিয়ে এ অঞ্চল থেকে সরিয়ে দাও। আর যারা দল পাকাচ্ছে, তাদের ওপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা তুমি করবে। নবনগর যদি জনহীন হয়, পরোয়া করব না। ··· যাও, ললিত—

কিন্তু যদি গোলমাল বাধে?

তার দায়িত্ব আমার আর পুলিশের।

একটু ইতস্তত করে ললিত বললে, কিন্তু আনন্দময়ী যদি—

থমকে বীরেশ দাঁড়ালো। বললে, হ্যাঁ, আনন্দময়ীর সম্মানরক্ষার সর্বপ্রকার দায়িত্ব তুমি নেবে। ··· কিন্তু আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, দরকার হ'লে একথা তাঁকে জানিয়ো। বাইরে দিয়ে এখানকার আইন

আর শৃঙ্খলার বিপক্ষে তিনি যদি দাঁড়ান্, আপত্তি নেই,—তবে নবনগরের মাটির ওপর পা রেখে নবনগরের বিরুদ্ধে তাঁকে কথা বলতে দেবোনা,—তাঁকে অবিলম্বে এ দেশ ত্যাগ করতে হবে।

ভীতকণ্ঠে ললিত প্রশ্ন করলো, যদি আপত্তি করেন?

আইন আর শৃঙ্খলা তাঁর আপত্তির চেয়ে অনেক বড়। ··· যাও, আমি এখুনি ফোন্ করছি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই পুলিশের দল আসবে। তাদের তাঁবু ফেলার ব্যবস্থাও তুমি করবে।—ব'লে বীরেশ নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যে একদা প্রলয় কাল ঘনিয়ে এসেছিল। সেই দুর্জয় ক্ষমতার প্রয়োগে ভয় অপেক্ষাও ভীষণ চেহারা ফুটে উঠলো নবনগরে। পুরুষের ভিতরে ছিলেন চতুর্মুখ ব্রহ্মা, তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, শ্রীবিষ্ণু হয়ে তিনি করেছিলেন পালন, আজ বীরেশের ভিতর থেকে জেগে উঠলেন মহেশ্বর,—কালো জটারাশিতে নবনগরের দিগন্ত ছেয়ে তিনি নামলেন সংহারলীলায়। শঙ্করের কী বিচিত্র বেশ, মহিমান্বিত নিষ্ঠুরতার কী আশ্চর্য প্রকাশ। আজ পদতলবাসিনী সেই শুভ্রশীলা কাছে নেই, প্রতিভার পূজারিণীর স্তবগান আজ নীরব।

কিন্তু সাধারণ মানুষের সংসারে মহিমা কে বোঝে কতটুকু?

সমগ্র নগরের কণ্ঠরোধ করতে বিলম্ব হোলো না, দম আটকে যেন চারিদিক নীল হয়ে উঠলো। গুর্খার দল, সমবায় সমিতির ভোজপুরী দল, আর একদল জংলী সর্দারকে পিঞ্জরমুক্ত ব্যাঘ্রের মতো চারিদিকে ছেড়ে দেওয়া হোলো। তারা কর্তব্য জানে, কৃপা জানে না। প্রথমেই আনন্দ-ময়ীর বাসা তারা অবরোধ ক'রে রইলো, সেখানে অপর কারো প্রবেশ নিষেধ। তারপর দেখতে দেখতে প্রকাশ বোস আর তারিণী তলাপাত্রের

সুব্যবস্থা হয়ে গেল। নগরের সর্বত্র একটা আতঙ্কের ছায়া নামলো,—ঘরে ঘরে দরজা জানালা বন্ধ হ'তে লাগলো। কোথায় গেল চারণের গান, কোথায় শোভাযাত্রা আর সভায় আয়োজন। মাঝে মাঝে কেবল আহতের ক্ষণিক আর্তচীৎকার কানে আসে,—তারপরে আবার স্তব্ধতা। কেবল নিঃশব্দে হাসপাতালের কোনো কোনো কক্ষ আহত ব্যক্তির সংখ্যায় ভরতে লাগলো। ওদিকে চন্দনপাহাড় থেকে কয়েক মাইল দূরে এক লৌহনায় রক্ষার প্রাচীরবেষ্টিত আড্ডতে মাত্র জনপঞ্চাশেক দল-পতিকে নির্বাসিত করা হোলো। পাইকদের প্রহারে তাদের মধ্যে অনেকে এখনও অচেতন। ··· রুদ্র তাঁর নিজের তাণ্ডবের নেশায় রক্তচক্ষু।

পুলিশ ফৌজ এসে পৌঁছেছে। তাদের নায়ক এসে বীরেশের সঙ্গে সাদর করমর্দন ক'রে সমস্ত ব্যাপারটা জেনে গেছেন। বীরেশ তাঁকে চা পানে আপ্যায়িত ক'রে দিয়েছে।

অপরাহ্ণ সন্ধ্যার দিকে আসন্ন। নগরের সর্বত্র দীপমালা জ্ব'লে উঠেছে। তারা যেন নিঃসঙ্গ প্রেতদৃষ্টির মতো ভয়াল ও দীপ্ত। আলো আছে, উৎসব কোথাও নেই; আয়োজন আছে, প্রাণ কোথাও নেই। উপবাসী সর্বহারার ন্যায় পথঘাট জনহীন, কোলাহলহীন। একা এই নগর যেন শ্মশানপ্রান্তে কাঁদতে বসেছে। বসন্ত বাতাস কেবল করুণ নিশ্বাসে সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে মুচিত্রার ফুলফুল্ কান্নার উপর দিয়ে। আকণ্ঠ বেদনায় চারিদিক রুদ্ধশ্বাস,—স্তব্ধ।

তিনমহলা বাগান-বাড়ীর দোতলার প্রকাণ্ড বারান্দায় বীরেশ একা পায়চারি ক'রে চলেছে। নিচে পাইক আছে কয়েকজন, শমীর আছে আলো জেলে আফিস ঘরে। সকাল থেকে ললিতের আর কোনো উদ্দেশ নেই। বড়সাহেবের আদেশ পালন করেছে সে বর্ণে বর্ণে।

যে কোনো জরুরী অবস্থার জন্য বীরেশ প্রস্তুত। কিন্তু তবু মন

আলোয় নিজের ছায়া দেখে নিজেই সে চমকে ওঠে কেন ? এ ছায়া তার নয়, অন্যের। তার সকল কীর্তির ভগ্নাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে কে যেন তাকে অগণ্য প্রশ্ন ক'রে চলেছে। আহত পক্ষীশাবকদলের মতো তারই বুকের মধ্যে যেন স্তূপাকার প্রশ্নের ঝটাপটি চলেছে। এর মধ্যে কল্যাণ কোথায় ? তার শক্তি আর ক্ষমতার একি বীভৎস পরিণাম ? এ আজ সে কোথায় এসে দাঁড়ালো ?...এ লজ্জা সে লুকোবে কোথায় ?...কিন্তু দেয়ালে- দেয়ালে, কক্ষে- কক্ষে কোথাও তার প্রশ্নের উত্তর নেই। আজ কোথায় তারা, যারা তার বিপুল ক্ষমতার এই মহিমান্বিত অধঃপতন দেখে কাঁদতে বসবে ? আজ তার সাফল্যের চেহারা অপূর্ব, তার ক্ষমতা আর প্রভুত্বের এই আশ্চর্য প্রকাশ যে-কোনো পুরুষের পক্ষেই ঈর্ষার বস্তু। অত্যন্ত সামান্য, অত্যন্ত নগণ্য এক নিঃসম্বল পলাতক অবস্থা থেকে শক্তি আর প্রতিপত্তির শিখরে সে উঠেছে। সে ভয় করেনা কলঙ্ক আর অপবাদ, গ্রাহ্য করেনা অখ্যাতি আর ঈর্ষা, পরোয়া করেনা বিরোধী দলের কোনো চক্রান্ত। তাকে নিচে নামাবার, দাবিয়ে রাখার, পরাজিত করার কোনো ক্ষমতা আর কারো হাতে নেই। সম্পদ আর শক্তি, এই দুই দুর্লভ বস্তু তার করতলগত। তাকে দেশদ্রোহী বলো, অনাচারী বলো, লুণ্ঠনকারী বলো,—বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই। ক্ষমতাবান আর শক্তের প্রতি মানুষের সহজাত ঈর্ষা আছে, সে জানে,—জাতীয়তা আর গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে ওরা সেই ঈর্ষাকে গোপন করে; মানবপ্রীতির নাম দিয়ে বঞ্চিত আর ব্যর্থের দল নিষ্ফল চিত্তক্ষোভকে চেপে রাখে। কিন্তু তবু ওই স্তিমিত প্রদীপের আলোয় দেয়ালের ছায়া বলে অন্য কথা। কী ছিল তার নীল রক্তে ?... প্রভুত্ব পিপাসা, অথবা লোককল্যাণ ?... এই কি সেই কল্যাণ ? এই কি তা'র পথ ?... সম্পদ আর ক্ষমতাকে সে আয়ত্ত করলো,—তার সর্বশেষ পরিণাম কি মানুষের কণ্ঠরোধ ? কি চেয়ে-

ছিল সে, কী জন্যে তার জীবনব্যাপী সংগ্রাম, তার এই মরণান্তক অধ্যবসায় ? ……

সংশয় জাগলো তার মনে,—বিপুল বিশ্বব্যাপী সংশয়। আলো কোথাও নেই, কিন্তু কোথায় তা'র পথ ? সৃষ্টি করেছে সে বিরাট, কিন্তু এই বিরাটের শেষ অর্থ কোথায় ? কোথায় গেল তার অস্তিত্বের অর্থ ? দুঃখে, দুর্দশায়, হতাশায়, বেদনায়, যুদ্ধ করেছে সে অবিশ্রান্ত কিন্তু তার সকল কর্ম, সব অধ্যবসায়ের এই বীভৎস পরিণতি সে ত কল্পনা করেনি কোনোদিন।…দিগন্ত প্রসারিত তামসী অন্ধকারের দিকে চেয়ে বীরেশ অধীর প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে লাগলো, তার সেই পূর্বজীবন—সেই অগ্নিকরা তরুণ যৌবনের স্মৃতিবিন্দুগুলি। সেই ভাবনাহীন দায়িত্ববোধহীন দিনগুলি; সেই নির্মল, নিষ্কলঙ্ক জীবনের আনন্দময় মুহূর্তগুলি। আজ বাস্তে তার জীবনের এই পরম জিজ্ঞাসার সন্ধিক্ষণে তার কাছে কেউ নেই, কে ব'লে দেবে তার কোন্ পথ ? কোন্ পথে পাওয়া যাবে পরমার্থ, পাওয়া যাবে খুঁজে তার পরম তৃপ্তির সন্ধান ! যা কিছু রচনা সে করেছে, সব ব্যর্থ, মিথ্যা, অসার,—মানুষের কল্যাণ-পদার্থ এর মধ্যে কোথাও নিহিত নেই। মহাকবি হ'তে সে চেয়েছিল, হ'য়ে উঠলো মহাদানব, বাল্মীকি হ'তে পারলো না, হোলো দস্যু রত্নাকর। সমুদ্র মন্থন ক'রে সে অমৃত ভাণ্ডার তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আকণ্ঠ ভ'রে উঠলো হলাহলে।

পায়ের শব্দে বীরেশের চমক ভাঙলো। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, কে ?

আমি সমীর। আপনার নামে একখানা তার এসেছে এই মাত্র।

রেখে দাও আমার টেব্‌লে।

ঘরে ঢুকে টেব্‌লের ওপর টেলিগ্রামটি রেখে দিয়ে সমীর আবার নিচে নেমে গেল।

মনোবিকারের মোহে বীরেশের চোখ দুটো আচ্ছন্ন, তন্দ্রায় নিমীলিত একটা অভিনব যন্ত্রণায় সে যেন জর্জর। দেহে কিম্বা মনে, স্নায়ুতন্ত্রে কিম্বা রক্ত সঞ্চালনে—সে যন্ত্রণা যে কোথায়, তার সংজ্ঞা নেই। তবু যে-সীমানার ভিতরে আবদ্ধ সে, তাকে চূর্ণ ক'রে ছিন্নভিন্ন ক'রে অবারিত মুক্তির পিপাসায় সে যেন অধীর হয়ে উঠেছে। নিজেকে আঘাত ক'রে, ক্ষতবিক্ষত ক'রে, দংশন ক'রে, সে চায় নিবিড় স্বস্তি। সে পেয়েছে অনেক,—অনেক যশ, অনেক ঐশ্বর্য আর ক্ষমতা, অনেক প্রতিপত্তি আর প্রতিষ্ঠা, কিন্তু পায়নি অমৃত। অমৃতের ক্ষুধায় সে হা হা করছে।...বহুকাল থেকে সে কল্পনা করেছিল একটু মধুর বিশ্রাম, ছোট একখানি পর্ণকুটীর, তার লতামালঞ্চের ফুলে ফুলে মধুমক্ষিকার মৃদু গুঞ্জরণ, দক্ষিণের একটুখানি দাক্ষিণ্য। মৃত্তিকার কণায় খুঁজে পাবে সে সান্ত্বনা, পাখীর কলগানে আর আকাশের তারায় আর মধ্যাহ্নের প্রহর গোণায় সে পাবে অপরূপ সঙ্গীতের সংবাদ। কোনো ঝঞ্ঝা, কোনো বিক্ষোভ দাহন, জনতার কোনো কল-কোলাহল—তার কুটীর প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছবে না। অমৃতের সন্ধান আছে সেই জীবনে, যেখানে মানুষের সমাজ নেই, কল্যাণ প্রচেষ্টার হুড়ো-হুড়ি নেই, যেখানে ভয়-ভাবনা, নিরাশা, ব্যর্থতা, ঘৃণা ও ক্ষোভ নেই, যেখানে ক্ষমতার দানবীয় মূর্তি আর ব্যক্তিত্বের পরশ্রীকাতরতা নেই, অপবাদ যেখানে পৌঁছয় না, যেখানে মহত্ত্বের মূল্য ঘৃণা আর ঈর্ষার কষ্টিপাথরে কষা হয় না,—সেই অমৃতময় জীবনে। সে জীবন এই নগরপথ ছাড়িয়ে দুশ্চিন্তা পেরিয়ে, দিগন্ত অতিক্রম ক'রে,—সে কোথায় কত দূরে, বীরেশের জানা নেই। আজ তারই হৃদয়ের দানববৃত্তি যখন চারিদিকে বর্বর চক্রান্ত-জাল বিস্তার করে নিরস্ত্র ও নিরুপায় বিরুদ্ধের দলকে নির্মম ভাবে পদদলিত করছে, তখন সেই হৃদয়েরই দেবপ্রকৃতি আপন সর্বাঙ্গে উৎপীড়িতের রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্নগুলি অনুভব ক'রে অসহ যন্ত্রণার মধ্যে কাঁদতে লাগলো,

এ পথ তার নয়, তার পথ অমৃতের। অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে সে এতদিন যা পেয়েছে, এ আসল বস্তু নয়,—এর থেকে নিজেকে অতিক্রম করাই তার সাধনা। অমৃতের অফুরন্ত পিপাসা তার মনে, কিন্তু নিঃস্ব নিরবলম্ব না হলে সে অমৃত কি পাওয়া যাবে খুঁজে?

ঘরে এসে আলোটা উজ্জ্বল ক'রে বীরেশ কতকগুলি কাগজ আর স্ট্যাম্প নিয়ে কি যেন মনোযোগ দিয়ে লিখতে লাগলো। টেবলের এক-পাশে টেলিগ্রামের যোড়ক প'ড়ে রইলো, তার খোলার সময় নেই। লিখলো সে অনেকক্ষণ, কি যে লিখলো সেই জানে। রাত্রি সম্পূর্ণ নিঃসাড়,—দূরাগত পেচকের আওয়াজ ভিন্ন আর কোথাও কিছু শোনা যায় না। বড় একখানা আবেদন পত্রের মতো অজস্র লেখা সে লিখে গেল একান্ত মনোযোগে।

দরজায় বাইরে সহসা পায়ের শব্দ শুনে সে মুখ তুললো। কিন্তু রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে সেই অলৌকিক শব্দটুকু আবার যেন পলকেই স্তব্ধ হয়ে গেল। বাড়ীটা তার প্রহরীবেষ্টিত হ'লেও রাত্রির অন্ধকারে গোপন-চারী শত্রুর আবির্ভাব অসম্ভব নয়। বীরেশ সতর্ক হয়ে সাড়া দিল, কে? নবীন? ...

সাড়া দিলনা কেউ। কিন্তু পরমুহূর্তেই লঘুপদসঞ্চারে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালো একটি স্ত্রীলোক। ধূসর আবরণে সর্বাঙ্গ ঢাকা; চোখে মুখে উদ্বেগ থাকলেও সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিঃসঙ্কোচ। কিন্তু তার রূপলাবণ্যরাশির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বীরেশ বিমূঢ় ও স্তব্ধ হয়ে গেল।

নমস্কার। আমাকে বোধ হয় চিনতে পারেন নি, আমি আনন্দময়ী। সকালে আপনার এখানে আমার আসার কথা ছিল, কিন্তু দিনের

কারণেই হয়ে ওঠেনি। আপনি হয়ত বিরক্ত হলেন, কিন্তু একটু আলাপ করতে পারি কি? …

বীরেশের মুখে কথা ফুটলো না, কেবল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

চেয়ারটা টেনে আনন্দময়ী টেবলের কাছেই এসে বসলেন। বললেন, রাত অনেক, হয়ত দুটো কি তিনটে, তবু বিরক্ত করতে এলুম আপনাকে। আমি একা আসিনি, ললিত নিচে ব'সে আছেন। ললিতকে আপনি খুবই ভালোবাসেন, জানি।—এই ব'লে সরু চুড়ি পরা তার হাতে কপালের এককলক চুল ঘোমটার মধ্যে সরিয়ে দিয়ে সপ্রতিভ ভাবে তিনি বসলেন।

গলা পরিষ্কার ক'রে বীরেশ এতক্ষণ পরে গলায় আওয়াজ বা'র করতে পারলো। বললে, … এমন সময়ে আপনি এলেন?

আনন্দময়ী একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, বিশেষ জরুরী কাজ, বুঝতেই পারছেন। আমি নিরুপায় হয়ে এসেছি আপনার কাছে। … এত রাতে আসা হয়ত অশোভন হোলো।

তাঁর আত্মসমর্পণের ভাব দেখে বীরেশ খানিকটা যেন আশ্বস্ত হোলো। বললে, আপনার সঙ্গে পরিচয় কখনো হয়নি, তবে ললিতের কাছে আপনার অনেক স্তুতিবাদ শুনেছি।…সে বলে, আপনি নাকি মহীয়সী দেশনেত্রী। হয়ত সত্যি, হয়ত বা অতিশয়োক্তি,—আমি জানিনে। কিন্তু অভিযোগ বিচার না ক'রে আমার প্রতি আপনি যে মন্তব্য করেছেন, সেটা বিচিত্র বটে।

আনন্দময়ী কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন, দেখুন, ধারণা জিনিসটা অদ্ভুত, সে কোনো যুক্তিতর্ক মেনে চলে না। সবাই একজনকে মন্দ বলে, নিন্দা করে,—হয়ত তার সত্য প্রমাণও দেয়, কিন্তু

আমার যদি ধারণা হয়, সে ভালো লোক, আমি নাচার। বিশ্বাসের কাছে কোনো যুক্তিতর্ক খাটে না।

যাকৃগে। বীরেশ বললে, বলুন, আপনার জন্ত আমি কি করতে পারি ?

আনন্দময়ী বললেন, অনেকের ধারণা আমি এখানে অতিথি হয়ে এসেছি, সেটা সত্যি নয়। আমি এসেছি ভ্রমণে; কাগজে পড়েছিলুম—এই 'কলোনির' ইতিহাস, অনেকদিন থেকেই দেখার সাধ ছিল। মনে করেছিলুম এখানকার আদর্শ থেকে নিজে কিছু নতুন কাজের সন্ধান পাবো, কিন্তু আড়ম্বরই চোখে পড়লো, প্রাণের চেহারা দেখতে পেলুম না। আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি।—

বীরেশ বললে, আপনার সমালোচনা শুনে আমার লাভ নেই। যা সাধ্য তা করেছি, যা পারিনি তার জন্যে লজ্জিত নই। তবু আপনাদের জানাই, সমালোচনা অপেক্ষা সহানুভূতিই বড়। আপনি ব্যর্থ হয়ে চ'লে যাচ্ছেন কেন, আমি জানিনে। অথচ আপনার রুচি অনুযায়ী আমি এই নগরকে ঢেলে সাজাবো, এ উৎসাহও আমার নেই।

আনন্দময়ী একটু হাসলেন। কিন্তু তাঁর হাসির অর্থটা সম্পূর্ণ বুঝতে না পেরে বীরেশ যেন অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো। সকালবেলা এই নারীই তার পুরুষের মর্যাদায় আঘাত করেছিল। মেয়েদের কাছে কোনোদিন অনাদর সে সহ্য করেনি, সেই ক্ষত থেকে রক্তের দাগ তার এখনো শুকোয়নি।

আনন্দময়ী আস্তে আস্তে বললেন, কাল এই নগরে একটা বিশেষ উৎসব আরম্ভ হবার কথা ছিল—

হ্যাঁ, আপনারই আগমন উপলক্ষ্যে—বীরেশ বললে, আমিও খুব উৎসাহ বোধ করেছিলুম, কিন্তু আপনার জনকয়েক চাটুকারের উৎপাতে

আমাকে সব বন্ধ করতে হয়েছে।—এই ব'লে সে প্রবল উত্তেজনা দমন ক'রে একটা চুরুট ধরালো।

আনন্দময়ী বললেন, তারা এখানকারই লোক, আমার চাটুকার নয়। আপনি তাদের আয়ত্ত করতে পারেন নি, সে অপরাধ কি আমার? আমি এখানে নতুন এসেছি।

বেশ, আপনি কি চান বলুন?

আমি?—হাসিমুখে আনন্দময়ী মাথা নত করলেন। পুনরায় বললেন, কিছু চাইতে আমি আসিনি। কেবল আমার চাটুকারদের তরফ থেকে আপনাকে বলতে এসেছি, তারা অপরাধী নয়, তারা অন্যায় শাস্তি পেয়েছে।

বীরেশ বললে, সে-বিচার আমার আর ললিতের, আর কারো নয়। নবনগরের চৌহদ্দির মধ্যে অন্যায় কোথাও নেই, এইটুকু আপনারা জেনে যান্।

আনন্দময়ী বললেন, সেইটুকুই এর বিপদ। ন্যায় আর শৃঙ্খলা নিয়ে যারা কারবার করে, তারা হৃদয়ের মূল্য দেয় না। জনসাধারণের অসন্তোষকে যারা গলা টিপে মারতে চায়, তারা নিজেদেরই সর্বনাশ করে।···দূষিত বায়ুর পথ রোধ করতে নেই, সেই অস্বাস্থ্যই একদিন সকল প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে।···আপনার এই চণ্ডনীতি আপনি প্রত্যাহার করুন, বীরেশবাবু।

বীরেশ চুপ ক'রে শুনলো তাঁর কথা। পরে বললে, নীতি নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে প্রস্তুত নই। কেবল বলি, উপরতলার এই অসন্তোষটাই কৃত্রিম। মানবতার আদর্শের ওপর এই 'কলোনির' ভিত্তি, সভ্য গণতন্ত্রের ঝুটো ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়গান আমরা করিনে, কাজ করি আমরা। আপনার নির্বোধ চাটুকারেরা বোঝেনি, মানুষের

সকল কীর্ত্তিই বাইরের লোকের জন্যে। একজন রচনা করে, পাঁচজনে তার ভাগ পায়। ক্ষুধায় খাদ্য দেবোনা, এত বড় অমানুষ আমি নই, কিন্তু তুষ্ট ক্ষুধাকে প্রশ্রয় দিয়ে এই নগরে অস্বাস্থ্য আনবো, এ নির্বুদ্ধিতা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

তাই ব'লে আপনি অত্যাচার করবেন তাদের ওপর ?

তাঁর গলার আওয়াজে বীরেশ আঘাত খেয়ে উগ্র হয়ে উঠলো। চুরুটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে বললে, আপনার উত্তেজনার কারণ আছে বৈ কি।...সন্দেহ নেই, আপনার আগামী কালের পাওনা প্রশস্তিটা মাঠে মারা গেল।

আনন্দময়ী আহত হলেন না, কিন্তু শান্তকণ্ঠে বললেন, যেদিন আপনি এই নগর তৈরী করেছিলেন সেদিন আপনার আত্মবিশ্বাস ছিল, সাধারণের ওপর মমতা ছিল। কিন্তু হয়ত এখন আপনার সেই বস্তু নেই। 'নীরো' একদিন ক্ষমতায় অন্ধ হয়েছিল, আপনি ত' জানেন। ক্ষমতাকে হারাবার একটা ভয়ানক আতঙ্ক ছিল তার মনে, তার পায়ের তলাকার মাটি আলগা হয়েছিল।...আর প্রশস্তি ? প্রশস্তি ত কেবল স্তবগান নয়, তার মধ্যে আছে দুর্লভ স্নেহ। প্রশস্তিকে অগ্রাহ্য করা পৌরুষ হ'তে পারে, কিন্তু তা'তে গৌরব নেই। একদিন এই প্রশস্তিই ত' আপনাকে এই নগর সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছিল !

আপনি কি ক'রে জানলেন ?

ললিতের মুখে শুনেছি।—চঞ্চল হবেন না, বসুন। আমি প্রকাণ্ড নালিশ নিয়ে আপনাকে বলতে এসেছি, আপনি আগাগোড়া ভুল ক'রে এসেছেন। মানুষের জন্য আপনি কিছুই করেননি, করেছেন নিজেকে খুশি করার জন্যে। আপনি ক্ষমতাবান, লোকে জেনেছে। দুর্বলের কাছে কেউ প্রত্যাশা করেনা,—তারা সবাই দাবি জানাচ্ছে আপনার

কাছে। কিন্তু আত্মপরতায় আপনি এতই অভ্যস্ত যে, অন্ধের মতো আঘাত করছেন আপনি তাদের, যাদের নিরুপায় অসন্তোষ ছাড়া আর কোনো সম্বল নেই। এই ব'লে আনন্দময়ী বীরেশের দিকে তাকালেন।

বীরেশ বললে, কৌতুক বোধ করছি আপনার উপদেশে।

না।—আনন্দময়ী বললেন, কৌতুকের আড়ালে আপনি আত্মগোপন করছেন, বীরেশবাবু।

তাঁর এই অশোভন উক্তিতে বীরেশ আবার অধীর হয়ে উঠলো। কিন্তু গভীর রাত্রে একটি নারীর প্রতি অসম্মানসূচক কোন উক্তি করা তা'র পক্ষে সম্ভব নয়। সে কেবল বললে, আমাকে উপদেশ দেওয়া ছাড়া আপনি আর কোন্ কাজে এসেছেন, এখনো কিন্তু জানতে পারিনি: দয়া ক'রে আপনার বক্তব্য বলুন। আপনাকে আগে কখনো দেখিনি, অথচ প্রথম সাক্ষাতে এমন একটা অপ্রীতিকর আলাপ হবে, আমি আশাও করিনি।···আপনাকে সময় দিচ্ছি, আপনার বক্তব্য শেষ করুন, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

আনন্দময়ী সবিনয়ে বললেন, জানেন ত, মেয়েরা একটু অনধিকার চর্চা করতে ভালোবাসে। আপনি যদি দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেন, আমি রাগ করবো না। আমি ত জানি আপনার আত্মাভিমান চন্দন পাহাড়ের চেয়েও উঁচু!

মূঢ় দৃষ্টিতে বীরেশ তার দিকে চেয়ে রইলো। অদ্ভুত নারী বটে! এ মেয়ে অঞ্জলিকা নয়, নলিনী নয়,—এ মেয়ে হাসি মুখে আঘাত করে, সচেতন হ'য়ে বিদ্রূপ করে, গায়ে প'ড়ে উপদেশ শোনায়। রাত্রির অন্ধকারে একা ব'সে নির্ভয় ও নিঃসঙ্কোচভাবে পুরুষকে উত্ত্যক্ত করতে এর কোনো কুণ্ঠা নেই, সম্মান খোয়াবার আশঙ্কা নেই।

বীরেশ বললে, দেখুন, আপনি শক্তিতের বিশেষ প্রিয়। এ রকম

তাবে অন্তের সঙ্গে আলাপ করাটা তার পক্ষে প্রীতিকর না হ'তে পারে। আমি বরং কাল সকালে ললিতের মুখ থেকে আপনার বক্তব্য শুনবো।

আনন্দময়ী বললেন, কিন্তু আমাকে তাড়াবার জন্তে আপনি অমন ব্যস্ত হবেন না। নিজের মর্যাদা রাখতে আমি জানি, আপনার কোনো আশঙ্কা নেই। আপনার পরিচয় বাইরে আমি পেয়েছি, দেখতে এসেছি আপনার জীবন যাত্রা। ··· বাইরেটা আপনি স্বাধীন ক'রে রেখেছেন, কারণ ভেতরটা আপনার ফাঁপা। ··· বলুন ত, আপনি কোথাও কিছু পেলেন না কেন?

অস্থীর কণ্ঠে বীরেশ ব'লে উঠলো, আপনি কেন এসব আলোচনা করতে চান?

করলে একটু খুশি হই। আপনি এত বড়, অথচ এমন নিরম্বু উপবাসী।—আনন্দময়ী হাসিমুখে বললেন, কোন্ বইতে পড়েছিলুম, জালের পিছনে রয়েছেন রাজা, আর সামনে সোনার একটা গোলকধাঁধা। রাজা আত্মঅহমিকা আর অজ্ঞানের জন্তে জাল ছিঁড়ে বেরোতে পারেন না,—সম্পদ আর শক্তি তাঁর পক্ষে অভিশাপ। আপনিও তাই। বিপুল প্রভুত্ব আর সম্পদের বোঝা নিয়ে আপনি কী ক্লান্ত! অথচ অজ্ঞান আপনাকে পথ আগলে রেখেছে।

বীরেশ এবার নিজেই উঠে দাঁড়ালো,—দেখুন, তত্ত্বকথা শুনেছি ঢের—আপনি বরং—

বসুন। ব'লে মৃদু উচ্চকণ্ঠে সহসা আনন্দময়ী তাকে তিরস্কার করলেন,—স্ত্রীলোকের অর্থ আর সাহায্য যার সৌভাগ্যের মূল ভিত্তি, স্ত্রীলোকের প্রতি তার এই কৃত্রিম অবহেলা বেমানান। বসুন আপনি।

অন্ধ ক্রোধে বীরেশের দাম্ভিক দুটো চোখ দপ্ দপ্ ক'রে উঠলো।

আনন্দময়ী উচ্চতর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, শিক্ষিত আপনি, অথচ

বিত্তার বিন্দুমাত্র নেই। প্রতিভা আপনি, অথচ মনুষ্যত্বের আদিম মহিমা কা'কে বলে আপনি এতটুকু জানেন না। মানুষের দাম কষেছেন আপনি আইন আর শৃঙ্খলার মানদণ্ডে। দয়া, বিবেচনা, ভালোবাসা, মানবতা,—এরা আপনার জীবনে অবমানিত। অতিশয় অহমিকায় নিজেকে অতি মূল্যবান, অতিরিক্ত বৃহৎ মনে ক'রে আপনি পাগলের মতো ঘুরেছেন। আপনার রঙীন ফানুসে একটি সরল মেয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে আপনাকে দেবতা ব'লে ঠাওরালো, অথচ তারই উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভিক্ষুর মতো হাত পেতে নিয়ে আপনার পৌরুষের বড়াই। তার ভালোবাসার প্রতিদান দেবার সাহস আপনার হোলো না। একটি কুমারী মেয়ে তার শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য নিয়ে আপনার কাছ থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল, সংসার রচনার সুখকল্পনা জলাঞ্জলি দিলে,—সমাজ-নীতির ভয়ে আপনি পল্লীগুহায় এসে জন্তুর মতন আশ্রয় নিলেন। পৌরুষ!···পৌরুষের অভিনয় চলেছে আপনার জীবনে। এই অভিনয়ের তলায় রয়েছে মেয়েলি ভীরুতা, অকর্মণ্যের আত্মপ্রসাদ, কাপুরুষের আস্ফালন······

কম্পিত কণ্ঠে বীরেশ বললে, তারপর?

বাইরে রাত্রির দিকে চেয়ে আনন্দময়ী বললেন, বক্তব্য প্রকাশ করতে আমি আসিনি, এসেছি আপনার বিচার করতে।···আপনার ইতিহাস অনাচার, গ্লানি আর অন্যায়ে পূর্ণ। পৌরাণিক যুগে রাবণ ছিলেন ত্রিভুবনবিজয়ী। কিন্তু চুরি, ডাকাতি, পরস্ত্রীর অপমান, উৎপীড়ন—এই ছিল তাঁর রীতি। মন্দোদরীর অত বড় মহিমা অন্ধের মতো তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। আর আপনি? আপনার বিবাহটা কি? একটা বীভৎস বর্বরতা ছাড়া আর কিছু? এক নাবালিকা সরলপ্রকৃতির মেয়েকে পায়ে ঠেলে এসেছিলেন, কেন জানেন? বাবার

১৯

সঙ্গে আদর্শ-বিরোধ নয়, নলিনীর সঙ্গে প্রণয়াবেগের দ্বন্দ্বও নয়, চটকদার শিক্ষার অভাব ছিল সেই মেয়ের মধ্যে। আপনার নির্লজ্জ অযোগ্যতা তাকে দীর্ঘ আটদিন ধ'রে উৎপীড়ন করেছে, আপনার কাপুরুষোচিত অহমিকা সেই মেয়েকে ঘরের মধ্যে পুরে দিনের পর দিন অপমান করেছে। কিন্তু রাঙাদিদির উপদেশ শুনে নূতন বরের পায়ের তলায় প'ড়ে বাঙালীর মেয়ে হয়েও সেদিন সে কাঁদেনি, সেদিন থেকে পুরুষকে সে ঘৃণা করতে শিখলো···

সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে বীরেশ জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, আপনি জানলেন কেমন ক'রে এত কথা······

লোকমুখে শুনিনি।—আনন্দময়ী সহসা তাঁর অস্বাভাবিক হিংস্র দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে বললেন, সেই কাপুরুষের জীবনচরিত আমার এই সর্বাঙ্গের ওপরেই লেখা—এই বুকের ওপর দিয়েই তা'র লোহার রথের চাকা চ'লে গেছে।

উন্মাদের মতো বীরেশ চেঁচিয়ে উঠলো, এর মানে কি? কে—কে আপনি? কে?

এর মানে আনন্দময়ী আমি নই, আমি সেই লীলাবতী।···অনেকে বলে, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। আমি বলি, লীলাবতী মরেছে, অপমৃত্যু তার কপালে লেখা ছিল। আমি উঠে এসেছি তারই শ্মশান-চিতার ছাই মেখে। আনন্দময়ী সহসা আত্মসম্বরণ ক'রে বললেন, থাক, মেয়েমানুষ, তাই চোখে জল আসে। এবার আমার বক্তব্য বলি। শুনুন, কোন অজুহাত আমি শুনবো না, এই নগরের অধিকার আমাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে,—এটা ভিক্ষা নয়, বিচারকের আদেশ।

বিদীর্ণ করুণ উর্দ্ধশ্বাসে বীরেশ ব'লে উঠলো, আচ্ছা, আচ্ছা দেবো। এবার চিনতে পেরেছি আপনাকে···

আনন্দময়ী বললেন, কেবল তাই নয়, এর সমস্ত সম্পত্তি ছেড়ে দিতে হবে জনসাধারণের নামে—

রুদ্ধস্বরে বীরেশ জবাব দিল, দেবে·—

বেশ, এবার একটি ভিক্ষা চাইবো, আদেশ নয়। এ দুর্ভাগা দেশে সেই আইন নেই, যে আইনের অভাবে এদেশের বহু মেয়ের জীবন ব্যর্থ। আমাকে সেই অধিকার লিখে দিতে হবে, যাতে আমি প্রকাশ করতে পারি, আমি অবিবাহিত ; আমার ওপর আপনার কোনো দাবি নেই।

হত্যার অপরাধীর মতো বীরেশ নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালো। বললে, তাও দেবো···

হ্যাঁ, এবার শেষ আদেশ—ব'লে আনন্দময়ী টেলিগ্রামটি হাতে তুলে নিলেন। বললেন, এর মধ্যে যে খবর আছে, আমি জানি ; ডাকঘরের গোয়েন্দা আমাকে জানিয়েছে।···পুরীতে অতুলীলার অন্তিম অবস্থা, অনিলবাবু আপনাকে যেতে লিখেছেন অবিলম্বে। এই মুহূর্তে আপনাকে পুরী রওনা হতে হবে। আর—হ্যাঁ, আর এক কথা। যে অন্যায় অত্যাচার আপনি ক'রে গেলেন, এর শাস্তিস্বরূপ জীবনে আর আপনি কোনোদিন নবনগরে পা দেবেন না।

বীরেশ দ্রুতপদে টেব্‌ল ও আলমারী খুলে জিনিসপত্র ওলোটপালট ক'রে রাশিকৃত কাগজপত্র নেড়ে চেড়ে কী যেন পকেটে পুরেছে, এমন সময় লীলাবতী উঠে দাঁড়ালো। বললে, থাক্, কিছু নেবেন না সঙ্গে, টাকাকড়িতে আপনার দরকার নেই, সামান্য গাড়ীভাড়া নিয়ে এখনই চ'লে যান—

প্রভুভক্ত ভৃত্যের মতো প্রত্যেকটি আদেশ পালন ক'রে উন্মত্তের মতো বীরেশ দরজা দিয়ে পালাবে, এমন সময় ললিত এসে পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে বললে, কোথা যান এত রাতে ? বাইরে যে শত্রু থাকতে পারে, বাবা ?

না, আর কোনো শত্রু নেই ললিত, পথ ছাড়ো।

লীলাবতী উচ্চ দীর্ঘ কণ্ঠে হেসে উঠে বললে, হুকুম পেয়েছি ললিতবাবু, সকাল হ'লে ঘোষণা করবেন, উৎসব ঠিকই হবে, বন্দীরাও ছাড়া পেয়ে যাবে।

দাদা ?···

একটি পলকের জন্য বীরেশ থম্‌কে দাঁড়ালো। বললে, আর কোনো প্রশ্ন ক'রো না ভাই আমাকে এখনই পুরী রওনা হ'তে হবে। একটা দলিল রেখে গেলুম তোমার নামে, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি কলোনির ভার নেবে। আর—আর আমি খুবই খুশি হবো, যদি তোমরা দুজনে ···থাক্, আসতে হবেনা সঙ্গে, আমি একাই যেতে পারবো।

স্তম্ভিত ও নির্বাক দুটি নরনারীকে একটা অত্যন্ত অভাবনীয় অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে বীরেশ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, তারপর দ্রুতপদে প্রহরীদের চোখের উপর দিয়ে প্রাঙ্গণ পার হয়ে পথে নেমে শেষরাত্রির অন্ধকারে সুচিত্রার দিকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে অন্ধের মতো ছুটে চললো।

শত্রু, মিত্র উৎপীড়িত, উপকৃত—সমস্ত সমাজ ও মানুষের দল, সমগ্র নবনগর যেন পিছন থেকে তাড়না ক'রে অপমান ও আঘাত ক'রে তাকে একখানা নৌকায় এনে চাপিয়ে দিল, এবং তারপর কাছি খুলে জলের স্রোতে নৌকাটা যখন ছিট্‌কে গেল, মনে হলো, তার প্রিয় নবনগরের তট তাকে পদাঘাত ক'রে তাড়িয়ে দিল।

রাত্রিশেষে দুই তট অন্ধকার, অন্ধ অশ্রুর ভিতর দিয়ে আকাশের তারকার দল দেখা গেল না। কেবল ধীরে ধীরে নবনগরের দীপমালা ঝাপসা হ'য়ে একসময়ে নদীর বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। পিছনে প'ড়ে রইলো তার প্রকাণ্ড অধ্যবসায় আর তপস্যার ইতিহাস; কিন্তু সেই ইতিহাসের জটিল গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন ক'রে তা'র নৌকা চললো অকূল অথৈ অন্ধকারের দিকে ছুটে।······সে ব্যর্থ হ'য়ে গেল!

তেরো

পুরীর বাড়ীটি ছোট, সমুদ্রের পাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একান্ত একা। বাগানের বেড়ার ঠিক নিচে বিস্তৃত বালুবেলা, সেখানে সারাদিনমান ধ'রে অশ্রান্ত তরঙ্গরাশি বিপুল আস্ফালনে আছাড় খেয়ে পড়ছে,—তার ক্লান্তি নেই, অবধি নেই। স্বর্গদ্বারের পথ দিয়ে এ বাড়ীটা কাছেই পড়ে।

বাড়ীটা নোনাধরা। কাঠামোটা কঠিন বটে, কিন্তু সাগরের লবণাক্ত বাতাসে জানালা দরজা দেওয়াল, সমস্তই যেন জরার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সজীবতার অতিশয় অভাব। প্রাঙ্গণে এককালে একটি ফুলের বাগান ছিল বৈ কি! এখনো কোনো কোনো লতা আর চারার ডালে শীর্ণকায় শুষ্ক চন্দ্রমল্লিকা আর গাঁদার চিহ্ন পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় বীজ ফেলা, মাটিও কোদলানো, কিন্তু অঙ্কুর আজো গজাতে পারলো না। সৌন্দর্য-বিস্তারের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু মৃত্যুর গোপন নিঃশব্দ কৌশলে তাদের প্রাণ শুকিয়ে শেষ হ'য়ে গেছে। আকণ্ঠ বেদনায় যেন ছোট বাড়ীটির দম আটকে রয়েছে।

উপরের সিঁড়ি থেকে চাকর একটা যন্ত্রপাতির ব্যাগ নিয়ে নেমে এলো, এবং তারই পিছনে পিছনে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে এলো অনিল। আগেকার সদানন্দ সেই চাকিম অনিল নয়, এ যেন কোন্ ক্লান্ত অবসন্ন এক জরাগ্রস্ত প্রৌঢ় অনিলবাবু। গায়ে একটা আধময়লা গেঞ্জি, খালি পা।...অনিল ডাকলো, ডাক্তারবাবু?

তার কণ্ঠ অসংযত নয়, কিন্তু অকম্প কারুণ্যে এক প্রকার অস্বাভাবিক জড়তায় যেন ভরা। ডাক্তারবাবু নতমস্তকে চ'লে যাচ্ছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন,—হ্যাঁ, বলুন?

আজ অবস্থা কেমন মনে হচ্ছে আপনার?

খুব চমৎকার। এমন সহজ সুন্দর জ্ঞান আর সূক্ষ্ম স্মৃতিশক্তি অল্প রোগীরই দেখেছি, মিস্টার সেন। কিন্তু উত্তেজনা যেন আসে না মনে, এইটুকু লক্ষ্য রাখবেন। কথা বলতে দেবেন, বন্ধ রাখবেন না। আচ্ছা, ওঁর বিছানার পাশে তিন চার দিন থেকে যিনি ব'সে রয়েছেন, উনি কে?

অনিল বললে, উনি আমার আত্মীয়া ভগ্নী, নলিনী। আমার স্ত্রী সম্প্রতি ওঁকে আনিয়েছেন। মেয়েটি অতি চমৎকার নার্সিং করে।

অদ্ভুত সেবা দেখলুম—ডাক্তারবাবু বললেন, ওঁকে বলবেন, রোগীর মন ভুলিয়ে রাখতে। উনি জগন্নাথদেবের সেই উপকথাটি এমন সুন্দর ক'রে শোনালেন,···সেই যে নীলমাধবের গল্প, অতি সুন্দর।···বুঝলেন মিস্টার সেন, সেবা জিনিসটে রোগীর আয়ু বাড়িয়ে দেয়।

অনিল একটু অস্বস্তিবোধ ক'রে প্রশ্ন করলো, আমি জানতে চাইছি, ডাক্তারবাবু—রোগীর বর্তমান অবস্থা।

ডাক্তারবাবু ফিরে দাঁড়ালেন,—রোগীর অবস্থা? আপনিত' উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, মিস্টার সেন,—আপনি ত' জানেন, পৃথিবীর কোনো চিকিৎসাশাস্ত্রেই এই মারাত্মক ব্যাধির কোনো সার্থক ওষুধ আজো আবিষ্কৃত হয়নি!

অনিল নিরুপায় অবসন্ন চোখে তাঁর দিকে তাকালো।

বাগানের প্রান্তে এসে গাড়ীতে ওঠবার আগে ডাক্তারবাবু বললেন, আমার কি মনে হয় জানেন, পৃথিবীর কোনো ভীষণতম বিষ—তা সে কোনো জানোয়ারেরই হোক অথবা বন্য ওষধিরই হোক,—একদিন হঠাৎ সেই বিষ থেকে উঠে আসবে মৃতসঞ্জীবনী। হয়ত মানুষের সমাজ সেই দুর্লভ বস্তুটি একদিন আবিষ্কার ক'রে এই দুঃসহ শত্রুকে তাড়াতে পারবে।

হ্যাঁ, আর একটি কাজ আপনি করবেন। রোগী খুবই দুর্বল কিনা, আপনি একটু আড়ালে আবডালে থাকবেন,—কেননা আপনাকে কাছে দেখলে একটা 'ইমোশনাল ওয়েভ' আসতে পারে।—এই ব'লে তিনি গাড়ীতে উঠলেন।

ভীত কণ্ঠে অনিল প্রশ্ন করলো, তবে কি স্পেশাল ট্রেনে ওঁকে আজই কলকাতায় নিয়ে যাবো?

গাড়ীর ভিতর থেকে ম্লান হাসি হেসে ডাক্তার বললেন, শান্ত হোন, মিস্টার সেন। রোগী এখন সিঙ্ক্ করতে সুরু করেছে। নাড়াচাড়া আর চলবে না।

আপনি কি আসবেন আবার এখুনি?

আমার আসা-যাওয়াটা বড় কথা নয়,—আপনি রোগীর সংবাদ রাখুন।—

ডাক্তারবাবু তাঁর নিজের গাড়ী হাঁকিয়ে চ'লে গেলেন।

দোতালায় দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরটির সমস্ত জানালাগুলি খোলা। ঘরের ভিতরে-বাইরে সাগরের ঝড়ো হাওয়া অবিশ্রান্ত হু হু ক'রে বইছে। একদিকে দেখা যায় তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দিগন্তহীন নীলাভ জলরাশির উপরে পড়েছে সূর্যকরজাল, অন্যদিকে বহুদূর প্রসারী শস্যহীন প্রান্তর, তারই ভিতর দিয়ে কোনার্কের আঁকাবাঁকা পথরেখা। ওদিকে গগনচুম্বী জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া। মাঝে মাঝে টিয়া আর চন্দনার কলকণ্ঠ দূর আকাশে এক একবার আওয়াজ দিয়ে মিলিয়ে চলেছে। ঘাটে খোলা জেলেদের নৌকা, আশে পাশে উলঙ্গ নুলিয়া বালকের দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে। আজকাল যাত্রীর সমাগম কম, বেলাভূমিতে এখন আর তেমন জনতা চোখে পড়ে না।

ঘরের মধ্যে সামান্য পরিচ্ছন্ন আসবাব সজ্জা। কাপড়-চোপড় রাখলে বাতাসে এলোমেলো হয়ে যায়,—সেজন্য রোগীর প্রয়োজনীয় আসবাব ছাড়া আর বিশেষ কিছু এ ঘরে নেই। একপাশে টেব্‌লের ওপর একরাশ ফুলের গোছা একটি পাত্রে সব সময় মজুত থাকে। এদিকে নানাবিধ ঔষধপত্র আর আহারের সরঞ্জাম। একটি পাত্রে কিছু ফল।

বাতাসের একটা ঝলকে অনুশীলার যোগনিদ্রা'র চমক ভাঙলো। নিমীলিত চোখ তুলে মৃদুকণ্ঠে ডাকলো, নলিনী?

নলিনী তার জরামলিন বিশীর্ণ রোগাতুর মুখের উপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললে, চুপ কর্ ভাই,—জানি তুই কি বল্‌বি। ওসব কথা এখন ভাবতে নেই, বোন।

অনুশীলা চুপ ক'রে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বললে, আমাদের কলেজের কমনরুমে একটা ছবি ছিল, মনে পড়ে?…নীলকণ্ঠনাথের জটারাশি? ওই সমুদ্র দেখলে আজো সেটা মনে পড়ে।…উপরে ঢেউ,—কী বিক্ষোভ; নিচেটা শান্ত, যেন তপস্বী প্রতিভা!

এখন কেমন আছিস রে?

খুব ভালো।…আশা নেই কোথাও কিছু, তাই এত সুন্দর;—অনুশীলা ক্লান্ত মন্থর কণ্ঠে বললে, কেবল চেয়ে থাকা রোদের দিকে, কেবল ঢেউ গোণা,—মধুর লাগছে রে। বল্ তো রে নলিনী, সেই কবিতাটা?

নলিনী তার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে বললে, আমি মাস্টারী ক'রে খাই, কবিতা কি মনে থাকে রে?

বল ভাই লক্ষ্মী—সোনা—একবারটি বল্!

নলিনী অগত্যা মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করতে বাধ্য হোলো—

"ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা,
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-সেজ রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন,
উষা-দিশাহারা নিবিড় তিমির আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ ক'রো না পাখা।"

শীর্ণ দুই হাত আস্তে ক'রে তুলে যুক্তকরে অনুশীলা চোখ বুজে একটি প্রণাম জানালো। চোখের কোণ বেয়ে নামলো অশ্রু।

পিছন দিকের দরজা দিয়ে অনিল একবার এসে দাঁড়ালো নিঃশব্দ অলক্ষ্যে। মুখ তুলে নলিনী কি যেন ইঙ্গিত ক'রে তার দাদাকে কি জানালো,—অনিল আবার নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল নতমুখে। ওধারের ঘরগুলিতে অনিলের মা, দিদি, একটি ভ্রাতুষ্পুত্র, আনন্দের অনেক মাসতুতো ভাই এসে রয়েছেন কয়েকদিন ধ'রে। সকালে তাঁরা গিয়েছিলেন মন্দিরে, এতক্ষণে ফিরলেন। এ-ঘরে তাঁরা কেউই বড় একটা আসেন না, ব্যাধির ছোঁয়াচ মারাত্মক,—সুতরাং মাঝে মধ্যে উঁকি দিয়ে সজল চক্ষে সান্ত্বনা দিয়ে যান। নলিনী এর ধার ধারে না,—সে নিঃসঙ্কোচে ব'সে থাকে তার প্রিয় বান্ধবীর কাছে,—ব'সে থাকে বাঁচনের অতন্দ্র প্রতিনিধির মতো।

আধঘণ্টা পরে নলিনী রোগীকে ঔষধ ও আহার দিল। এটুকুতেই যেন অনুশীলার আপ্রাণ পরিশ্রম হয়েছে। তার চোখে মুখে পড়েছে গভীর কালো ছায়া। উদ্বিগ্ন দৃষ্টি এদিক ওদিক ফিরিয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে সে বললে, আসেনি ?

এইবার আসবে, ভাই।

আসবে, আসবে, শুধু শুনছি,—আসবে,—কিন্তু 'তার' করা হয়নি, আসবে কেমন ক'রে নলিনী?

নলিনী মাথার দিব্য দিয়ে তাকে বললে, যথাসময়ে 'তার' করা হয়েছে, অবশ্যই সে আসবে। কিন্তু অধীর প্রত্যাশা অনুশীলা আজ যেন সামলাতে পারছিল না। পুনরায় ক্লান্ত শান্ত হাসিমুখে সে বললে, চিনতে পারবে না আমাকে, এইটুকুই সান্ত্বনা।···আচ্ছা, নলিনী?

কেন রে?

না দেখা পর্যন্ত কোনোমতে বাঁচা যায় না?

ওকি কথা ভাই? এমন কি হয়েছে তোর যে বাঁচবিনে?

অনুশীলা বললে, কোথাও না বাঁচি, বাঁচবো তার মনে।···আঃ কী যেন হয়ে গেল!—সে আবার চোখ বুজলো।

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় অস্পষ্টস্বরে বললে, ভুল আমি করিনি, কেন জানিস? কেউ নিন্দে করলো না, কোথাও কলঙ্কের দাগ দেখিনি,—এই ত আমার সকলের বড় সান্ত্বনা! আচ্ছা নলিনী, বলতে পারিস এই উত্তর মিলবে কতদিনে?···এ কি অন্যায়?

হেঁট হয়ে নলিনী বললে, কোনো অন্যায় ত তুই করিসনি?

হয়ত করেছি, হয়ত করিনি। কিন্তু মেয়েমানুষের জীবনে এ আবার কি?···এ কি কথা ভাবলুম, যার মানে খুঁজে পেলুম না?···এ কি কাজ করলুম, যার কোনো সুফল নেই?

আজ এসব কথা কেন ভাবছিস' অনু?

ভাববার আর সময় নেই, তাই ভেবে নিচ্ছি, ভাই।···কী অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখেছি ওই সাগরের বুকের উপর। কী নীল, কী নিবিড়, বলতো? আলো আর ছায়ার বিরাট মূর্তি,—আচ্ছা, হরিহরের ছবি

মনে পড়ে বে? আমার দুই কল্পনা এক হ'য়ে মিশেছে ওই মূর্তিতে নলিনী। আমার জীবন-মরণ একাকার হ'য়ে গেল ওই সাগরের বিরাট বিক্ষুব্ধ প্রতিভায়। কি অপরূপ দৃশ্য দেখেছি শুয়ে শুয়ে সারাদিন।

বেশ, এবার তবে একটু ঘুমো, দেখি?

হ্যাঁ, অনেক বড় ঘুম ঘুমোবো এবার।···নলিনী, আমি অজ্ঞান নই যে। চেয়ে ভাখ্ কী নীল চারিদিকে! সাদা পায়রা উড়িয়ে দিলুম আকাশে, তারা ছুটলো দূর থেকে দূরে সংবাদ নিয়ে। আশা আর কোথাও নেই, তাই ত এত আনন্দ, তাই আজ এমন নিবিড় শান্তি। নলিনী, আর ঘুমোতে বলিসনে ভাই।···কই আসেনি এখনও যে?

নলিনী কণ্টকিত হয়ে বললে, এই এল ব'লে।

এলে তুই আমাকে একটু ধরিস ভাই, একটা ভয়ানক কাঁপুনি ধরবে কিনা, সামলাতে পারবো না। ততক্ষণে আমার চোখ ঝাপসা হবে না ত?...কিছু যেন চোঁয়না ভাই এ ঘরে,—তবু, তবু আর একটু কাছে আসতে বলিস।—একটু থেমে অরুণীমা পুনরায় বললে, আচ্ছা নলিনী, এবাড়ীতে আমার কথা কেউ শোনে না ত? কেউ কিছু মনে করে না?

কিন্তু উত্তর না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে ধীরে ধীরে সে চোখ বুজলো। নলিনী তার চোখের কোণে অশ্রু মুছিয়ে দিল।

ঘন্টাখানেক পরে রোগীর অবস্থায় বৈলক্ষণ্য দেখে অনিল আবার ডাক্তারকে খবর দিতে বাধ্য হোলো।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার সাহেব আবার এসে হাজির হলেন। তাঁর হাতে নতুন আর কোনো চিকিৎসা ছিল না। তিনি অক্সিজেন্ প্রয়োগ করলেন। অচেতন স্ত্রীর কাছে অনিল ব'সে রইলো। নলিনী একবার উঠে বাইরে গেল।

বারান্দায় ঝুঁকে ব্যাকুল হয়ে সে তাকালো পথের দিকে। মধ্যাহ্নের

রৌদ্রে অবারিত বিক্ষুব্ধ সমুদ্র থৈ থৈ করছে দিগন্তরেখা অবধি। কান্না এলো তার চোখে। রোগীকে কথা দিয়েছিল—সে বীরেশকে আনিয়ে দেবে একবার। কিন্তু যথাসময়ে সংবাদ হয়ত গিয়ে পৌঁছয়নি। বহুদূর থেকে তাকে আসতে হবে; কলকাতা হয়ে না এসে উপায় নেই। হয়ত অনিলের শেষকালকার উপেক্ষা সে ভোলেনি, আসতে সে রাজি নয়। পাছে নিজে না এসে ললিতকে পাঠায়, এই ভয়ে নলিনী কণ্টকিত হয়ে রইলো। কিন্তু আজ তার নিজের সম্মানও যেন অনেকটা বিপন্ন ব'লে মনে হোলো। একজনের অন্তিমশয্যার শেষ আবেদন যদি সে রক্ষা করতে না পারে, তবে তারও আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। কাল রাত্রে অনুশীলা বলেছিল, যদি না আসে তবে বলিস ভাই, প্রতিভার পায়ের কাছে এই শেষ প্রণাম রেখে গেলুম।...জানি, ভালো সে আমাকে বাসতে পারেনি, আমি অন্যের। কিন্তু বলিস তাকে ভাই, দুঃখ রেখে যাইনি তার জন্যে, আমি তার সেবায় লাগতে পেরেছিলুম, এই সৌভাগ্যের পাথেয় নিয়েই চললুম।

নলিনী বলেছিল, সে কি এতবড় শ্রদ্ধার যোগ্য, অনুশীলা?

শ্রদ্ধার চেয়েও সে বড়, নলিনী। সে যে কত বড়, আমার মতন মন না পেলে তোরা বুঝবিনে। এত নির্দয়, এত উদাসীন, তাই এতখানি শ্রদ্ধার যোগ্য। যদি তার আসার আগে মরি তবে এই সমুদ্রের ধারে আমার চিতা রচনা করিস,—ওই বিরাটের পায়ের কাছে আমি জ্ব'লে জ্ব'লে ছাই হ'তে চাই। আর—আর বলিস তাকে, আমার শিয়রে ওই চন্দ্রমল্লিকা আর রজনীগন্ধার গোছা,—এই আমার শেষ দান সে যেন নিয়ে যায়। ওই ফুল তার বড় প্রিয়।...আর কিছু দেবার আমার নেই।

তুই ত অনেক দিয়েছিস তাকে, অনু?

কিছু না, কিছু না,—তা'তে ছিল স্বার্থের দাগ, আর প্রবৃত্তির

কালিমাখানো,—সে-স্নান তাঁকে মলিন করেছে। ঘুষ দিয়ে তাকে বাঁধতে চেয়েছিলুম, তাই সে সবই ব্যর্থ। পুরুষ খুশি হয়েছিল অর্থ পেয়ে, কিন্তু দেবতা খুশি হয়নি ওই সামান্য নৈবেদ্যে। আজ সার্থক নৈবেদ্য সাজাবার সময় হোলো, নলিনী, ওই সমুদ্রের তীরে। ওইখানে, ওই বালুরাশির মধ্যে মিলিয়ে থাকুক আমার অস্থির চূর্ণ অবশেষ,—ওর ওপর যদি সেই নির্দয় দেবতার পায়ের দাগ পড়ে, তবে আমি ধন্য; যদি না পড়ে তবে তারই প্রতিভার মতো যা বিশাল, সেই সাগর তরঙ্গের ঢেউ আমাকে ধুয়ে নিয়ে যাক্ তার গর্ভে।...জীবনে যার সার্থকতা হোলো না, মরণ তার এই সান্ত্বনা, মন্দ কি?

নলিনী স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলো। এখানে তার নিজের কোনো বক্তব্য নেই, সমালোচনা নেই, এ বস্তু ভালো কিম্বা মন্দ—এও তার বিচার্য নয়। বাল্যকাল থেকে নিজে সে নৈতিক আবহাওয়ায় মানুষ,—সুতরাং তার কাছে এই ঘটনার আগাগোড়াই অভিনব। কেবল তার কানে বাজতে লাগলো অনুশীলার অপরূপ উক্তিটি,—নলিনী, আমার দুই কামনা এক হয়ে মিশেছে ওই হরিহরের মূর্তিতে,—ওই আলো আর ছায়ার রঙে। মানুষের কাছে আমার ভালোবাসা, দেবতার পায়ে আমার নৈবেদ্য। প্রতিভার পাদ্য-অর্ঘ্যই আমার জীবন!

অক্সিজেন্ প্রয়োগ ক'রে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি আর রোগীকে রাখা গেল না, এবং তার পরে সংসারে নিত্য প্রতিপলকে যা ঘটে তাই ঘটলো। অনুশীলার হৃদ্স্পন্দন চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। বাড়ীময় এক ঝলক কান্নার আওয়াজ উঠে আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে এলো।

সাগরের উপরে সন্ধ্যার ছায়া নামছে। রক্তবরণ সূর্য নেমেছেন দিগন্তরেখায়। চিতার সর্বশেষ অগ্নি-আভা ওরই মতো রাঙা। হু হু শব্দে বাতাস সেই চিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুৎকার দিয়ে অনেকক্ষণ অবধি সেই শিখাকে জাগিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেই অঙ্গারও এক সময়ে মলিন ও বিবর্ণ হয়ে এলো।

বালুচড়ার একধারে মেয়েরা ব'সে হা-হুতাশ করছিলেন। ওধারে পাড়ের কাছে বালুর উপর হেলান দিয়ে পরিশ্রান্ত অনিল চিতার দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। এ ধারে জলের প্রান্তে নলিনী একা দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের দিকে চেয়ে। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের সর্পিল ফেনা তার পায়ের কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল।

বীরেশ যে উর্ধ্বশ্বাসে কখন কোন্ সময়ে এসে পৌঁছেছে এবং কখনই বা অনিলের পায়ের কাছে ব'সে কথাবার্তা শেষ ক'রে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, নলিনী অনেকক্ষণ অবধি লক্ষ্য করেনি। কিন্তু এক সময়ে মুখ ফিরিয়ে বীরেশকে দেখে সে সচকিত হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে গিয়ে উভয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। বীরেশ মুখ তুললো, আচ্ছন্নের মতো প্রশ্ন করলো, তুমি এলে কবে?

এই পাঁচ ছ'দিন।···কিন্তু তুমি কি কিছুতেই আসতে পারলে না সকালের দিকে?—বলতে বলতে নলিনী কেঁদে ফেললো।

অদূরে চিতাভস্মের অবশেষ-চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে বীরেশ বললে, টেলিগ্রামটা হাতে পড়ে শেষরাত্রে, তখনই বেরিয়ে আসি,—কিন্তু কল্‌কাতায় পৌঁছবার আগেই পুরীর গাড়ী ছেড়ে দেয়। তারপর দুখানা প্যাসেঞ্জারে অদল-বদল ক'রে আসতে হোলো। সময় থাকতে পৌঁছতে পারলুম না, এ আমারই দুর্ভাগ্য।

শান্তকণ্ঠে অনিল বললে, কেঁদোনা, নলিনী ভাই।

নলিনী সহসা আঁচলে মুখ ঢেকে সেখান থেকে চ'লে গেল।

কর্তব্য তখনো কিছু-কিছু বাকি। অবসাদ আর জড়তা কাটিয়ে একসময়ে অনুশীলার শেষকৃত্য সমাপ্ত ক'রে অনিল বাড়ী ফিরলো। তারপর ঘরে গিয়ে অন্ধকারে তার বিছানায় শুয়ে প'ড়ে রইলো। শোকাচ্ছন্ন-পরিবারে আর কারো সাড়াশব্দ ছিল না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে নলিনী এসে ঘরে ঢুকে ডাকলো, দাদা, জেগে আছেন?

কি ভাই?—অনিল শুয়ে শুয়েই মাথা তুললো।

অনু নেই,···আমারও দরকার ফুরিয়েছে, এবার আমি চললুম দাদা। আমার গাড়ীর সময় হয়েছে।

এত রাত্রেই যাবে, নলিনী?

হ্যাঁ, এখুনি যাবো। মধ্যে মাঝে আপনার চিঠিপত্র পাবো ত দাদা?

কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত। তারপর অতি ক্লিষ্টকণ্ঠে অনিল জবাব দিল, পাবে ভাই।

• অনিলের পায়ের ধূলো নিয়ে নলিনী মুখে আঁচল চেপে বেরিয়ে চ'লে গেল।···সত্য বলতে কি, এই শ্বাসরোধী আবহাওয়ায় সে অধীর হয়ে উঠেছিল, তাড়াতাড়ি নিচে এসে বাগান পেরিয়ে সে পথে নেমে চললো। ছোট স্যুটকেসটি তা'র সম্বল,—সঙ্গে আর কিছু নেই। সেইটি কেবল নিল হাতে ঝুলিয়ে।

বালুর চড়ায় বীরেশ পরিশ্রান্তভাবে শুয়েছিল। আকাশে তারকার লিখনে সে যেন পাঠ করছিল তার জীবনের অদ্ভুত ঘটনা বিপর্যয়ের কাহিনী। অদূরে চিতার চিহ্ন অবধি সমুদ্রের সফেন তরঙ্গে ইতিমধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। ওখানকার বালুর গর্তে অনুশীলার অস্থিচূর্ণাবশেষ আছে কি না, জানবার উৎসাহ আর নেই।

শুভ্র জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের চারিদিকে তরঙ্গে তরঙ্গে লক্ষ মনিমাণিক্য

ধগ্‌ ধগ্‌ ক'রে জলছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, বালুর সুবিস্তৃত প্রান্তর চন্দ্রালোকে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।

নলিনী সুটকেসটি হাতে নিয়ে এসে বীরেশের কাছে দাঁড়ালো। তারপর গায়ের চাদরের ভিতর থেকে তিনদিনের বাসি চন্দ্রমল্লিকা আর রজনী-গন্ধার গোছা বা'র ক'রে বললে, হাত পেতে তুমি নাও বীরেশ,—এই তোমার পায়ে তার শেষ প্রণামের অর্ঘ্য।

বীরেশ হাত বাড়িয়ে নিল ফুলের গোছা।

নলিনী বললে, শেষকালে সে খুব ব্যথা পেয়ে গেছে, তুমি আসতে পারোনি ব'লে। হতভাগী বড় কাতর হয়ে অপেক্ষা করেছিল। পায়ের ধূলোর আশায় কী যুদ্ধ করেছে মৃত্যুর সঙ্গে, সে আমি ব'সে ব'সে দেখলুম।

প্রকাণ্ড তরঙ্গ বিশাল উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়লো বালুচড়ার উপরে।

তারপর বিপুল নিশ্বাস ফেলে আবার মিলিয়ে গেল।

বীরেশ মুখ তুলে তাকালো অর্থহীন দৃষ্টিতে।

সুটকেসটা রেখে নলিনী হেঁট হয়ে সেই জ্যোৎস্নালোকে বীরেশের পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, তুমি কোন্‌দিকে যাবে আমি জানিনা, কিন্তু আমার আর সময় নেই,—এই গাড়ীতেই আমাকে ফিরতে হবে।

এতক্ষণ পরে বীরেশ যেন আচ্ছন্নের মতো কথা বললে,—কোথা যাবে তুমি?

যাবো চাকরীস্থলে। আর আমার ছুটি নেই।···তুমি কি থাকবে এখন পুরীতে?

না।—ব'লে বীরেশ উঠে বসলো। বললে, এখনি আমি যাবো, কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যে যেতে হবে, নলিনী!

তোমার সঙ্গে কোথায় যাবো?

বীরেশের গলাটা ধ'রে এসেছিল। গাঢ়স্বরে সে বললে, আমার সঙ্গে যাবে তুমি সেই গ্রামে, যে-গ্রামের মাটিতে ওই অভাগী তার প্রাণের সমস্ত মমতা ছড়িয়ে রেখে এসেছে। সেই দুর্গম দরিদ্র গ্রাম, সেই বাংলো, সেই তাঁতীপাড়ার কুঁড়ে ঘর,—সেইখানে আমরা আবার ফিরে যাবো। আবার নতুন ক'রে তুলে নেবো অহল্যাবাঈর অসমাপ্ত কাজের ভার। সেই সংগ্রাম, কলহ, মনোমালিন্য, দারিদ্র্য আর বেদনা—আবার সব তুলে নেবো। আবার নগর বসাবো সেই অন্ধকার পল্লীপথে। কিন্তু এবার তুমি থাকবে আমার সঙ্গে, নলিনী।

নলিনী বললে, তোমার কথায় কোনদিন আমি প্রতিবাদ করিনি,—কিন্তু আজ করবো। যা সহজ নয়, স্বচ্ছন্দ নয়, তা আমি পারবো না, বীরেশ। তোমার স্ত্রী জীবিত, আমি তোমার সঙ্গিনী হব কেমন ক'রে? বাঙালী মেয়ের দুর্ভাগ্য নানাপ্রকারে আমি দেখেছি। আমার কাছে তাদের পীড়ন আমার সইবে না।

বীরেশ বললে, কিন্তু সেই লীলাবতীর মৃত্যু হয়েছে, নলিনী।—হ্যাঁ, মৃত্যু বৈ কি। তবে তার নবজন্মও আমি দেখে এলুম। দেখে আনন্দিত।

নলিনী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

বীরেশ বলতে লাগলো, আমার স্ত্রী ব'লে যাকে তোমরা জানতে সে নেই, আমার কীর্তি ব'লে যে নবনগরকে তোমরা জানতে, তাও আর নেই। আমার অহঙ্কার, আমার ক্ষমতা, আমার প্রভুত্ব—তাবাও নিশ্চিহ্ন। এর কারণ কি, জানো নলিনী?

নলিনী তার চিন্তিত মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইলো। বীরেশ বললে, এর কারণ তুমি।...কাজ করেছি কম নয়, কিন্তু তার মধ্যে না ছিল যোগসূত্র, না ছিল ঐক্য। প্রতিদিন বুঝতে পারতুম, তোমার কাছে ছিল তার মূলমন্ত্র; তুমি বাঁচাতে পারতে আমার সেই উন্নতির ধারাবাহিকতা।

নলিনী বললে, আমার অধিকার ছিল কোথায়, বীরেশ ?

ছিল, খুঁজে পাওনি। আজ সেই সহজ স্বচ্ছন্দ অধিকার হাতে ক'রে তোমাকে তুলে দিতে চাই। জানি আমি, জানি তোমার অভিমান আর বৈরাগ্যের মূল কারণ, জানি তোমার পথে-পথে বেড়ানোর প্রকৃত রহস্য, —কিন্তু আজ সকল প্রশ্ন আর সংশয়ের সমাপ্তি ঘটুক, নলিনী। একথা যেন আজ থেকে নির্বিকার চিত্তে জানতে পারি, স্ত্রীর চেয়েও তোমার বড় পরিচয় আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত, তুমি আমার সহধর্মিণী, জীবন-সঙ্গিনী।

কিন্তু—নলিনীর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো।

উৎসুক দৃষ্টি তুলে বীরেশ বললে, সংশয় রেখোনা মনে। আমি আশাবাদী, নব নব জন্মে বিশ্বাসী। চলো, ফিরে যাই আবার তোমার-আমার সেই অতীত জীবনে,—সেই প্রথম তারুণ্যের রক্তরাঙা স্বপ্ন রচনায়; মাঝখানের এই বিক্ষোভের ইতিহাসটা মুছে যাক, নলিনী। জানি, সেই বয়সটা পেরিয়ে এসেছি, আজ কেবল মাত্র হৃদয়াবেগের প্লাবনে তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না, তুমি এসে দাঁড়িয়েছ যৌবনকালের প্রান্তসীমায়। সুতরাং রক্তেরও নেশা নয়, রসেরও পিপাসা নয়, আজ কেবল জীবনকে অগ্রগতিশীল করবার জন্য প্রখর বিচার-বুদ্ধিকেই প্রকাশ করতে হবে।

নলিনী বললে, কিন্তু নতুন ক'রে আবার কি তুমি সব আরম্ভ করতে পারবে ?

চন্দ্রালোকে সমুদ্রের অস্পষ্ট দিগন্তের দিকে চেয়ে বীরেশ বললে, অহঙ্কারের ফাঁদে আর পা বাড়াবো না। আমি নয়, তুমিও নয়, আর পাঁচ জনে। তারা সবাই এসে জড়ো হবে, সকলের হাতে সৃষ্টি, সবাই নেবে বিশ্বরচনার ভার। তাদের মাঝখানে থাকতে চাই আমরা অখ্যাত

হবে, নগণ্য হবে—যেখানে ব্যক্তিত্ব, আত্মাভিমান, সেখানে প্রভুত্ব আর একনায়কত্ব কিছু থাকবে না। থাকবো পাতার কুটীরে, ঠাকুমার কুঁড়ে ঘরের পাশে,—সেই হবে আমাদের তীর্থ। এক একখানি পাথর আনবো কুড়িয়ে, সবাই মিলে পাথরের পর পাথর সাজিয়ে গ'ড়ে তুলবো জনমন্দির।

বালুবেলায় যতদূর দৃষ্টি চলে জনমানব কোথাও নেই। কম্পিত হাতখানা বাড়িয়ে নলিনী বীরেশের হাত ধ'রে বললে, ওঠো।

বীরেশ উঠে দাঁড়ালো। নলিনী তাকে জড়িয়ে ধ'রে বুকের মধ্যে মাথা রেখে বললে, এ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়েই আমার মন ওঠেনি, তাই ঘুরেছিলুম পথে পথে। তোমার বনস্পতির মধ্যে এতকাল পরে বাসা পেলুম, এই ছিল আমার সাধনা।

বীরেশ তাকে নিবিড় আলিঙ্গন ক'রে সজল কণ্ঠে কেবল বললে, আমিও এতকাল পরে সার্থক হলুম, নলিনী।

নদ ও নদী

প্রবোধকুমার সান্যাল